হযরত আলী (রা) জীবন ও খিলাফত

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) জন্ম থেকে হিজরত পর্যন্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

মদীনায় হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হিজরত থেকে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত

সপ্তম অধ্যায়

খারিজী সম্প্রদায় ও সিরীয়দের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা) শাহাদাত পর্যন্ত

অষ্টম অধ্যায়

খিলাফতের পর হযরত আলী (রা)

নবম অধ্যায়

জান্নাতী যুবকগণের নেতা হাসান ও হুসায়ন (রা)

দশম অধ্যায়

নবী ﷺ ও আলী (রা)-এর পরবর্তী বংশধরগণ

গ্রন্থের ভূমিকা

আল হামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবা কিরামের জন্য এবং তাঁদের জন্য যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী হবেন এবং তাদের দাওয়াত প্রচারে একান্ত নিবেদিত হবেন।

যুগে যুগে আপন কীর্তি ও কর্ম দ্বারা যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য জগতে অনন্য অবদান রেখেছেন এবং উন্নত গুণাবলী ও চরিত্র দ্বারা দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন সেই কালজয়ী মহাপুরুষদের কাছে দেশ, জাতি ও সমাজ চিরঋণী। সাধারণভাবে সমগ্র জাতি এবং বিশেষভাবে যারা তাদের প্রতি ভক্তি ভালোবাসার দাবিদার এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শৌর্যবীর্য ও প্রতিভার বিমুগ্ধ পূজারী, এমনকি ভক্তি পূজার আতিশয্যে কখনো বা আত্মহারা।

কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য এই যে, দেশ ও জাতি তাদের গৌরব পুরুষদের ঋণ পরিশোধে বড় 'বিলম্ব' করে ফেলে। আর এ বিলম্বের বিস্তৃতি কখনো হয় বহু শতাব্দী ও বহু প্রজন্ম ব্যাপী, কখনো হয় কয়েক দশকের খণ্ডিত সময়কালের মাঝে সীমাবদ্ধ।

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে বহু সংস্কারক ও পথপ্রদর্শক, জ্ঞানসাধক ও সাহিত্যসেবী এবং দুর্যোগের কাণ্ডারী ও স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ব্যক্তির জীবনে বহুবার এ সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

বিভিন্ন কারণে কখনো তাদের বিশাল ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের আবর্জনাতলে চাপা পড়ে যায় কিংবা অসংখ্য নামের আলোকচ্ছটায় তাদের নামের দীপ্তি অদৃশ্য থেকে যায়। কখনো বা অতিরঞ্জন ও অতিভক্তির ঝলমলে একটা আলোকবলয় তাদের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রাখে, যার ফলে আসল গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের নীতি ও আদর্শ আড়ালে চলে যায় এবং ইতিহাসে তাদের প্রকৃত স্থান নির্ধারণ অনিশ্চিত হয়ে যায়।

কখনোবা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য, বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব, প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহ এবং ইতিহাসের গতানুগতিক বিবরণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তাদের প্রতি সুবিচার করা এবং সঠিক ধারণা পোষণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এমনকি এক সময় তাঁরা মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টি থেকেই হারিয়ে যান কিংবা দল ও সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হন।

এই সংকীর্ণ ঘেরাটোপ হতে বের হয়ে কখনো যদি তাদের অবদান ও মর্যাদা তুলে ধরার এবং মানব জাতির কিংবা অন্তত একটি জাতির সার্বজনীন সম্পদরূপে স্বীকৃতি দানের চেষ্টা করা হয় এবং কখনো যদি ইসলাম ও তার নবীর সত্যতার এবং অসংখ্য প্রতিভার জন্মদানে ইসলামের অনিঃশেষ শক্তির প্রমাণ এবং উম্মাহর প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শনরূপে তুলে ধরার যৌক্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখন সেটা হয়ে যায় চিরাচরিত প্রথা থেকে বিচ্যুতি, এমনকি ধর্মচ্যুতি, ধার্মিক মাত্রেরই যা একান্ত অপরিহার্য।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা) হলেন তেমনি এক মজলুম ব্যক্তিত্ব। ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন কারণে বহু শতাব্দীর জমাট বাঁধা কুয়াশা তাঁকে উম্মাহর দৃষ্টিপথ থেকে এমনই আড়াল করে রেখেছে যে, তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করা আজো সম্ভব হয়নি এবং বিদগ্ধ গবেষকদের সামনে, এমনকি নিবেদিতপ্রাণ ভক্তমহলেও প্রকৃত রূপে ও পূর্ণ আঙ্গিকে তাঁকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। যে যুগে, যে সমাজে এবং যে ঘটনাপ্রবাহের মাঝে তিনি জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর সমসাময়িক যে সকল ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের আনুগত্য তিনি লাভ করেছেন এবং যে সকল বিপদ দুর্যোগ ও সংকট জটিলতার তিনি মুকাবিলা করেছেন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন উপেক্ষা করেও যে সকল নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ তিনি সযত্নে লালন করেছেন সেগুলোর সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পেশ করাও সম্ভব হয়নি এবং তাঁর অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার কারণ ও ফলাফল কি ছিলো এবং ভিন্ন ও বিপরীত কর্মপন্থা গ্রহণ করলেইবা ফলাফল কি দাঁড়াত তাও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি।

বস্তুত ইতিহাস ও জীবনচরিত সংকলন এবং মাযহাব ও ফেরকার তুলনামূলক অধ্যয়ন কাজে নিয়োজিত গবেষকগণ যে রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তার উপরই এ দুঃখজনক অবস্থার সিংহভাগ দায়দায়িত্ব বর্তায়। কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে স্বল্প নির্ভরতার পথ ধরেছেন এবং প্রচলিত উৎস গ্রন্থগুলোর মাঝেই তাঁদের 'বিবরণ' সীমাবদ্ধ রেখেছেন, অথচ সে সকল গ্রন্থ হয়তোবা আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও মৌলিক উৎস নয়। কিন্তু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ উৎসগুলোকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। এমনকি প্রাচীন ও আধুনিক নির্ভরযোগ্য বহু

উৎসগ্রন্থকেও বিবেচনায় আনা হয়নি। ফলে বিগতদের সংকলন ও বিশ্লেষণকেই পরবর্তীরা পরম নির্ভরতার সাথে অনুসরণ করে এসেছেন এবং এটাই প্রতিষ্ঠিত রীতি হিসেবে চলে এসেছে।

অথচ বিদগ্ধ গবেষক মাত্রই জানেন, ইতিহাস হলো সুরম্য প্রাসাদের এক ধ্বংসস্তূপ, যেখানে মাটি চাপা পড়ে আছে ভালো ও মন্দ এবং সাধারণ ও মূল্যবান বহু উপাদান। যেখানে আবর্জনার ভিতরে লুকিয়ে আছে সৌন্দর্যের বহু অলংকার এবং মণিমুক্তার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এমনকি প্রাসাদের 'মুখ্য প্রস্তর' যা সেটাও খুঁজে পাবেন সেখানে। সুতরাং ইতিহাস-প্রাসাদের এই ধ্বংসস্তূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভিত্তিমূলের উপর প্রাসাদের পূর্ণ জৌলুসে বিদ্যমান অবস্থার চিত্র অংকনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের গবেষণাই হবে যার একমাত্র সম্বল, নিঃসন্দেহে তিনি হবেন এক রিক্তহস্ত গবেষক এবং তার দুর্ভাগা পাঠক প্রাসাদের স্থাপত্য সৌন্দর্য ও নকশা জৌলুস সম্পর্কে হবেন অসচেতন।

একথা সত্য যে, একজন গবেষকের স্বভাব-প্রকৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে এবং সমকালীন যুগসমাজ ও পরিবেশেরও নিজস্ব আবেদন রয়েছে। সে আলোকেই তিনি ইতিহাস চর্চা করেন এবং প্রাচীন গ্রন্থভাণ্ডার মন্থন করেন, তবে মানুষ যেহেতু স্বভাবতই সহজাতপ্রিয় এবং শ্রমবিমুখ সেহেতু গবেষণার ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুকরণ ও দায়সারা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সত্যের স্বরূপ অনুদঘাটিতই থেকে যায়। অথচ পূর্ববর্তীদের মন্তব্য হলো– كم ترك الاولون للاخرين (পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য বহু কিছু অনাহরিত রেখে গেছে)।

জীবনচরিত ও ইতিহাসের অকূল সমুদ্র আজো প্রতীক্ষায় রয়েছে সেই নাবিক সিন্দাবাদ যিনি দুঃসাহসী অভিযান চালাবেন অসংখ্য অজানা তথ্য দ্বীপের সন্ধানে কিংবা অকুতোভয় যিনি তলদেশ থেকে তুলে আনবেন অজ্ঞাত সম্পদ ভাণ্ডার। জানি না দার্শনিক কবির কী উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অদৃশ্যলোক থেকে যেন নতুন অর্থে সেই পুরনো কবিতা ভেসে আসছে–

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا * ويأتيك بالاخبار من لم تزود

ويأتيك بالاخبار من لم تبع له * بتاتا ولم تضرب له وقت موعد

"তুমি যা জানতে না আগামী দিন তোমাকে তা জানানো হবে এবং নিজ খরচে এসে মানুষ তোমাকে অবহিত করবে। এমন মানুষ যাকে তুমি সওয়ারির পাথেয় কিনে দাওনি এবং ফিরে আসার কোন সময়ও বেঁধে দাওনি।"

আমার বড় ভাই সৈয়দ আবদুল আলী আল-হাসানী যিনি নয় বছরের এই এতিম শিশুর শিক্ষা দীক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১] পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে কোন এক সময় তিনি আমাকে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, শোন হে আলী! হযরত আলীর জীবনচরিতের উপর তোমাকে কাজ করতে হবে। আর তুমি এ কাজের যোগ্য হকদার।

তাঁর এ দুর্ঘটনার কারণ, ইতিপূর্বে আমি দাওয়াত ও জিহাদ এবং সংস্কার ও সংশোধন কাজে আত্মনিবেদিত কয়েকজন মহান সাধকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কলম ধরেছি এবং কোন কোন গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক।

এ আদেশ যখন পেলাম তখন 'কলমের ময়দানে' আমার তীর ধনুক ছিল সটান এবং অশ্ব ছিল দুলকিচালে আগওয়ান। কিন্তু বিষয়বস্তুর নাযুকতা চিন্তা করে আমি এমনই হতোদ্যম হলাম যে, ইতোপূর্বে কখনো তা হয়নি। কারণ সেখানে এমন কিছু সংবেদনশীল নীতি ও অবস্থান পর্যালোচনার প্রশ্ন ছিল যা বলা যায়, তরবারির চেয়েও ধারালো এবং চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। এ বিপজ্জনক পথ নিরাপদে পাড়ি দেয়া এমন গবেষকের পক্ষেই সম্ভব, যার চিত্ত হবে আকাশের মতো উদার, ধৈর্য হবে পাহাড়ের মতো অবিচল এবং চিন্তা হবে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও ভাবাবেগমুক্ত। আরো সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র তাওফীক হবে যার নিত্য সহচর।

---

১. আমার পিতা হলেন ভারতবর্ষের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক আল্লামা সৈয়দ আবদুল হাই আল-হাসানী। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির উপর বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। যেমন الثقافة الاسلامية فى الهند (ভারতবর্ষের ইসলামী সংস্কৃতি)। এটি ইসলামী জ্ঞান, শাস্ত্র ও শিল্প সাহিত্যের উপর ভারতীয় মুসলিম লেখক-গবেষকদের রচনাবলী পরিচিতি গ্রন্থ এবং الهند فى العهد السلامى (ইসলামী যুগের ভারতবর্ষ) এবং অন্যান্য আরবী ও উর্দু গবেষণা গ্রন্থ। তবে তাঁর সর্বাধিক মূল্যবান কীর্তি হলো আট খণ্ডের জীবনী বিষয়ক সুবিশাল বিশ্বকোষ, যাতে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন যুগ থেকে শুরু করে লেখকের বর্তমান কাল পর্যন্ত কীর্তি ও অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তেরশ চৌদ্দ হিজরীর ১৬ জুমাদাল আখেরী মুতাবিক ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আবদুল আলী ছিলেন তাঁর যুগের এক দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী মানুষ, যিনি আপন সত্তায় প্রাচীন ও আধুনিক উভয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার পাশাপাশি উদার ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তার ধমনীতে প্রবাহিত ছিল উষ্ণ হাসানী রক্ত, তবে সালফে সালেহীন তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপর পূর্ণ অবিচল ছিলেন। নাদওয়াতুল উলামা তাঁর সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের সুযোগ্য পরিচালনায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছিল। ২৪ যিলকদ ১৩৮০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সুতরাং তিরস্কারের ভয়ে পুরস্কারের লোভ সংবরণ করলাম এবং সমুদ্রের হাতছানিতে 'ঝাপ' না দিয়ে তীরে অবস্থান করাই নিরাপদ মনে করলাম। ইতিমধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করলেন। ফলে তাঁর আকাঙ্ক্ষার ফসল তার সামনে তুলে ধরার সৌভাগ্য আমার আর হলো না।

কিন্তু পরবর্তীকালে আমি খুব তীব্রভাবেই অনুভব করলাম যে, 'আলাবী জীবনচরিত' বিষয়ে আমাদের ইসলামী গ্রন্থাগারে আশ্চর্য রকমের শূন্যতা রয়েছে। এমন একটিও পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ নজরে পড়ে না, যা ইতিহাস চর্চার গতানুগতিক সীমারেখা অতিক্রম করে নবতর ও ব্যাপকতর অধ্যয়নের ভিত্তিতে রচিত এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা কয়েকটি উৎসগ্রন্থের উপর নির্ভরতার পরিবর্তে সাহসী লেখক যেখানে বহুমুখী অধ্যয়নের সৎসাহস দেখিয়েছেন।

কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। কেননা ইসলামী ইতিহাসের এ মহান ব্যক্তিত্বকে ঘিরে যে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তাতে উভয় পক্ষ ভয়াবহ রকমের বাড়াবাড়ি করেছেন এবং বিশেষত তাঁকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বে নিজস্ব ধারণা ও চাহিদা আরোপ করা হয়েছে। এভাবে একই নামে বহু চরিত্রের কল্পিত অবয়ব সামনে এসেছে। ফলে তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের এবং অনন্যসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভার বহু রহস্য উম্মাহ্‌র দৃষ্টি থেকে সরে গেছে।

সুতরাং এ সুমহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মহিমার সাথে উম্মাহ্‌র যথার্থ পরিচয়ের জন্য এমন একটি ব্যতিক্রমী জীবনীগ্রন্থ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু কোথায় সওয়ারি। কোথায় শাহ্ সাওয়ার!![১]

জীবনসায়াহ্নে বার্ধক্যের দুর্বলতা, স্বাস্থ্যের বিপর্যস্ত দশা, অব্যাহত কর্মব্যস্ততা এবং লাগাতার সফরের ধকল সত্ত্বেও অবশেষে শুধু আল্লাহ্‌র রহমতের ভরসা করে ইতিহাসের ঋণ পরিশোধের চিন্তায় এবং সওয়াব ও প্রতিদানের আশায় এ দুঃসাহসিক ইলমী অভিযান আমি শুরু করলাম।

---

১. তবে ইনসাফের দাবি হিসেবে স্বীকার করতে হয় যে,আলাবী সীরাত সম্পর্কে এ পর্যন্ত রচিত গ্রন্থ সম্ভারে সর্বোত্তম সংযোজন হলো বিদগ্ধ গবেষক আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ প্রণীত عبقرية الامام গ্রন্থটি। যদিও তা বিশুদ্ধ জীবনী সংকলনের পরিবর্তে ঐতিহাসিক ও মর্মান্তিক বিশ্লেষণ গ্রন্থ হয়ে পড়েছে।
আক্কাদের গ্রন্থটি থেকে আমি পর্যাপ্ত আলো সংগ্রহ করেছি এবং বরাত সহ বহু উদ্ধৃতি এনেছি।

কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই একটা মাত্র চিন্তা আমার মন-মস্তিষ্ক ও অনুভব অনুভূতিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, অন্য কোন কিছু লেখার বা অন্য কোন চিন্তার অবকাশ ছিল না। প্রথমে আমি ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলোর নতুন করে ব্যাপক অনুসন্ধান অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যোপকরণ ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ করলাম। অতঃপর ১১ রজব ১৪০৮ হিজরী, মুতাবিক ১ মার্চ ১৯৮৮ থেকে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে গ্রন্থের অনুলিখনের কাজ শুরু করলাম। আমার সহকারী ও সহকর্মী নাদওয়াতুল উলামার উপাধ্যক্ষ শায়খ মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন গবেষণা উপযোগী যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা শান্ত পরিবেশ আমাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ সময়টুকু শাহ নেয়ায এবং পরম প্রিয় ভাই শায়খ আবুল বারাকাত নদভীর বাড়িতে কেটেছে।

অতঃপর জন্মভূমি রায়বেরেলী এবং কর্মভূমি লাখনৌ ফিরে এসে রামাযান সহ তিন মাস অনুলিখন কার্য অব্যাহত রাখলাম। অবশ্য সফর ও অন্যান্য কারণে নিয়মিত বিরতিও ঘটছিল। এভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যে একই বছরের ১৪ শাওয়াল মুতাবিক ৩১ মে আমার 'সফর' শেষ হলো। আলোচ্য গ্রন্থের শেষ শব্দটি লেখা হলো আমার বহুদিনের শরীফ মেযবান আলহাজ গোলাম মুহাম্মদের বোম্বে শহরস্থ বাসভবনে, যেখানে আমি সর্বদা লেখার উপযোগী শান্ত পরিবেশ পেয়ে এসেছি।

আলাবী জীবনচরিত অংশে যে সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে তা হলো–

সমকালীন জীবন ও সমাজের গতি-প্রকৃতি। পূর্ববর্তী খলীফাত্রয়ের সঙ্গে হযরত আলীর পূর্ণ আন্তরিকতা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। খলীফা হিসেবে যাবতীয় সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মুকাবিলা। খিলাফত পরিচালনায় নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি তাঁর জীবনোদ্দেশ্য রূপে অবিচল নিষ্ঠা এবং কৃচ্ছ্রতা ও তাকওয়াপূর্ণ পবিত্র জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য। জীবনী পর্বে মূলত এসব বিন্দুতেই আলোচনা আবর্তিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে এসেছে হযরত আলীর পুত্রদ্বয় এবং প্রিয়নবীর পুষ্প দৌহিত্রদ্বয় হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ। ঘোর অন্ধকারে মুসলিম উম্মাহকে পথ প্রদর্শনে তাঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা সময় ও পরিস্থিতির আলোকে তাঁদের সাহসী পদক্ষেপ এবং উম্মাহ্র কল্যাণের পথে তাদের বীরত্বপূর্ণ ত্যাগ ও কুরবানী ইত্যাদির ঈমানোদ্দীপক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্বে তাদের মহান উত্তরসুরিগণের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আহলে বায়'আতের শান-উপযোগী যে পূত-পবিত্র ও শুচিশুভ্র জীবন তাঁরা যাপন করেছেন এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাহর জীবন ও চরিত্র গড়ার পথে আদর্শ ও চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

তদ্রূপ অবনতিশীল পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী জাহানের মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে তারা যে মহাগৌরবময় জিহাদ ও মুজাহাদা করেছেন এবং শাহাদাত ও কুরবানীর যে নজরানা পেশ করেছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্বভাব-প্রাকৃতিক কারণে লক্ষ্য অর্জনে বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াত ও সংস্কারের ইতিহাসে তাঁদের জিহাদ ও মুজাহাদা যে বিরাট অবদান রেখেছে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তেমনিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির তাগিদে আহলে বায়'আতের মহান ব্যক্তিগণ সশস্ত্র জিহাদ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে কিভাবে রূহানী তারবিয়াত ও আধ্যাত্মিক সংশোধনের পন্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে উম্মাহ্‌র হৃদয়জগতে দুনিয়ার মোহমুক্ত ও আল্লাহ্-ভক্তির যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সর্বোপরি ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তাদের যে অবিস্মরণীয় অবদান ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে।

এভাবে একটা ধারাবাহিক আলোচনায় এ সত্য প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলামের মৌচাক হলো চির মধুপূর্ণ, কখনো তা মধুশূন্য হবে না এবং নবী বংশের বৃক্ষ চিরসবুজ ও সদা ফলবান থাকবে, কখনো তা ফল ও ফুলশূন্য হবে না।

বলা বাহুল্য যে, আলাবী জীবনচরিত সম্পর্কে অতি অল্প যে কজন লেখক-গবেষক কলম ধরেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে তাঁরা কদাচিতই নজর দিয়েছেন।

সর্বশেষ পর্যায়ে একান্ত অনন্যোপায় হয়ে এবং আল্লাহ্‌র নিকট দায়মুক্তির চিন্তা নিয়ে কিছু ফেরকাগত আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এগুলোর উৎস আহলে বায়'আত ও আলাবী বংশধরগণের প্রতি অতিভক্তি হলেও মূলত অনারব দর্শন এবং প্রাচীন ধর্ম ও সভ্যতার উচ্ছিষ্টরূপে ইসলামে এগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ ইসলাম এগুলোর দায়দায়িত্ব থেকে চিরমুক্ত।

এভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি এমন এক ব্যক্তির জীবন ও বংশধারায় পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যিনি ছিলেন নবী শিক্ষাঙ্গনের

সনদ এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ইসলামী উম্মাহ্র অন্যতম মহান শিক্ষক। সুতরাং এ হলো বিরাট অর্জনের নিমিত্তে অতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

প্রসঙ্গগত আলোচ্য গ্রন্থে দু'টি বিষয়ের প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত, তথ্য-সূত্র হিসেবে সর্বজনগ্রহণীয় ও নির্ভরযোগ্য প্রাচীন কালের গ্রন্থগুলোর উপরই শুধু নির্ভর করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সূত্র হিসেবে গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা, প্রকাশক এবং প্রকাশকালও যথাসাধ্য উল্লেখ করা হয়েছে; যা সচরাচর করা হয় না, এমনকি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করার প্রতিও অনেকে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না।

পরিশেষে, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার শিক্ষক শায়খ মুহাম্মদ আতীক বাছবী প্রাচীন উৎস গ্রন্থ থেকে তথ্যানুসন্ধান এবং সম্ভাব্য স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে মূল্যবান সহযোগিতা করেছেন সেজন্য তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

তেমনিভাবে প্রিয় ভাই নেসারুল হক ও শায়খ মুহাম্মদ হারুন যাঁরা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

এখন শেষবার সবিশেষ বরণীয় আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে হামদ ও শোকর, যিনি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। তাঁর দরবারে আকুল মুনাজাত। লেখক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যেন তিনি কল্যাণ ও উপকার দান করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশক্তিমান ও দো'আ কবুলকারী।

২১ শাওয়াল ১৪০৮ হিজরী — সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
মুতাবিক ৭ জুন ১৯৮৮ খ্রী.
বোম্বাই, ভারত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) জন্ম থেকে হিজরত পর্যন্ত

ইসলামের দৃষ্টিতে বংশীয় প্রভাব ধারা, কুয়ায়শ গোত্র, বনী হাশিম, আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম, হযরত আলী (রা)-এর পিতা আবূ তালিব, হযরত আলীর ভ্রাতৃবৃন্দ, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন, হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ, আবূ তালিবের সামনে হযরত আলী (রা), সত্যের সন্ধানে মক্কায় আগতদের সহযোগিতা, অনন্য মর্যাদা, হিজরত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) জন্ম থেকে হিজরত পর্যন্ত

ইসলামের দৃষ্টিতে বংশীয় প্রভাবধারা

সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের (Anatomy) বংশীয় রক্তধারার প্রভাব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মানব প্রজন্মের চারিত্রিক যোগ্যতা ও প্রতিভার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সাধারণভাবে বংশীয় রক্তধারার প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকে। মূলত তিনটি সূত্রকে ধারণ করেই এ ধারা প্রবহমান থাকে।

এক. বংশীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্য অর্থাৎ কিছু আদর্শ তথা আচরণ ও মূল্যবোধ 'বংশ পুরুষগণ' গর্ব ও গৌরবরূপে সযত্ন বিশ্বাসের সাথে লালন করে থাকেন কিংবা অন্তত চেষ্টা করেন– এ সকল মূল্যবোধ যারা লংঘন করে বা অবজ্ঞা করে তাদেরকে মনে করা হয় বংশ ও পরিবারের কলংক। যুগ যুগ ধরে অনুসৃত পারিবারিক ও সংবিধান মতে এটা হলো হীনতা ও হীনম্মন্যতা ও পূর্বপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও অবাধ্যতা যা অমার্জনীয় অপরাধ।

দুই. বংশীয় ও পারিবারিক কীর্তি গৌরব অর্থাৎ বংশের মহান ব্যক্তিবর্গের বদান্যতা ও মহানুভবতা, আত্মমর্যাদা ও জাত্যাভিমান, সাহস ও বীরত্ব এবং অন্যান্য গুণ ও কীর্তি প্রজন্মপরম্পরায় গর্ব ও গৌরবের বিষয়রূপে পরিকীর্তিত হয় এবং সে পরিমণ্ডলেই শৈশবে তারা প্রতিপালিত হয়। তাদের কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দিনকাল অতিবাহিত হয়। বলা বাহুল্য, মন-মানস ও চিন্তাঅনুভব গঠনের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই মহত্ত্ব, বীরত্ব, বংশানুগত্য ও খ্যাতি-সুখ্যাতির যৌক্তিকতার মানদণ্ড নির্ধারিত হয়ে থাকে।

তিন. বিশুদ্ধ রক্তধারা অর্থাৎ যে সকল বংশ, পরিবার তাদের বংশগত বিশুদ্ধ ও রক্তকৌলীন্য রক্ষায় সচেতন তাঁদের মাঝে প্রজন্মপরম্পরায় রক্তধারার উত্তরাধিকারগত প্রভাব বিদ্যমান থাকে। বংশধারা বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ এ

ধারণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। আরব কবিসমাজও এ বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। হামাছার সুপরিচিত কবি রাবী'আ বিন মাকরূম যাব্বী ছিলেন মূযার গোত্রের মুখাযরাম[১] কবি। তিনি বলেন,

هجان الحى كالذهب المصفى * صبيحة ديمة يجنيه جان

গোষ্ঠীর কুলীন ও বিশুদ্ধ রক্তের মানুষগুলো যেন ভোরের শিশিরধোয়া ও কুড়িয়ে পাওয়া খাঁটি সোনা।

কবি হোতায়'আ বলেন,

مطاعين فى الهيجا، مكاشيف للدجى * بنى لهم اباؤهم وبنى الجد

যুদ্ধে বর্শা চালনায় তারা ভয়ংকর, কিন্তু তারকার মতো উজ্জ্বল। পূর্বপুরুষগণ তাদের এ মর্যাদার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছেন।

তবে এগুলো হচ্ছে সীমিত পর্যায়ের সাধারণ সত্য, সার্বজনীন ও শাশ্বত সত্য নয়, নয় আসমানী অহীর মতো অপরিবর্তনীয় ও ব্যতিক্রমহীন কিছু। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا.

"তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানে কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না।" [সূরা ফাতির : ৪৩]

হাদীস শরীফেও এ সাধারণ সত্য উচ্চারিত হয়েছে নববী প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে এবং সারগর্ভ ও অলংকারসমৃদ্ধ ভাষায়। বস্তুত বিভিন্ন তত্ত্ব ও সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে নববী কালামের বৈশিষ্ট্য। দেখুন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلامْ اذا فقهوا.

"স্বর্ণ ও রৌপ্যখনি যেমন, মানুষও তেমনি এক খনি। সুতরাং জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ যারা তারাই হলো ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ, যদি ধর্মজ্ঞান পেয়ে থাকে।"

[মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদে আবূ হুরায়রা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৩৯]

---

১. সে কবি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন।

আরো ইরশাদ হয়েছে,

من بطأبه عمله لم يسرع به نسبه

"আমল ও সৎ কর্ম যাকে পিছিয়ে দিয়েছে বংশকৌলীন্য তাকে এগিয়ে নিতে পারে না। [সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় : যিকর, দু'আ ও তাওবা]

তবে এর অর্থ বিশেষ কোন রক্তধারায় চিরপবিত্রতা আরোপ করা কিংবা শ্রেণী ও পরিবারভিত্তিক ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা নয় যা ইসলাম-পূর্ব বিশ্বে বিদ্যমান ছিলো যার ফলে মানব জাতি ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারের শিকার হয়েছিলো। রোমান ও সাসানী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এবং গ্রীক ও ভারতীয় সমাজের ইতিবৃত্তে এ বিষয়ে অজস্র তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

সুতরাং যে বংশ ও পরিবারে হযরত আলী (রা)-এর জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছে তার ঐতিহ্যগত অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান কি ছিলো? নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্য কি ছিলো? সর্বোপরি সাধারণ আরবদের মাঝে এই পরিবারের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কতটুকু স্বীকৃত ছিলো, ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা আমার মনে হয় মূল আলোচনার জন্য সহায়ক হবে।

আমাদের আলোচনা হবে প্রথমে কুরায়শ গোত্র সম্পর্কে এবং পরে কুরায়শের শাখা বনূ হাশিম পরিবার সম্পর্কে।[১]

কুরায়শ গোত্র

সমগ্র আরবে কুরায়শ গোত্রের খ্যাতি ও মর্যাদা ছিলো প্রবাদতুল্য এবং তাদের বংশগত কৌলীন্য ও নেতৃমর্যাদা ছিলো বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তাদের ভাষা সৌন্দর্য ও বাগ্মিতা, মহত্ত্ব ও মহানুভবতা, সাহস ও বীরত্ব এবং অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরবের সকল গোত্র মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতো।

[আস-সীরাতুন নবুবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৭৪]

কুরায়শ গোত্র ছিলো একতাবদ্ধ ও পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন। ধর্মীয় বন্ধনবঞ্চিত ও শিষ্টাচারবর্জিত বেদুঈন আরবের বিপরীতে বহু বিষয়ে তারা ইবরাহীমী

---

১. আরব জাতির গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন অত্র লেখকের রচিত السيرة النبوية গ্রন্থের জাহিলী যুগ অধ্যায়, 'জাযীরাতুল আরবে নবী প্রেরণের কারণ' শীর্ষক শিরোনাম। (পৃষ্ঠা ৪২-৫৫, সপ্তম সংস্করণ, দারুশ শুরুক জিদ্দা হতে প্রকাশিত)

শরীয়তের অনুসারী ছিলো। যেমন মৃতদের দাফন-কাফন, নাপাকীর গোসল, মুহরানা, সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ, তিন তালাক প্রদান, হজ্জ, অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন ইত্যাদি।

[বুলূগুল আরাব ফী মা'আরিফাতি আহওয়ালিল আরাব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৩]

এছাড়া কুরায়শ অগ্নিপূজারীদের এড়িয়ে চলতো এবং অগ্নিপূজার প্রতি ঘৃণা ও প্রখর আত্মসম্মানবোধের কারণে কন্যা ও ভগ্নিকে এবং তাদের কন্যাকে বিবাহ করতো না। কুরআনও তাদের এই সুচিন্তা ও সুকর্মকে প্রশংসা করেছে।

তদুপরি তাদের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিলো এই যে, যেকোন গোত্রে তারা নিঃশর্তভাবে বিবাহ করতে পারতো। কিন্তু অকুরায়শীদের জন্য কুরায়শী কন্যা গ্রহণের শর্ত ছিলো কুরায়শের ধর্মাচারে নিষ্ঠাবান হওয়া। কুরায়শরা বিশ্বাস করতো যে, ধর্মীয় আনুগত্যের শর্ত ছাড়া কন্যা দান বৈধ নয় এবং তাদের বংশমর্যাদার অনুকূলও নয়।

বনী হাশিম

বস্তুত হাশিম পরিবার ছিলো কুরায়শের মধ্যমণি। প্রামাণ্য ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থগুলোতে তাদের জীবনব্যাপী কর্ম ও কীর্তির এবং বচন ও উক্তির খুব সামান্যই সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলোও তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহানুভবতা, সহজাত মাত্রাজ্ঞান ও বুদ্ধি-বিচক্ষণতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। কা'বা ঘরের আসমানী মর্যাদায় তাদের অবিচল বিশ্বাস ছিলো। জুলুমঅবিচার ও সত্যবিমুখতা ছিলো তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। সাহসিকতা ও উচ্চ মনোবল, দয়া ও বদান্যতা এবং দুর্বল ও মজলুমের প্রতি অবারিত সাহায্য-সহযোগিতা ছিলো তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য। মোটকথা, আরবদের ভাষায় الفروسية (মহত্ত্ব ও বীরত্ব) শব্দটি যতগুলো মহৎ গুণ ও ভাব নির্দেশক তার সবই ছিলো বনী হাশিমের স্বভাবজাত। যে উন্নত নৈতিকতা ও জীবনচরিত আল্লাহ্‌র রাসূলের পূর্বপুরুষ হিসেবে শোভনীয় ছিলো তার সবই ছিলো তাদের মাঝে বিদ্যমান। তবে পার্থক্য এই যে, একটি অন্তর্বর্তীকাল তারা অতিক্রম করছিলো এবং জাহিলিয়াতের আকীদা-বিশ্বাস ও পূজাউপাসনার ক্ষেত্রে স্বগোত্রের সহগামী হয়ে পড়েছিলো।

[সীরাতে নবুবিয়া, পৃষ্ঠা-৭৫]

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) উভয়ের পিতামহ। তিনি আপন চাচা মুত্তালিবের মৃত্যুর পর

জমজম বিতরণ ও হাজী আপ্যায়নের দায়িত্বভার লাভ করে অতি সুষ্ঠুভাবে তা আঞ্জাম দিয়েছেন। সেই পূর্বপুরুষদের অন্যান্য গোত্রীয় দায়িত্বও তিনি সুচারুরূপে পালন করেছেন। তবে কুরায়শ গোত্রে তার কোন পূর্বপুরুষ তার সমতুল্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন নি। আপন গোত্রে তিনি ছিলেন সর্বপ্রিয় ও সর্বজনমান্য। [সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা- ১৪২]

আবদুল মুত্তালিব অবশ্য কুরায়শের সেরা বিত্তশালী কিংবা একচ্ছত্র (অবিসংবাদিত) নেতাও ছিলেন না, যেমনটি ছিলো প্রাচীন পূর্বপুরুষ কুসাঈ বরং তার চেয়ে অর্থশালী ও ক্ষমতাশালী অনেক লোক মক্কায় ছিলো। তবে যেহেতু জমজম বিতরণ ও হাজীদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করতেন, আর তা বায়তুল্লাহ্র সেবা হিসেবে অতি মর্যাদাপূর্ণ কাজ ছিলো সে কারণে কুরায়শ গোত্রে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার অতি উচ্চ আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন।

[ড. জাওয়াদ আলী প্রণীত আল্ মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮]

আবদুল মুত্তালিবের অন্তরে এই ঈমান ও বিশ্বাস সমুজ্জ্বল ছিলো যে, কা'বাঘর যেহেতু আল্লাহ্র প্রিয় ঘর তাই স্বয়ং তিনি তা হিফাজত করবেন। হাবশার অধিপতি আবরাহা যখন বায়তুল্লাহ্র মর্যাদা লুণ্ঠনের হীন উদ্দেশে মক্কা অভিযানে এসেছিলো এবং আবদুল মুত্তালিব তার মুখোমুখি হয়েছিলেন সেই বিপদাপন্ন অবস্থায় কুরায়শের এ শ্রদ্ধাভাজন নেতার বুলন্দ হিম্মত ও বিশাল বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তেজোদীপ্তির প্রকাশ ঘটেছিলো।

হাবশা বাহিনী দু'শ উট আটক করেছো, এ খবর পেয়ে আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আবরাহা তাঁকে ইজ্জত করে আসন থেকে নেমে এলো এবং পাশে বসিয়ে প্রয়োজন জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন শুধু এই যে, বাদশা আমার আটককৃত দু'শ উট ফিরিয়ে দেবেন।

এ কথা শুনে আবরাহা তার প্রতি বিমুখ হলো এবং তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখলো আর বললো, আশ্চর্য! দু'শ উটের আবদার নিয়ে এসেছো, অথচ আমি যে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষের ধর্মগৃহ ধ্বংস করতে এসেছি তা বেমালুম ভুলে গেছো, সে বিষয়ে কিছুই বলছো না।

আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি তো শুধু উটের মালিক। কা'বা ঘরের মালিক যিনি তিনিই তা রক্ষা করবেন। আবরাহা বলল, আমার হাত থেকে তার রক্ষা নেই। জবাবে আবদুল মুত্তালিব শান্ত-নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝবে। [সীরাতে নবুবিয়্যা, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০]

আবদুল মুত্তালিব তাঁর সন্তানদের জুলুমঅবিচার পরিহারের কথা বলতেন, মহত্তম চরিত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং নিকৃষ্ট কাজে নিষেধ করতেন।

[বুলূগুল আরাব ফী মাআরিফাতি আহওয়ালিল আরাব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বয়স যখন আট তখন আশিউর্ধ্ব বয়সে আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো।

[আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮]

কথিত আছে, আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুতে শোকার্ত মক্কায় বহু দিন মেলা-বাজার বসেনি। [বালাযুরী প্রণীত আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮]

হযরত আলী (রা)-এর পিতা আবূ তালিব

আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদে মুনাফ নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে তাঁর নাম হলো আব্দে মানাফ– মতান্তরে ইমরান বা শায়বা। তবে আবূ তালিব উপনামে তিনি পরিচিত।

আবূ তালিব ছিলেন কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ও মান্যবর ব্যক্তি। বিপদে ও দুর্যোগে তাঁরই ওপর ছিলো গোত্রের ভরসা।

[বুলূগুল আরাব ফী মাআরিফাতি আহওয়ালিল আরাব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪]

মৃত্যুকালে আবদুল মুত্তালিব তাঁকেই ইয়াতীম নবীর প্রতিপালনের জন্য অসিয়ত করেছিলেন। আর তিনিও তাঁর উত্তম প্রতিপালন করেছিলেন।

[সিরাতুন নবুবিয়্যা, পৃষ্ঠা-১০৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ও চাচা আবূ তালিব ছিলেন সহোদর ভাই। তাঁদের আম্মা হলেন ফাতিমা বিনতে আমর বিন আইস ইব্ন আবদ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম।

[সীরাতে ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৭৯]

আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রকে আবূ তালিব নিজ সন্তানের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন। আর তিনিও আবূ তালিবের পাশে ছাড়া অন্য কারো কাছে ঘুমাতেন না, এমন কি বাইরে গেলেও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। আবূ তালিবের এমন ভালবাসা আর কারো প্রতি ছিলো না। তিনি তাঁর জন্য আলাদা খাবার রাখতেন।

[হায়াতে আবূ তালিব, ১৫১]

ইবন ইসহাক বলেন, দাদার মৃত্যুর পর আবূ তালিবই ইয়াতীম নবীকে দেখাশোনা করতেন। তাই তিনি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

[সীরাতে ইবন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৭৯]

আবূ তালিব একবার বাণিজ্য কাফেলায় সিরিয়া যাত্রা করলেন। বর্ণনামতে, যাত্রার প্রাক্কালে ইয়াতীম নবী চাচা আবূ তালিবকে জড়িয়ে ধরলেন, আর তিনি স্নেহ কোমল হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ। অবশ্যই তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো। কখনো তুমি আমাকে ছাড়া থাকবে না, আমিও তোমাকে ছাড়া থাকবো না। অতঃপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। [সীরাতে ইবন হিশাম, পৃষ্ঠা-১৮০]

আবূ তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, গর্ভধারিণী মায়ের পর তিনিই ছিলেন আমার মা। আবূ তালিব কখনো কখনো বিশেষ ভোজের আয়োজন করতেন এবং তার জন্য খাবার সাজিয়ে রাখতেন। আর তিনি আমাদেরকে তাঁর দস্তরখানে জড়ো করতেন। তখন এ নারী কিছু খাবার পৃথক রেখে দিতেন। আর আমি তা পরে আবার খেয়ে নিতাম।

[হাকেম মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৮]

ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবন হাশিম সম্পর্কে আবূ আমর বলেন, তিনিই প্রথম হাশেমী নারী যিনি হাশেমী পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

[ইস্তিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬]

তিনি ইসলাম গ্রহণপূর্বক মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আপন জামা পরিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে কবরে রেখেছিলেন।

[সীরাতে আলাম আন-নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৭]

আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নবী যখন ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত দিলেন এবং সত্যের উদাত্ত আহ্বান জানালেন এবং দেবদেবীর নিন্দা-সমালোচনা করতে থাকলেন, তখন কুরায়শদের কাছে তা খুবই গুরুতর ও অসহনীয় মনে হলো। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতায় অবতীর্ণ হলো। অপরদিকে আবূ তালিব তাঁকে স্নেহ ও ছত্রচ্ছায়া দিয়ে যেতে লাগলেন।

বিষয়টি যখন বহু দূর গড়িয়ে গেলো তখন কুরায়শ দল আবূ তালিবের কাছে এসে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারির ভাষায় বললো,

"হে আবূ তালিব! আপনার বয়োজ্যেষ্ঠতা, আভিজাত্য ও মর্যাদা আমরা স্বীকার করি। তবে আমাদের আশা ছিলো যে, আপনার ভাতিজাকে আপনি

নিবৃত্ত করবেন। কিন্তু আপনি তা করেন নি। আল্লাহর শপথ! পূর্বপুরুষের সমালোচনা, জ্ঞানীদের প্রতি অবজ্ঞা ও দেবদেবীর নিন্দা রটনার মুখে আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। সুতরাং হয় তাকে আমাদের থেকে নিবৃত্ত রাখুন নতুবা আমরা তার ও আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাব, যতক্ষণ না কোন এক পক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়।

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুরায়শদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা অবহিত করলেন এবং নিজের ও তাঁর জীবন রক্ষার বিষয়ে যত্নবান হতে তাগিদ দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব ছিলো এই :

ياعم ، والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركت.

"হে আমার চাচা! আল্লাহ্‌র শপথ। এ বিষয়টি ত্যাগ করার বিনিময়ে যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁ হাতে চন্দ্র তুলে দেয় তবুও আমি তা ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা সুপ্রকাশ করেন কিংবা আমি তার জন্য শেষ হয়ে যাই।" [সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, পৃষ্ঠা- ২৬৫-২৬৬]

তখন আবূ তালিব বললেন, যাও ভাতিজা, তোমার যা পছন্দ তা বলো। আল্লাহর শপথ! কখনো কোন কারণে তোমাকে আমি পরিত্যাগ করবো না।

[সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬]

বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখে কুরায়শরা পরস্পর শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে স্থির করলো যে, এক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে হাশিম ও মুত্তালিব পরিবারের বিরুদ্ধে তারা বয়কট আরোপ করবে এবং তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও যাবতীয় লেনদেন বর্জন করবে। এ বিষয়ে পরস্পর তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং চুক্তিপত্র লিখে কা'বা ঘরের ভেতরে তা ঝুলিয়ে রাখলো। এই কঠিন দুর্যোগকালে হাশিম ও মুত্তালিব পরিবার আবূ তালিবের পাশে এসে দাঁড়ালো এবং তার সঙ্গে "শিআবে আবী" তালিবে আশ্রয় নিলো।

[সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, পৃষ্ঠা- ৩৫০-৩৫১]

এটা হলো নবুয়তের সপ্তম বর্ষের মুহররম মাসের ঘটনা। এখানে হাশিম ও মুত্তালিব পরিবার একে একে তিন বছর কাটিয়ে দিলো। সে বড় ভয়ানক অবস্থা। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কোন কিছু পাওয়ার উপায় ছিলো না।

সংগোপনে সামান্য যা কিছু হাতে আসত তা-ই দিয়ে জীবন রক্ষা হতো। এরপর উইপোকা দ্বারা চুক্তিপত্র নষ্ট হওয়া, নবী ﷺ কর্তৃক আবূ তালিবকে তা অবহিত করা (কুরায়শের একাংশের চাপের মুখে), চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলা ও চুক্তি বাতিল করার ঘটনাবলী একে একে সংঘটিত হলো। (বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৩-৩৭৭)। এটাই হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে সুপ্রমাণিত এবং উম্মাহর সর্বযুগে সুপ্রসিদ্ধ ও সুস্বীকৃত মত। এ কারণে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুবই দুঃখ ও আফসোস ছিলো। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলাম হলো আকীদা ও বিশ্বাসের ধর্ম। সুতরাং বিশুদ্ধ ঈমান ছাড়া শুধু বংশ ও আত্মীয়তার পরিচয় কিংবা পক্ষ সমর্থন ও ভালোবাসার প্রশ্রয় এখানে নেই।

নবুয়তের দশম বর্ষের শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময় আশি-উর্ধ্ব বয়সে আবূ তালিব মৃত্যুবরণ করলেন (বুলূগুল আরাব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪)। তিনি অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করেন নি। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-ও একই বছর ইন্তিকাল করলেন। আল্লাহর নবীর উপর লাগাতার বিপদ-মুসীবতের কারণে এ বছরের নাম হলো 'শোকের বছর'।

[সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, পৃষ্ঠা- ৪১৫-৪১৬]

হযরত আলী (রা)-এর ভ্রাতৃবৃন্দ

আবূ তালিবের পুত্র সন্তান হলেন তালিব (এ নামেই তিনি আবূ তালিব উপাধি ধারণ করেছেন), আকীল, জাফর ও আলী– এই চারজন। আর কন্যা সন্তান হলেন উম্মে হানী ও জুমানা- এ দু'জন। এঁরা সকলেই ছিলেন ফাতিমা বিনতে আসাদ-এর গর্ভজাত। চার পুত্রের প্রত্যেকেরই বয়সের ব্যবধান ছিলো দশ বছর করে অর্থাৎ আকীল ছিলেন তালিবের দশ বছরের ছোট এবং জাফর ছিলেন আকীলের দশ বছরের ছোট। আবার আলী ছিলেন জাফরের দশ বছরের ছোট।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃষ্ঠা-২২৩]

বদর যুদ্ধের পর মুশরিক অবস্থায় তালিবের মৃত্যু হয়েছিলো। কথিত আছে, ঘর থেকে বের হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কারো কারো মতে, তিনি আর ফিরে আসেন নি এবং কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। তিনি হলেন আরবের হারিয়ে যাওয়া লোকদের একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর শানে কিছু স্তুতি-কবিতা রচনা

করেন। বদর যুদ্ধে তাঁর অংশ গ্রহণ ছিলো অনিচ্ছাপ্রসূত। সে সময় কথা প্রসঙ্গে কুরায়শরা তাঁকে বলেছিলো, আল্লাহর শপথ, তোমরা হাশেমীরা আমাদের সঙ্গে বের হলেও আমরা অধিক জ্ঞাত আছি, তোমাদের মন রয়েছে মুহম্মদের সঙ্গে।

অন্যদের সাথে তালিবও মক্কায় ফিরে এসেছিলেন এবং নবীর শানে স্তুতি' রচনা করেছিলেন এবং তাতে বদরের নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র আকীল ইব্‌ন আবূ তালিবের (উপনাম আবূ ইয়াযীদ) ইসলাম গ্রহণ মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিলো। অন্য মতে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করে অষ্টম হিজরীর শুরুতে তিনি হিজরত করেছিলেন। বদর যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর তাঁর চাচা আব্বাস তাঁর মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। সহীহ্ বুখারীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর কথা এসেছে, মুতার যুদ্ধে তিনি শরীক হয়েছেন। তবে মক্কা বিজয় ও হুনায়ন যুদ্ধে তাঁর কোন উল্লেখ নেই। ইব্‌নে সাআদের বর্ণনা মতে সম্ভবত তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তবে হাসান ইব্‌ন আলীর সূত্রে যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার বর্ণনা করেছেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে যাঁরা অবিচল ছিলেন আকীল তাদের অন্যতম।

চার পুত্রের মাঝে আকীলই ছিলেন আবূ তালিবের প্রিয়তম। দুর্ভিক্ষের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আব্বাস (রা) তাঁর গুরুভার লাঘবের উদ্দেশে তাঁর পুত্রদের ভাগ করে নেয়ার প্রস্তাব করলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, "আকীলকে আমার জন্য রেখে তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আলী (রা)-কে ও হযরত আব্বাস হযরত জাফর (রা)-কে নিজের কাছে নিয়ে এলেন।[১]

কুরায়শ বংশের পরিচয় ও যশ-অপযশ সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞ ছিলেন। মদীনার মসজিদে এ বিষয়ে তিনি শিক্ষা দান করতেন। তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে পারদর্শী ছিলেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে হিশাম ইব্‌নে কালবী বলেন, কুরায়শ গোত্রে চারজন লোক ছিলো, বিরোধ মীমাংসার জন্য লোকেরা তাদের শরণাপন্ন হতো। তাঁরা হলেন আকীল, মাখারামা, হুয়াইতিব ও আবূ জাহম।

ঋণগ্রস্ততার কারণে একবার আকীল হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে গিয়েছিলেন। ইব্‌নে সা'দ বলেন, বর্ণনামতে মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে

---

১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯২-১৯৩, (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩ খ্রী.)।

তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো, তবে (ইমাম বুখারী রচিত) التريخ الاصغر-এর বিশুদ্ধ সনদের বর্ণনামতে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার আমলে হাররার[1] মর্মন্তুদ ঘটনার পূর্বে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[2] শেষ জীবনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিলো।

প্রশস্ত বাড়ির বড় পরিবার ছিলো তাঁর। বার পুত্র সন্তানের নয়জনই ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুসলিম ইব্‌ন আকীল ছিলেন সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ। ইমাম হুসাইন তাঁকেই অগ্রদূতরূপে কূফায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে ইব্‌নে যিয়াদ তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলো।[3]

হযরত জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ইব্‌ন সা'দ তাঁর তাবাকাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারে আরকামে অবস্থান গ্রহণ করার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি দাওয়াতী কাজ করেন। সীরাত বর্ণনামতে নবী ﷺ তাঁর ও মু'আয ইব্‌ন জাবালের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ-এর পর তাঁকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করতেন। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনামতে, জাফর (রা) ছিলেন দরিদ্রদের জন্য সর্বোত্তম। হযরত ইকরামা (র)-এ সূত্রে খালিদ আল হামযা (র) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি,

ما احتذى النعال ولاركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر بن ابى طالب . (رواه الترمذى والنسائى واسناده صحيح)

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর পাদুকা পরিধানকারী কিংবা বাহনে আরোহণকারী কিংবা ভূমিতে পদাঙ্ক সৃষ্টিকারী কোন মানুষ জাফর ইব্‌ন আবূ তালিবের চেয়ে উত্তম ছিলো না।" [তিরমিযী, নাসায়ী ও হাদীসটির বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ]

---

১. ইয়াযীদ বাহিনী কর্তৃক মদীনা আক্রমণ ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার মর্মন্তুদ ঘটনা হাররার ঘটনা নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছে।

২. আল-ইসাবা শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজার আসকালানী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৪।

৩. আল-জাওহারা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০-৪১; ইব্‌নে সাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪ (দারু সাদির বৈরুত)।

আল মাকবারী-এর সূত্রে বাগাবী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, জাফরের ভালবাসা ও ওঠাবসা ছিলো হতদরিদ্রদের সাথে। তিনি তাদের সেবা করতেন। তারাও তাঁর সেবা করত। তিনি তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। তারাও তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'আবুল মাসাকীন' (হতদরিদ্র দুঃস্থদের অভিভাবক) বলে ডাকতেন।

নবী ﷺ বলেছেন, اشبهت خلقی وخلقی (অবয়বে ও চরিত্রে তুমি আমার মতো হয়েছ, [হযরত বারা রা-এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম]

হযরত জাফরের (রা) নেতৃত্বে হিজরত হওয়ার পর বাদশাহ নাজ্জাশী ও অন্য অনেকে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খায়বার বিজয়ের পরপর হযরত জাফর ও অন্যান্য মুহাজির রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আর আল্লাহ্র রাসূল তাঁর ললাট চুম্বন করে বলেছিলেন,

ما ادری بأيهما افرح بقدوم جعفر ام بفتح خيبر.

"জানি না, আমার বেশি আনন্দ কিসে; জাফরের আগমনে না খায়বার বিজয়ে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, "আলী (রা) আমার কোন আবদার না-মঞ্জুর করলে আমি জাফরের দোহাই দিতাম, আর তিনি আমার আবদার রক্ষা করতেন।"

জুমাদাল উলা অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং পিছু না হটে বীরের মতো লড়াই করে সিরিয়ার মুতা এলাকায় শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধের ঘোরতর সময়ে তিনি ঘোড়া ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং শাহাদাত পর্যন্ত জিহাদ করেছিলেন।

ইবনে উমর (রা) বলেন, মুতা যুদ্ধে জাফরকে আমরা যখন খুঁজে পেলাম তখন দেখি, তাঁর শরীরের সম্মুখে অংশে নব্বইটির বেশি তীর বর্শার যখম রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رأيت جعفرًا يطير فی الجنة مع الملائكة (الطبرانی من حديث ابن عابس)

"আমি জাফরকে ফেরেশতাদের সঙ্গে জান্নাতে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।"

তাবারানীর আরেক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তমাখা দুই ডানাবিশিষ্ট ফেরেশতার বেশে জাফরকে দেখানো হয়েছে। কারণ যুদ্ধে তাঁর উভয় হাত কর্তন করা হয়েছিলো।

যুদ্ধফেরতা বাহিনীকে মদীনার উপকণ্ঠে আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি তখন এক সওয়ারিতে আরূঢ় ছিলেন। দেখা গেলো, একদল বালক দৌড়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, শিশুদের সওয়ারিতে তুলে নাও আর জাফরের ইয়াতীম শিশুকে আমার কাঁধে দাও। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফরকে তিনি সওয়ারিতে নিজের সামনে বসালেন। [মুসনাদে আহমাদ]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, জাফরের ইন্তিকালের সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় আমরা বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলোম।[1] জাফর পরিবারকে তিনি বলেছিলেন, আমার ভাতিজাদেরকে কাছে আনো। কাছে আনা হলে দেখা গেলো তারা যেন পাখির অসহায় বাচ্চা! অতঃপর তিনি ক্ষৌরকারকে ডেকে আনালেন। আর সে তাদের মাথা মুড়িয়ে দিলো। অতঃপর তিনি তাদের মাকে বললেন, তুমি কি তাদের অভাবের আশংকা কর, অথচ দুনিয়া ও আখিরাতে আমি হলাম তাদের অভিভাবক।

[ইব্‌নে সা'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭]

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফরের বিধবা স্ত্রীকে বললেন, জাফরের সন্তানদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। নিয়ে আসা হলে তিনি কাছে টেনে, আদর করে তাদের ঘ্রাণ নিলেন। আর তখন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। তখন তিনি হযরত জাফরের শাহাদাতের বিষয় তাদের অবহিত করলেন।

জাফরের পরিবারের শোকের সময় আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীগণকে বললেন, তাদের জন্য খাবার তৈরি করো (পরবর্তীতে এটি সুন্নাতে পরিণত হয়েছে)। কেননা তাদের ওপর শোকে কাতরকরা বিপদ নেমে এসেছে। আর তাঁর চেহারায় তখন শোকের ছায়া দেখা যাচ্ছিলো। [সীরাতে ইব্‌নে হিশাম (সংক্ষেপিত); বর্ণনাটি তিরমিযী শরীফেও আছে]

জাফর-তনয় আবদুল্লাহ হলেন আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম শিশু। তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ দানশীল। তার অন্য ভাইয়েরা হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ও আওন ইব্‌ন জাফর।

---

১. আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭-৩৮ ।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী

নাজাশী যখন মুসলিম মুহাজিরদের প্রশ্ন করলেন, এ কোন্ ধর্ম যার জন্য তোমরা স্বজাতিকে পরিত্যাগ করলে এবং সনাতন কোন ধর্মে প্রবেশ করলে না?

হযরত জাফর তখন জবাব দিতে অগ্রসর হলেন এবং কথা না বাড়িয়ে শুধু জাহিলিয়্যা যুগের বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন। অতঃপর ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনে যে মহাবিপ্লব সাধন করেছে তা তুলে ধরলেন। বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে কিংবা খ্রীস্ট ধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক একজন শাসক উত্তেজিত হতে পারেন, এমন কি একজন সাধারণ অমুসলিমের অন্তরে জাহিলিয়াতের উন্মাদনা মাথা চাড়া দিতে পারে, এমন কোন বিষয় তিনি আদৌ উত্থাপন করলেন না, বরং তাঁর বক্তব্য ছিলো আগাগোড়া বাস্তব অবস্থার নিখুঁত বিবরণ।[২] বস্তুত এ ছিলো স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ, যা শুধু তার উচ্চাঙ্গ আরবী অলংকার জ্ঞানের পরিচ্ছদই নয়, বরং চিন্তা ও বুদ্ধিগত প্রজ্ঞারও পরিচায়ক। সেই সাথে তাঁর স্বভাব বিশুদ্ধতা ও জ্ঞানের গভীরতার পরিচায়ক যা কুরায়শ গোত্রে হাশিম পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিলো। আর সকলের মাঝে জাফরের ছিলো ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য। [আস-সীরাতুন নবুবিয়াহ, পৃষ্ঠা-১৩৩-৩৪]

নবী ﷺ-এর চাচাত বোন আবূ তালিব-তনয়া উম্মে হানীর নাম ফাখিতা মতান্তরে ফাতিমা বা হিন্দা, তবে তাঁর প্রথম নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি হোবায়রা ইব্ন আমর ইব্ন 'আইস আল-মাখযূমীর স্ত্রী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই চাচাত বোন সম্পর্কেই বলেছেন,

خير نساء ركين الابل نساء قريش.

আবূ আমর বলেন, মক্কা বিজয়ের পর হোবায়রা নাজরান এলাকায় পলাতক ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি কৈফিয়তমূলক কবিতা বলেছেন। আবার উম্মে হানীর ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়েও এক কবিতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উম্মে হানীর গর্ভে তাঁর আমর নামে যে পুত্র সন্তান ছিলো সে নামেই তিনি উপনাম ধারণ করেছিলেন।

মক্কা বিজয়কালে উম্মে হানী তাঁর শ্বশুরকুল বনূ মাখযূমের দু'জনকে হযরত আলী (রা)-এর হত্যার হুমকি প্রদানের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উম্মে হানী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হলে তিনি তাঁকে শুভেচ্ছা ও

---

২. নাজাশী উদ্দেশে প্রদত্ত হযরত জাফরের জবাব পড়ুন সীরাতে ইব্নে হিশামে, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৪-৩৮)

মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, "তুমি কাকে নিয়ে এসেছো?" তিনি দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলে তিনি বললেন,

قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت فلا نقتلها .

"যারা তোমার আশ্রয় ও নিরাপত্তা পেয়েছে আমিও তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিলাম। আর তাদের হত্যা করা হবে না।"

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তার বাড়িতে গোসল করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিজয়ের আট রাকাত শোকরানা সালাত আদায় করেছিলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০]

সহীহ্ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিবের ঘরে যান এবং গোসল করে আট রাকআত শোকরানা সালাত আদায় করেন।

সিহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উম্মে হানী থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী ও অন্যদের মতে হযরত আলী (রা)-এর পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। [আল-ইসাবা, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭-৩১৮]

আবূ আহমদ আল-আসকারী বলেন, জুমানাহ বিনতে আবূ তালিব হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মাতা। এই মত সমর্থন করে 'কিতাবুল উখওয়া' গ্রন্থে ইমাম দারে কুতনী (বিনা সনদে) বলেছেন, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ তাঁকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার গর্ভে আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার (রা) বলেন, ইনি উম্মে হানীর বোন, খায়বারের ফসল থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের জন্য ত্রিশ 'ওয়াসাক' নির্ধারণ করেছিলেন তাদের তালিকা দিতে গিয়ে ইব্‌নে ইসহাক জুমানা বিনতে আবূ তালিবের নামও উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ফাকেহী (র) প্রণীত মক্কা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্‌নে উছমান ইব্‌ন জুশম বলেন, হযরত আতা, মুজাহিদ ইব্‌নে কাছীর ও অন্যদের দেখেছি, সাতাশে রমযান রাতে তাঁরা তানঈমের উদ্দেশে বের হতেন এবং আবূ তালিব তনয়া জুমানার তাঁবু থেকে উমরার ইহরাম করতেন। ইব্‌নে সা'দ (র) জুমানার আলোচনা তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ প্রসঙ্গে এনেছেন। আবার নবী ﷺ -এর চাচাত ভগ্নিগণ শিরোনামে আলাদাভাবেও এনেছেন এবং বলেছেন, আবূ

সুফিয়ানের পুত্র জাফর তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। খায়বারের ফসল থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে ত্রিশ ওয়াসাক পরিমাণ দান করেছিলেন।

[প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৫৯-২৬০]

জন্ম

বিশুদ্ধ মতে নবুয়তের দশ বছর পূর্বে হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) জন্মগ্রহণ করেছেন। [আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৭]

ইব্‌ন সা'আদ বলেন, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ত্রিশতম হস্তিবর্ষের রজব মাসের বার তারিখ রাতে তাঁর জন্ম। [ইব্‌ন সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১, আল-বাদরীন অধ্যায়]

হাকীম বিন হিযাম (রা)-এর পরিচিতি প্রসঙ্গে ইমাম হাকিম (র) বলেন, প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, ফাতিমা বিনতে আসাদ আমীরুল মু'মিনীন আবী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে কা'বার অভ্যন্তরে প্রসব করেছেন। অনুরূপভাবে হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা)-ও কাবাগৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'নাহজুল বালাগাহ'-এর ভাষ্যকার ইব্‌নু আবিল হাদীদ বলেন, আলী (রা)-এর ভূমিষ্ঠ স্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বহু শিয়া কা'বাঘরকে চিহ্নিত করলেও হাদীসশাস্ত্রবিশারদগণ তা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কাবাঘরে জন্মগ্রহণকারী হলেন হাকীম ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন খোয়ায়লিদ ইব্‌নে আসাদ ইব্‌নে আবদুল উযযা ইব্‌ন কুসাঈ।

[ইব্‌নে আবুল হাদীদ : শারহু নাহজিল বালাগাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন

নিজস্ব সনদে তাবারী তার ইতিহাস গ্রন্থে মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন। মুজাহিদ বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছিলো যে, আল্লাহ তাঁর কল্যাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। কুরায়শের দুর্ভিক্ষকালে আবূ তালিবের বিরাট পরিবারের কথা ভেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন (তিনি ছিলেন সচ্ছলতম হাশেমী), হে আব্বাস, আপনার ভাই আবূ তালিবের পরিবার বড়, আর দুর্ভিক্ষে মানুষের দুর্দশা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আসুন, আমরা তাঁর ভার লাঘব করি। আমি একজন, আপনি একজন এভাবে আমরা তার ঘরের দু'জনের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আব্বাস তাতে সায় দিলেন।

তখন তাঁরা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বললেন, সংকটকাল পর্যন্ত আমরা আপনার ভার কিছুটা লাঘব করতে চাই। তখন আবূ তালিব বললেন, আকীলকে আমার জন্য রেখে তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

আলীকে ও আব্বাস (রা) জাফরকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব তখন নবীগৃহে নবীর সান্নিধ্যে বাস করছিলেন এবং নবুয়তের সত্যতা স্বীকার করে তার অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে হযরত জাফরও আব্বাস (রা)-এর প্রতিপালনে থেকে এক সময় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং পৃথক হয়ে গেলেন।

[তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৩]

হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌নে ইসহাক (র) লিখেছেন, নবী ﷺ ও হযরত খাদীজা (রা)-কে একদিন নামায পড়তে দেখে হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহম্মদ, এটা কি? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্‌র পছন্দকৃত দীন। এই দীনের বাহকরূপেই তিনি তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং লাত-ওযযাকে অস্বীকার করে এক লা শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য তোমাকে আমি আহ্বান করছি। হযরত আলী (রা) তখন বললেন, আজকের পূর্বে এমন কথা আমি আর কখনো শুনিনি। সুতরাং আবূ তালিবকে না বলে কোন ফায়সালা করতে পারি না। নিজে ঘোষণা দেয়ার পূর্বে বিষয়টি জানাজানি হওয়া আল্লাহর রাসূল অপছন্দ করলেন, তাই বললেন, হে আলী! ইসলাম গ্রহণ যদি না কর তাহলে গোপন রাখ। তিনি ঐ দিন ঐভাবেই ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ আলী (রা)-এর অন্তরে (ঐ রাতেই) ইসলামের সুধা ঢেলে দিলেন। ফলে প্রত্যূষে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে মুহম্মদ! আমার সামনে (তখন) কী পেশ করেছিলেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর তুমি লাত-ওযযাকে অস্বীকার করবে এবং সকল দেবদেবীর সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবে।"

হযরত আলী (রা) তা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তবে আবূ তালিবের পক্ষ হতে আশংকা বোধ করে তা প্রকাশ না করে গোপন রাখলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪]

অধিকাংশের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত বিশুদ্ধ ও মত এই যে, খাদীজা (রা)-এর পর তিনিই হলেন প্রথম মুসলিম ও প্রথম সালাত আদায়কারী। যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন হযরত আলী। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রা)-এর পরে আলী (রা)-ই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুহম্মদ

ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যুরারা (রা) বলেন, হযরত আলী (রা) নয় বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ (র)-এর বর্ণনামতে হযরত আলী (রা) হলেন প্রথম সালাত আদায়কারী। আর তখন তাঁর বয়স ছিলো দশ বছর। হযরত হাসান ইব্ন যায়েদ বলেন, অল্প বয়স হওয়ায় তিনি মূর্তি পূজা করেন নি।

[ইব্নে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১]

স্বভাব ও প্রকৃতি এবং পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার অনিবার্য ধারা অবশ্য সেটাই প্রমাণিত করে যে, তাঁর প্রতিপালন হয়েছে নবীগৃহে, নবীর তত্ত্বাবধানে এবং নবুয়তের নূরানী পরিবেশে, যেখানে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশে ইসলামের দাওয়াত এবং আল্লাহর বাণী ও রিসালাতের বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং যদি কোন প্রবল প্রতিকূলতা না থাকে এবং স্বভাব-প্রকৃতি যদি সত্যবিমুখ ও অনুভূতিহীন না হয়, তাহলে এই নূরানী পরিবেশে নূরানী প্রভাব গ্রহণ করা তো খুবই স্বাভাবিক! আর আলী (রা) ছিলেন এ সকল ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূত-পবিত্র।

কোন কোন গবেষক আলিম বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আহলে বায়ত ও নারী সমাজের মধ্যে প্রথম হলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রা), 'পরিপক্ব ও জ্ঞানী' পুরুষদের মাঝে হযরত আবূ বকর (রা) এবং অল্প বয়স্কদের মাঝে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। তবে প্রথম বক্তব্যই যুক্তির নিকটতর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪০]

আবূ তালিবের সামনে হযরত আলী (রা)

কিছু সংখ্যক আলিমের বর্ণনাসূত্রে ইব্ন ইসহাক বলেন, সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কোন পাহাড়ী স্থানে চলে যেতেন।

হযরত আলী (রা) পিতা আবূ তালিব ও গোত্রের লোকদের চোখের আড়ালে তাঁর সাথে যেতেন এবং সেখানে সালাত-ইবাদত করে সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন।

আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা হলো ততদিন তাঁদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলো। একদিন আবূ তালিব পুত্র আলী (রা) ও ভ্রাতুষ্পুত্র নবী ﷺ -কে সালাতরত অবস্থায় পেয়ে আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! এ কোন্ ধর্ম যা তোমাকে পালন করতে দেখছি?

তিনি বললেন, হে চাচাজান! এ হলো আল্লাহর দীন, তাঁর ফেরেশতাদের দীন, তাঁর রাসূলগণের আনীত দীন এবং আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ)-এর দীন কিংবা এ ধরনের কোন কথা তিনি বললেন।

আল্লাহ্ আমাকে মানুষের কাছে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। চাচাজান, আমি যাদের কল্যাণকামী ও হেদায়াত প্রত্যাশী তাদের মাঝে আপনি এর অধিক হক্দার। এ ডাকে সাড়া দিয়ে আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আপনিই সর্বোত্তম হকদার কিংবা তিনি অনুরূপ বলেছেন।

আবূ তালিব বললেন, হে স্নেহাস্পদ ভাতিজা! আমি তো পূর্বপুরুষের ধর্ম ও তাদের আদর্শ ত্যাগ করতে পারি না। আল্লাহ্র শপথ! তুমি কষ্ট পাও আমার জীবন থাকতে এমন কিছু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা)-কে তিনি বলেছেন, বৎস! এ কোন্ ধর্ম তুমি গ্রহণ করেছো? তিনি বললেন, পিতা, আমি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা এনেছেন তা সত্য বলে মেনে নিয়েছি, তাঁকে অনুসরণ করেছি এবং তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্র উদ্দেশে সালাত আদায় করেছি।

জবাবে হযরত আলী (রা)-কে তিনি বলেছেন, কল্যাণের পথেই তিনি তোমাকে ডেকেছেন। সুতরাং তাঁর সাহচর্য অপরিহার্য করে নাও।

[সীরাতে ইব্নে হিশাম, পৃষ্ঠা-২৪৬]

সত্যের সন্ধানে মক্কায় আগতদের সহযোগিতা

সত্যের সন্ধানে কিংবা ইসলামের আকর্ষণে যাঁরা মক্কায় আসতেন আলী (রা) সর্বদা তাঁদের সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে পৌঁছে দিতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন হাশেমী পরিবারের সহজাত দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পূর্ণ অধিকারী। হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় আমরা তার কিছুটা পরিচয় পাই। নিজ সনদে ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ শুনে আবূ যর তাঁর ভাইকে বললেন, এই মক্কা উপত্যকার উদ্দেশে সওয়ারি প্রস্তুত কর এবং যিনি নিজকে নবী দাবি করেন এবং আসমান থেকে খবর আসার কথা বলেন, তাঁর কথাবার্তা শুনে ও খোঁজ-খবর নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।

আবূ যরের ভ্রাতা মক্কায় এসে তাঁর কথাবার্তা শুনে ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তাঁকে মহত্তম চরিত্রের বিষয়ে কথা বলতে শুনেছি এবং এমন 'বাণী' তাঁর কাছে শুনেছি যা কবিতা নয়।

আবূ যর (রা) বললেন, তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পার নি। অতঃপর তিনি রসদপত্র ও পানির মশক সাথে নিয়ে মক্কায় উপনীত হলেন।

এরপর মাসজিদুল হারামে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খোঁজ করলেন। তিনি তাঁকে চিনতেন না, তবে তিনি কারো কাছে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলেন না। ইতোমধ্যে রাত হয়ে গেলো। তিনি সেখানেই শুয়ে পড়লেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে বিদেশী পর্যটক বুঝতে পেরে ইশারা করলেন। আবূ যর (রা) তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের পারস্পরিক প্রশ্ন বিনিময় হলো না। এভাবে ভোর হয়ে গেলো। এরপর তিনি মশক ও রসদপত্রসহ মসজিদে চলে এলেন। কিন্তু সারা দিনেও তিনি নবী ﷺ -এর সাক্ষাৎ পেলেন না। সন্ধ্যায় তিনি আপন শয়নস্থলে ফিরে এলেন। হযরত আলী (রা) চলে যাওয়ার সময় ভাবলেন, মনে হয় পরদেশী এখনো তার ঠিকানা খুঁজে পায়নি। তাই তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে গেলেন। এবারও কোন কথা হলো না। তৃতীয় দিন যখন একই ঘটনা ঘটলো তখন তিনি ঘরে এনে বললেন, আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি আমাকে বলবেন? তিনি বললেন, পথ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিলে বলবো। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলে আবূ যর (রা) তার উদ্দেশ্য জানালেন।

আলী (রা) বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য রাসূল। আপনি আমার অনুগমন করুন। যদি আপনার জন্য আশংকার কোন কারণ দেখি তাহলে আমি পেশাব করার ছলে বসে পড়বো, আর আমি যদি পথ চলা অব্যাহত রাখি তাহলে আপনি আমার পেছনে পেছনে চলে আসবেন এবং আমি যেখানে প্রবেশ করি সেখানে প্রবেশ করবেন। এভাবে আবূ যর (রা)-কে তিনি নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। আবূ যর (রা) তাঁর কথা শুনে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। [সহীহ্ বুখারী]

অনন্য মর্যাদা

আলী (রা) বলেন, আমি ও নবী করিম ﷺ কা'বার পাদদেশে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বসতে বললেন এবং তিনি আমার কাঁধে উঠলেন। আমি তাঁকে নিয়ে দাঁড়াতে গেলাম। তিনি আমার অপারগতা বুঝে নেমে গেলেন এবং নিজে বসে আমাকে তাঁর কাঁধে উঠতে বললেন। আমি তাই করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত আলী (রা) বলেন, মনে হলো যেন ইচ্ছা করলে আমি আকাশের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারব! অতঃপর আমি কা'বাগৃহে উঠে পড়লাম। সেখানে স্বর্ণের কিংবা পিতলের মূর্তি ছিলো। আমি সেটাকে ডানে-বামে ও সামনে পেছনে নাড়া দিয়ে তুলে ফেললাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে ছুঁড়ে ফেললাম। শিশি যেমন ভেঙ্গে যায় তেমনি তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে

গেলো। অতঃপর আমি নেমে এলাম এবং কেউ দেখে ফেলে কি না এ আশংকায় আমরা উভয়ে এক দৌড়ে বাড়িঘরের আড়ালে চলে গেলাম। (মুসনাদে আহমাদ) স্পষ্টতই এটা ছিলো হিজরত-পূর্ব ঘটনা। [মুস্তাদরাকে হাকেম]

হিজরত

ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং কুরায়শের প্রতিরোধ ও নির্যাতন যুগপৎভাবে চলতে লাগলো। বয়কটের মুখে হাশেমী পরিবার শি'আবে আবি তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করলো। জাফর ইব্ন আবূ তালিবের নেতৃত্বে হাবশায় হিজরত সম্পন্ন হলো। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রাসূল ﷺ তায়েফ গেলেন। তায়েফবাসী তাঁর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব দেয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ কে মিরাজের সৌভাগ্য দান করলেন। হযরত উমর ও হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা ও বাইরে মক্কার যাঁদের কল্যাণের ইচ্ছা করলেন, তাঁদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন।

ফলে তারা মুসলমান হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ -এর আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানকারী আবূ তালিব ও সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) পরপর মৃত্যুবরণ করলেন। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি কুরায়শের জুলুম-নির্যাতন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। ইসলামকে 'নির্মূল' করার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন হলো। তূণীরের শেষ তীরটিও যেন নিক্ষিপ্ত হলো! নিপীড়ন ও নির্যাতনের এমন সব পন্থা ও কৌশল তারা অবলম্বন করলো যে, এর বেশি কিছু করা ছিলো অকল্পনীয়।

ইতিমধ্যে ইয়াসরিবের দুই বড় কাহতানী গোত্র আওস ও খাযরাজের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। এভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবায় বায়'আতের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটলো আর তখন থেকেই সেখানে মুসলমানদের হিজরত শুরু হলো। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা ও অক্ষমতার শিকার কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কায় রয়ে গেলেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিব ও আবূ বকর ইব্ন কুহাফাও মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরত কুরায়শদেরকে শংকিত করে তুললো। এসব ঘটনা ও পরিস্থিতির ধারাপ্রবাহ চলছিলো, যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর জীবনী গ্রন্থে তুলে ধরা সম্ভব নয় এবং এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজনও নেই, বরং সীরাতুন্নবী হলো এ আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান। বস্তুত সীরাতুন্নবী তো হলো আকূল সমুদ্র।

[সীরাতুন্ননবী, পৃষ্ঠা-১২০-১৫৯]

অবশেষে কুরায়শরা 'দারুন-নাদওয়া' সভাগৃহে একত্র হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে সাহসী ও সম্ভ্রান্ত যুবক নির্বাচন করা হবে এবং এই যুবকরা নবীগৃহে হানা দিয়ে একযোগে তাঁকে হত্যা করবে। এভাবে তাঁর রক্তের দায় সকল গোত্রে বিভক্ত হলে বনূ আবদে মানাফ সমগ্র কুরায়শের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস পাবে না। এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলো।

কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এ চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বিছানায় তাঁর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে বলে এ মর্মে আশ্বস্ত করলেন, "কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করবে না।"

বস্তুত এটা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিলো না, বরং বিশ্ব ইতিহাসে দুর্লভ ঘটনা। নিশ্চিত মৃত্যুর 'কন্টক শয্যা' চোখ বুজে নিশ্চিন্তে তিনিই শুধু ঘুমাতে পারেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি রয়েছে যাঁর সুদৃঢ় ঈমান ও গভীর ভালোবাসা এবং যিনি নববী ওয়াদায় অটুট আস্থা রেখে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে পারেন।

হযরত আলী (রা) ভালোভাবেই জানতেন যে, ইসলাম ও তাঁর নবীর প্রতি কুরায়শের কী সীমাহীন বিদ্বেষ ছিলো! তিনি আরো জানতেন যে, কুরায়েশরা যখন দেখবে যে, রাসূল ﷺ হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছেন তখন তাঁরই ওপর নেমে আসবে তাদের উন্মত্ত আক্রোশ ও প্রতিহিংসার আগুন। কিন্তু সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করে 'কিছুই জানি না' এমনভাবে তিনি আল্লাহর রাসূলের বিছানায় প্রশান্ত চিত্তে শুয়ে থাকলেন। বিশ্বে এহেন আত্মত্যাগের তুলনা সত্যিই বিরল।

একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুদল নবীগৃহের দোরগোড়ায় জড়ো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুঠি মাটি হাতে নিলেন এবং সূরা ইয়াসীনের শুরু হতে فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে করতে তাদের মাথার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে তাদের দৃষ্টি থেকে এমনভাবে নিয়ে এলেন যে, তারা তাঁকে দেখতে পেলো না। তখন তিনি নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলেন। এ সময় এক অপরিচিত 'আগন্তুক' তাদের বলল, এখানে তোমরা কার অপেক্ষায় আছো? তারা বললো, মুহাম্মদ-এর অপেক্ষায়। তখন সে বললো, আল্লাহ্র শপথ, মুহম্মদ তো তাঁর মতলবে বেরিয়ে গেছেন! তারা উঁকি দিয়ে ঘুমন্ত আলীকে বিছানায় দেখে সন্দেহমুক্ত হলো যে, আল্লাহ্র রাসূলই শুয়ে আছেন। কিন্তু ভোরে হযরত আলী (রা)-কে বিছানা ছেড়ে উঠতে দেখে ব্যর্থতার লজ্জা ও গ্লানি নিয়ে তারা ফিরে গেলো।

[সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮০-৮৩]

ইব্‌নে সা'দের এক বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রা) বলেন, মদীনার উদ্দেশে হিজরত কালে রাসূল ﷺ লোকদের গচ্ছিত আমানতসমূহ প্রত্যর্পণ করার জন্য আমাকে তাঁর স্থলে থেকে যেতে বললেন। এজন্যই তাঁকে 'আল-আমীন' বলা হতো। যা-ই হোক, আমি তিন দিনে যাবতীয় আমানত প্রত্যর্পণ করে মক্কা থেকে বের হলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করে বনূ আমির ইব্‌ন আওফ গোত্রে উপনীত হলাম। তিনি সেখানে কুলছুম ইব্‌নুল হাদামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। আমিও তাঁর মেহমান হলাম।

[কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৫]

হযরত আলী (রা) মদীনা পর্যন্ত সমগ্র সফর দিনে আত্মগোপন করে রাতে পথ চলতেন। দীর্ঘ পথ চলায় তাঁর পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। নবী ﷺ বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে পাঠাও। তাঁকে অবহিত করা হলো যে, তিনি তো হাঁটতেই পারছেন না। তখন নবী করিম ﷺ স্বয়ং তাশরীফ নিলেন এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর পায়ের ফোলা দেখে স্নেহাতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর দুই হাতে থুথু নিয়ে

তাঁর পদদ্বয় মালিশ করে দিলেন। ফলে শাহাদাতের দিন পর্যন্ত পায়ে কখনো তিনি কোন অসুস্থতা বোধ করেন নি।

[ইব্নুল আছীরকৃত আল কামিল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৫]

রবিউল আউয়াল মাসের মধ্যভাগে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ -এর অবস্থানকালেই হযরত আলী (রা)-এর আগমন হয়েছিলো।

[তাবাকাতুল কোবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মদীনায় হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)

হিজরত থেকে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত

ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন, হযরত ফাতেমা (রা) ও হযরত আলীর (রা)-এর বিবাহ, উভয়ের দাম্পত্য জীবন যাত্রা, রাসূল ﷺ-এর সুখ-শান্তির জন্য, আদর ও ভালোবাসার উপাধি দান, বদর যুদ্ধে হযরত আরী (রা)-এর ভূমিকা, উহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধে তার সমর প্রতিভার প্রকাশ, হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাঁর শিষ্টাচার ও ভক্তির ভালোবাসায় প্রকাশ, খায়বার যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ সাহসিকতা, শেরে খোদা ও ইয়াহূদী বীর মুরাহ্হাবের মল্লযুদ্ধ, মক্কা অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অবিচল ঈমান ও বিশ্বাস, তবুক যুদ্ধকালে মদীনায় রাসূল ﷺ-এর স্থলবর্তিতা ও শান্ত্বনাদান, ইয়ামানে তাঁর হাতে হামাদান-এর ইসলাম গ্রহণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিনিধিত্ব ও বিনয়, বিদায় হজ্জ ও গাদীরেখাম-এর ভাষণ, নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মদীনায় হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হিজরত থেকে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও সাহল ইব্‌নে হুনায়ফ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছিলেন।

[তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩]

আল্লামা ইব্‌নে কাছীর (র) বলেন, হিজরতের পর রাসূল ﷺ হযরত আলী ও হযরত সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইব্‌নে ইসহাক ও অন্যান্য সীরাত ও মাগাযী সংকলকের মতে রাসূল ﷺ তাঁর নিজের সঙ্গে তার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কিত হাদীস সংখ্যায় প্রচুর হলেও সবই দুর্বল সনদ বিশিষ্ট। তদুপরি কোন কোনটির মতও নিম্ন পর্যায়ের। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬-৭) তবে হাসান সনদে বর্ণিত ইমাম তিরমিযী (র)-এর একটি হাদীস থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। শায়খ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী (র) এটাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন।

[ইযালাতুল খাফা ও তানবীরুল আইনাইন]

হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাথে আলী (রা)-এর বিবাহ

হিজরী দ্বিতীয় সনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর দুহিতা ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করলেন। তখন তিনি ফাতিমা (রা)-কে বলেছিলেন, "আমার পরিবারের প্রিয়তম ব্যক্তির সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করলাম।" অতঃপর তিনি তাঁর শরীরে পানি ছিটালেন এবং দু'আ দিলেন।

[ইযালাতুল খাফা, পৃষ্ঠা-২৫৪]

ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুহম্মদ ইব্‌ন সাম্মাক ইব্‌ন জাফর আল হাশেমী হতে আবূ আমর বর্ণনা করেছেন। ওবায়দুল্লাহ বলেন, উহুদ যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-এর সঙ্গে ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। তখন

তাঁর বয়স ছিলো পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস। আর তখন আলী (রা)-এর বয়স হয়েছিলো ২৫ বছর ৫ মাস।[১]

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে নবী-কন্যা ফাতিমা (রা)-এর পাণি গ্রহণ সম্পর্কে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাঁর কন্যার বিবাহে আবদার করার সাধ জাগলো। কিন্তু ভাবলাম, কীভাবে তা সম্ভব! আমার তো কিছুই নেই! পরে নিকট-সম্পর্ক ও সুগভীর স্নেহ-অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে পয়গাম পাঠালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সেদিন যে বর্মটা দিয়েছিলোম সেটা কোথায়? আমি বললাম, সেটা অবশ্য আছে। তিনি বললেন, এটাই তাকে মোহর দাও। [মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮০]

আলী (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, বিবাহের সময় রাসূল ﷺ তাঁর কন্যার সঙ্গে একটি 'মখমল' চাদর, খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ, দু'টি যাঁতা, একটি মশক ও দু'টি কলস পাঠিয়ে দিলেন।

[মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৪]

নব দম্পতির জীবন যাত্রা

হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তম। আর তিনি স্বয়ং ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহর প্রিয়তম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের জীবনযাত্রা ছিলো দুনিয়াবিমুখতা ও কৃচ্ছ এবং সবর ও শোকরের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত। হযরত হান্নাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (র) বলেছেন :

আমাদের কাছে এ বর্ণনা এসেছে যে, আলী (রা) বলেছেন, একনাগাড়ে বেশ কিছুদিন আমাদের ঘরে কিংবা নবীগৃহে কিছুই ছিলো না। তখন আমি পথে পরিত্যক্ত একটি দীনার দেখে 'নেবো কি নেবো না' এই ভাবনা কিছুক্ষণ মনে মনে ভাবতে থাকলাম। পরে প্রয়োজনের কঠিন তাগিদে নিয়ে নিলাম এবং আটা খরিদ করে ফাতিমাকে বললাম, আটা গুলে রুটি তৈরি কর। তিনি আটা গুলতে

---

১. শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) আলোচ্য বর্ণনার বিশুদ্ধতায় সন্দিহান হয়ে বলেছেন, তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসে সংঘটিত ওহুদের যুদ্ধে ফাতিমাকে আলী (রা) 'আমার রক্ত ধুয়ে দাও' বলেছিলেন যা বিবাহ-পূর্ব সময়ে সম্ভব ছিলো না। (ইযালাতুল খাফা, পৃষ্ঠা-২৫৪)
বস্তুত এটাই বিশুদ্ধ মত এবং এর সপক্ষে সর্বোত্তম প্রমাণ হিসেবে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তৃতীয় হিজরীর শাবানে বা রমযানে হযরত হাসান বিন আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেছেন। (ইবনে আসাকির কৃত তারিখে দামেস্ক)

শুরু করলেন। ক্লান্তি ও পরিশ্রমের তীব্রতায় তাঁর কেশগুচ্ছ চোখের ভ্রূর ওপর এসে পড়ছিলো। তিনি রুটি বানালেন আর আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন, খেতে পারো, এটা তোমার জন্য আল্লাহর পাঠানো রিযিক। [কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮]

হযরত শাবী (র)-এর সূত্রে হান্নাদ দীনাওরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ-কে বিবাহ করার পর মেষের চামড়ার একটি ফরাশ ছাড়া কিছুই 'আমাদের' মালিকানায় ছিলো না। সেটাই ছিলো রাতে আমাদের ঘুমানোর বিছানা আর দিনে উটের দানা খাওয়ার 'দস্তরখানা'। ফাতিমা ছাড়া আমাদের কোন খাদেম ছিলো না।

[কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩]

হযরত ফাতিমা (রা) হতে তিবরানীর একটি 'হাসান' সনদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন এসে বললেন, আমার দৌহিত্রদ্বয় (হাসান-হুসায়ন) কোথায়? ফাতিমা (রা) বললেন, ভোরে আমাদের ঘরে মুখে দেয়ার মত কিছু না থাকায় আলী বললেন, এদেরকে আমি (বাইরে) নিয়ে যাই। কেননা আশংকা হয় যে, এরা কান্না জুড়ে! দেবে, অথচ তোমার কাছে তো দেয়ার মতো কিছু নেই! এখন তিনি অমুক ইয়াহূদীর বাগানে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গিয়ে দেখেন, হাসান ও হুসায়ন হাতে কিছু খেজুর নিয়ে একটি জলাধারের পাশে খেলা করছে।

তখন তিনি বললেন, হে আলী! গরম তীব্র হয়ে ওঠার আগেই তোমার 'পুত্রদ্বয়কে নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে।

হযরত আলী (রা) বললেন, ভোরে আমাদের ঘরে কিছুই ছিলো না। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল! যদি একটু বসেন তাহলে ফাতিমার জন্য কিছু খেজুর যোগাড় করে নিতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে পড়লেন। এদিকে ফাতিমা (রা)-এর জন্য খেজুর যোগাড় হয়ে গেলো। সেগুলো তিনি একটি কাপড়ের টুকরায় পেঁচিয়ে রওয়ানার উদ্যোগ নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে ও আলী (রা) অপরজনকে তুলে নিলেন। [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭১]

ইমাম বুখারী (রা)-এর বর্ণনায় আছে, আলী (রা) বলেন, যাঁতায় আটা পিষতে ফাতিমা (রা)-এর খুব কষ্ট হচ্ছিলো। এমন সময় 'কিছু যুদ্ধবন্দী এসেছে' সংবাদ পেয়ে তিনি একজন খাদেম চেয়ে নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে

গেলেন। কিন্তু দেখা করতে না পেরে তিনি বিষয়টি আয়েশা (রা)-কে বলে এলেন। পরে রাসূল ﷺ তা জানতে পেরে তাশরীফ আনলেন এবং আমাদের "শয়নস্থলে' প্রবেশ করলেন। আমরা উঠে যেতে চাইলে তিনি বললেন, স্ব স্ব স্থানে থাক, এমন কি আমার বুকে তাঁর পদস্পর্শের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম কিছু তোমাদের বাতলে দেব না? শয্যা গ্রহণকালে চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ ও তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ বলবে। যা চেয়েছো তোমাদের জন্য এটা তার চেয়ে উত্তম। [বুখারী, কিতাবুল জিহাদ]

এ ঘটনার বিবরণ অপর এক সূত্রে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! ছুফফার লোকেরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করবে, অথচ তাদের খরচের জন্য আমার হাতে কিছু নেই– এ অবস্থায় আমি তোমাদের কথা ভাবতে পারি না, বরং যুদ্ধবন্দীদের বিক্রি করে সে অর্থ আহলে ছুফফার জন্য খরচ করবো। [মুসনাদে আহমাদ]

আল্লাহ্র রাসূল (রা)-এর সুখ-শান্তির জন্য

অভাবের তীব্র কষাঘাতের মাঝেও তিনি রাসূল ﷺ -এর সুখ-শান্তির জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করতেন না এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত ও জিহাদে আত্মনিয়োগ করতে পিছপা হতেন না।

ইব্নে আসাকিরের বর্ণনায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর অভাবগ্রস্ততার কথা জানতে পেরে হযরত আলী (রা) একবার কাজের সন্ধানে বের হলেন যাতে কিছু উপার্জন করে নবী ﷺ -কে সাহায্য করতে পারেন। এক ইয়াহূদীর বাগানে তিনি বালতি প্রতি একটি খেজুর মজুরিতে সতের বালতি পানি তুলে দিলেন। ইয়াহূদী তাঁকে খেজুর বেছে নেয়ার সুযোগ দিলো। আর তিনি সতেরটি আজওয়া খেজুর নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল হাসান! এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার অনাহারের কথা জেনে আপনার জন্য খাবার সংগ্রহের নিয়তে কাজের সন্ধানে বের হয়েছিলোম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাই কি শুধু এ কাজে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, "যখন কোন বান্দা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে, অভাব-দারিদ্র্য তার দিকে ঢলের চেয়েও দ্রুতবেগে ধাবিত হবে। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে সে যেন বিপদ-মুসীবতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।" [কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২১]

আদর-স্নেহের উপাধি

রাসূলুল্লাহ ﷺ আদর-স্নেহ করে তাঁকে 'আবূ তুরাব' (মাটিওয়ালা) উপাধি দান করেছিলেন।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আলী (রা) একবার বিবি ফাতিমার গৃহে প্রবেশ করলেন এবং (মনঃক্ষুণ্নতার কারণে) বের হয়ে মসজিদে গিয়ে শুয়ে থাকলেন। নবী ﷺ ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতিমা বললেন, তিনি মসজিদে আছেন।

নবী ﷺ সেখানে গিয়ে দেখেন, চাদর সরে গিয়ে তাঁর পিছে মাটি লেগে আছে। তখন তিনি তাঁর পিঠের মাটি মুছে দিয়ে দু'বার বললেন, ওঠ, হে আবূ তুরাব!
[বুখারী, মানাকিব অধ্যায়]

বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা)

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বস্তুত বদর ছিলো ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণকারী এক চূড়ান্ত যুদ্ধ যা ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করে দিয়েছিলো। [বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এবং লেখকের 'নবীয়ে রহমত' (বাংলা অনুবাদ) গ্রন্থে]

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুসলমানদের সামনে এসে তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন, তখন রাবীয়ার দুই পুত্র ওতবা ও শায়বা এবং শায়বার পুত্র ওয়ালীদ– এই তিনজন উভয় শিবিরের মাঝে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ডাক দিলো। তাদের মুকাবিলায় তিন আনসারী জোয়ান অগ্রসর হলেন। তারা বললো, তোমরা কারা? তাঁরা বললেন, আমরা আনসার। তারা বললো, সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, তবে আমাদের কওমের কাউকে পাঠাও।

তাদের মর্যাদা ও যুদ্ধকুশলতার কথা রাসূল ﷺ খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন। কেননা তারা ছিলো কুরায়শের সেরা যুদ্ধবীর। অবশ্য তাদের মুকাবিলার উপযোগী বহু বাহাদুর ও শাহ সওয়ার কুরায়শী মুহাজির ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকটতম রক্ত সম্পর্কের তিনজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "দাঁড়াও হে হামযা, দাঁড়াও হে আলী, দাঁড়াও হে ওবায়দা!" নিকটতমদের জীবন রক্ষার চিন্তায় সহজেই তিনি অন্যাদের কথা বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। আলী, হামযা ও ওবায়দাকে দেখে ওতবার দল বললো, হাঁ, এবার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বটে!

বয়সে সবার প্রবীণ হযরত ওবায়দা ওতবার মুকাবিলা করলেন। পক্ষান্তরে হযরত হামযা ও আলী যথাক্রমে শায়বা ও ওয়ালীদ ইব্ন ওতবার মুকাবিলা করলেন।

প্রথম আঘাতেই তাদের হত্যা করে ফেললেন। কিন্তু হযরত ওবায়দা প্রতিপক্ষকে গুরুতর আহত করে নিজেও অনুরূপ আহত হলেন। তখন হযরত হামযা ও আলী (রা) শত্রু নিধন করে হযরত ওবায়দা (রা)-কে বহন করে আনলেন। অতঃপর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

[সীরাতে ইব্ন হিশাম, পৃষ্ঠা-৬২৫]

হযরত কাতাদাহ (র)-এর সূত্রে ইব্ন সাআদ (র) বলেন, বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা) আল্লাহর রাসূলের পতাকাবাহী ছিলেন।

[তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩]

হাফেয ইব্ন আসাকির (র) বলেন, বদর যুদ্ধে গনীমত থেকে যুলফিকার তলোয়ারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নফলরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরে সেটা তিনি হযরত আলী (রা)-কে দান করেছিলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭]

উহুদ যুদ্ধ

তৃতীয় হিজরী শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো এবং আল্লাহ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য 'মদদ' নাযিল করেছিলেন। ফলে মুশরিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হলো এবং স্ত্রীলোকেরা পলায়ন করলো।

এদিকে রাসূল ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (রা)-এর নেতৃত্বাধীন পঞ্চাশ জনের এক তীরন্দাজ দলকে নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন শত্রুবাহিনীর অশ্বদলকে বর্শার অগ্রভাগে ঠেকিয়ে রাখো, যেন তারা আমাদের পশ্চাদ্ভাগে হানা দিতে না পারে। জয়-পরাজয় যা-ই হোক, তোমরা স্বস্থানে অবিচল থাকবে। তিনি এও বললেন, 'পাখির ঝাঁক শহীদানের লাশ ঠুকরে খাচ্ছে দেখেও নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করা চলবে না। কিন্তু পরাজিত বাহিনীর ছত্রভঙ্গ পলায়ন দেখে ও বিজয় নিশ্চিত ভেবে তীরন্দাজ দল তাদের অবস্থান ত্যাগ করলো এবং মূল বাহিনীর সঙ্গে গনীমত সংগ্রহে যোগ দিলো। তখন দল নেতা আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূলের সাবধান বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন। যুদ্ধ শেষ ভেবে তাঁরা তাঁর কথায় আমল দিলেন না এবং তাঁরা মনে করেছিলেন মুশরিক বাহিনী আর ফিরে আসবে না। অবস্থান ত্যাগের ফলে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ অরক্ষিত হয়ে পড়লো

এবং সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কুরায়শদের অশ্বদল পেছন দিক থেকে প্রচণ্ড হামলা চালালো। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে বলে উঠলো, শোন, "মুহাম্মদ নিহত হয়েছেন।" ফলে মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে লাগলো। তখন সম্মুখ থেকেও হামলা শুরু হলো এবং মুসলমানদের ওপর বিপর্যয় নেমে এলো, এমন কি শত্রুদল রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছে গেলো। ফলে তিনি প্রতিপক্ষের প্রস্তরাঘাতে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর নিচের পাটির সম্মুখভাগের ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গেলো। মাথা জখম হলো এবং ঠোঁট ফেটে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানস্থল তখন মুসলমানগণ জানতে পারছিলো না। হযরত আলী ও তালহা ইব্ন ওয়াবদুল্লাহর সাহায্যে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আর মালিক ইব্ন সিনান তাঁর পবিত্র চেহারা হতে রক্ত চুষে নিলেন।

বুখারী বর্ণনামতে সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জখম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই জানি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জখম কে ধুয়েছিলেন, কে পানি ঢেলেছিলেন এবং কী বস্তু দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছিলো। তিনি বলেন, নবী-দুহিতা ফাতিমা (রা) তাঁর জখম ধুয়ে দিয়েছিলেন আর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ঢালে করে পানি ঢেলেছিলেন। কিন্তু রক্ত ক্ষরণ বন্ধ না হয়ে বেড়েই চলেছে দেখে ফাতিমা (রা) এক টুকরো চাটাই পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হলো। [বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : উহুদ যুদ্ধ]

ইব্ন কাছীর (র) বলেন, উহুদ যুদ্ধে আলী (রা) ছিলেন বাহিনীর দক্ষিণ বাহুতে এবং মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)-এর শাহাদাতের পর পতাকা ছিলো তাঁর হাতে। সেদিন তিনি বিপুল বিক্রমে মুশরিক নিধন করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের রক্ত ধুয়ে দিয়েছিলেন যা মাথার জখম ও ভাঙ্গা দাঁত থেকে গড়িয়ে পড়ছিলো।[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪]

খন্দক যুদ্ধে আলী (রা)-এর যুদ্ধকুশলতা

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধ ছিলো ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এর প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারী। বস্তুত এটা ছিলো চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারক যুদ্ধ যাতে মুসলমানদের অস্তিত্ব এমনভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো যা ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। সে মহাদুর্যোগের যে চিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ্ পেশ করেছেন তার চেয়ে নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র আর কী হতে পারে!

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ـ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ـ

"(স্মরণ করো) যখন তারা তোমাদের ওপর চড়াও হলো তোমাদের ঊর্ধ্বভূমি হতে এবং তোমাদের নিম্নভূমি হতে এবং যখন চক্ষু উল্টে গেলো এবং হৃদয় কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে গেলো আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতে লাগলে। ঐ সময় মু'মিনদের 'পরীক্ষা' করা হয়েছিলো এবং তারা ভীষণ প্রকম্পিত হয়েছিলো।" [সূরা আহ্যাব ঃ ১০-১১]

এ যুদ্ধে প্রথমবারের মতো হযরত আলী (রা)-এর যুদ্ধকুশলতা ও শৌর্য-বীর্য অনন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছিলো। শত্রুর হামলার আশংকায় মদীনার উত্তর-পশ্চিমের অরক্ষিত সমভূমিতে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর প্রস্তাবে যে পরিখা খনন করা হয়েছিলো সেটাই ছিলো মুসলিম ও কুরায়শ-গাতফান বাহিনীর মাঝে অন্তরায়। এ যুদ্ধে তাদের সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিলো। কুরায়শের একদল অগ্রগামী ঘোড়-সওয়ার পরিখা প্রান্তে এসে হতবাক হয়ে গেলো। কেননা আরবদের যুদ্ধ ইতিহাসে এটা ছিলো সম্পূর্ণ নতুন কৌশল। অতঃপর তারা পরিখার অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ স্থানে এসে ঘোড়াসহ ঝাঁপ দিয়ে পরিখা পার হলো এবং মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঘোড়া দৌড়ে বেড়াতে লাগলো। তাদের একজন আমর ইব্ন আবদে ওদ ছিলো হাজারে এক বলে খ্যাত অশ্বযোদ্ধা। সে ঘোড়া থামিয়ে হুংকার দিলো— আছে কোন্ লড়াকু?

হযরত আলী (রা) অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আমর! তুমি আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করনি যে, কোন কুরায়শী দু'টি আবদার করলে একটি আবদার তুমি অবশ্যই রক্ষা করবে? আমর বললো, তা ঠিক। হযরত আলী (রা) তখন বললেন, আমি তোমাকে ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান করছি।

আমর বলল, আমার সে প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (রা) তখন বললেন, তবে আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করছি। সে বললো, কেন ভাতিজা! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে কতল করতে চাই না। আলী (রা) বললেন, কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমার খুন দেখতে চাই।

তখন বীরত্বের লড়াই হলো এবং আমরের খুনে হযরত আলীর তলোয়ার রাঙ্গা হলো। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০০]

কুরায়শ মিত্র বনূ কুরায়যা ও কুরায়শের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়ার মুখে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শীতের রাতে ভীষণ 'বায়ু প্রবাহ' প্রেরণ করলেন। ফলে তাদের রান্নার ডেগ উল্টে গেলো এবং তাঁবুসমূহ উপড়ে গেলো। এরপর যুদ্ধে সাহস হারিয়ে কুরায়শরা পলায়নের পথ ধরলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন,

"আজ থেকে কুরায়শরা তোমাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধযাত্রা করবে না, বরং তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে।"

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৬]

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত আলী (রা)-এর নবী–ভক্তি

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫)। মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ ও উমরা পালনের অনুমতি দান প্রশ্নে অনেক বাদানুবাদ ও চরম বিরোধিতার পর কুরায়শরা সুহাইল ইব্ন আমরকে দূত হিসেবে পাঠালো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন লোক প্রেরণ করে সন্ধির ব্যাপারে কুরায়শরা আন্তরিকতারই পরিচয় দিয়েছে।

আলাপ-আলোচনার পর সন্ধিপত্র লেখার সময় হযরত আলী (রা)-কে ডেকে তিনি বললেন, লেখ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'।

সুহাইল ইব্ন আমর তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! 'রহমান' কে আমরা চিনি না। তবে আগে যেমন লিখতে সেভাবে 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে পারো।

মুসলমানগণ বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ব্যতীত অন্য কিছু লিখবো না। তখন নবী ﷺ বললেন, তাই হোক! লেখ, বিসমিকা আল্লাহুম্মা।

অতঃপর তিনি বললেন, লেখ, আল্লাহর রাসূল এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছেন। একথা শুনে সুহাইল বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা যদি স্বীকার করতাম যে, তুমি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আল্লাহর ঘরে তোমাকে প্রবেশে কেন বাধা দেব? কেনই বা লড়াই করবো? তবে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ লিখতে পারো।

নবী ﷺ বললেন, তোমরা অবিশ্বাস করলেও আমি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে 'আল্লাহর রাসূল' মুছে "মুহাম্মদ ইব্ন

আবদুল্লাহ্" লিখতে বললেন। তখন হযরত আলী নবী-প্রেমের জযবায় বলে উঠলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তা মুছতে পারবো না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আচ্ছা, আমাকে দেখিয়ে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন।

[সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি]

খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর বীরত্ব

সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত খায়বার যুদ্ধে একদিকে শেরে খোদা হযরত আলী (রা)-এর সাহস ও বীরত্ব যেমন ফুটে উঠেছিলো অন্যদিকে তেমনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট তাঁর অনন্য মর্যাদার বিষয়টিও সমুজ্জ্বল হয়েছিলো। কেননা কৌশলগত সাময়িক গুরুত্বের অধিকারী এই ইয়াহূদী উপনিবেশের ওপর বিজয় গৌরব আল্লাহ্ হযরত আলী (রা)-কেই দান করেছিলেন।

খায়বার ছিলো ইয়াহূদীদের সুরক্ষিত দুর্গবেষ্টিত যুদ্ধ ঘাঁটি এবং গোটা আরব উপদ্বীপে তাদের শেষ আশ্রয় কেন্দ্র। এখান থেকেই পরিচালিত হতো ইসলামবিরোধী তৎপরতা এবং মদীনার ভেতরের ও বাইরের ইয়াহূদীদের সাথে যোগসাজশের চক্রান্ত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহূদী চক্রান্ত থেকে শংকামুক্ত হওয়ার জন্য খায়বার জয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। মদীনার উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে ছিলো খায়বারের অবস্থান।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চৌদ্দ'শ মুজাহিদ নিয়ে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলেন। একে একে সকল দুর্গের পতন হলো। কামূছ দুর্গ অপরাজিত রয়ে গেলো। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তখন চক্ষুপীড়ায় ভুগছিলেন।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আগামীকাল ঝাণ্ডা ধারণ করবেন এমন একজন, আল্লাহ্ ও রাসূল যাঁকে ভালোবাসেন। তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হবে।"

প্রবীণ সাহাবাগণ প্রত্যেকে এ আশায় উঁচু হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন যে, হয়তো তিনিই হবেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হযরত আলী (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর চোখে থুথু দিয়ে দু'আ করলেন। ফলে তাঁর চক্ষুপীড়া এমন ভালো হলো যে, মনে হলো তাতে কোন পীড়া ছিলো না। অতঃপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন।

আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবো যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো ইসলাম গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ধীরস্থিরভাবে তাদের এলাকায় হাযির হও। অতঃপর ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র হকসমূহ অবহিত করো। আল্লাহ্‌র শপথ! মাত্র একজনও যদি তোমা দ্বারা আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন তাহলে তোমার জন্য তা লাল উটের পাল হতে উত্তম।

[বুখারী ও মুসলিম, অনুচ্ছেদ : খায়বর যুদ্ধ]

শেরে খোদা ও ইহুদী বীর মুরাহ্‌হাবের মধ্যে লড়াই

হযরত আলী (রা) যখন কামূছ দুর্গে উপনীত হলেন তখন সুবিখ্যাত যোদ্ধা মুরাহ্‌হাব যুদ্ধের গান গেয়ে বীর দর্পে হাযির হলো। কিন্তু আঘাত পাল্টা আঘাতের মাঝে আলী (রা)-এর তলোয়ার অকস্মাৎ ঝলসে উঠলো এবং মুরাহ্‌হাবের শির ও শিরস্ত্রাণ দুই টুকরা হয়ে গেলো এবং বিজয় সম্পন্ন হলো। ইব্‌নে হিশামের বর্ণনায় (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৪) মুহাম্মদ বিন মাসলামাহর নাম এসেছে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ মতে হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা)-ই মুরাহ্‌হাবকে হত্যা করেছিলেন, (তাবারী, পৃষ্ঠা ১৫৭৯)। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং আলী (রা)-এর আবৃত্তিকৃত রণগীতিও তাতে বর্ণিত হয়েছে। আর বলা বাহুল্য, ইমাম মুসলিমের নিজস্ব সনদ অধিকতর নির্ভর ও অগ্রাধিকারযোগ্য। [দেখুন মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৮০৭]

বিশুদ্ধ সনদে ইব্‌নে আবী শায়বা হযরত লায়ছ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আবূ জাফরকে দেখতে গেলাম। তিনি নিজের গুনাহ ও আযাবের কথা ভেবে কাঁদছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, জাবির (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রা) খায়বার যুদ্ধের দিন দুর্গদ্বার উপড়ে ফেলেছিলেন। পরে মুসলমানগণ দুর্গ দখল করেছিলেন, আর জাবির নিজে চেষ্টা করে দেখেছেন। কিন্তু চল্লিশ জনের কমে তা ওঠানো সম্ভব হয়নি। আল্লামা ইব্‌নে কাছির যদিও খায়বারের দুর্গদ্বার সংক্রান্ত এ হাদীসকে (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯০) দুর্বল বলেছেন, কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এ ঘটনা প্রসিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসানের সূত্রে, তিনি তাঁর কোন নিকটজনের সূত্রে ও তিনি আবূ রাফে (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহূদীর আঘাতে হযরত আলীর হাত থেকে ঢাল পড়ে গেলো। তখন তিনি দুর্গের একটি দরজাকেই ঢাল রূপে তুলে নিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে খায়বারের বিজয় দান করা পর্যন্ত ঐ দরজা তাঁর হাতেই ছিলো। পরে তিনি তা ফেলে দিয়েছিলেন।

আবূ রাফে বলেন, এখানো আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে। খায়বার যুদ্ধের দিন আমরা আটজন মিলে সেই দরজাটি উল্টাতে চেয়েছিলোাম কিন্তু পারিনি। পক্ষান্তরে লায়ছ আবূ জাফরের সূত্রে আর তিনি জাবিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশ জনে মিলে ঐ দরজা ওঠাতে পেরেছিলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৫]

রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অবিচল ঈমান ও বিশ্বাস

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলকে রসদপত্র সংগ্রহের আদেশ দিলেন এবং এ বিষয়ে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা অবলম্বনপূর্বক দু'আ করলেন।

اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى تبغتها فى بلادها ـ

'হে আল্লাহ্! গুপ্তচর ও গুপ্ত খবর কুরায়শের নাগাল থেকে দূরে রাখ যেন তাদের ভূমিতে তাদের ওপর হঠাৎ করে হানা দিতে পারি।

[যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২১]

মক্কা হতে মদীনায় হিজরতকারী হযরত হাতিব ইব্ন আবী বালতাআ (রা) ছিলেন বদরী সাহাবী। মক্কায় তিনি ছিলেন কুরায়শের আশ্রিত। তাঁর রক্তের কোন সম্পর্ক ছিলো না। সুতরাং মক্কায় রেখে আসা পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মতো কোন অবলম্বন কুরায়শ গোত্রে তার ছিলো না। তিনি ভাবলেন, আত্মীয়তার অবলম্বন তো নেই, সুতরাং উপকারের অবলম্বন গ্রহণ করি না কেন, যাতে কৃতজ্ঞতার তাগিদে কুরায়শরা সদয় ও সুপ্রসন্ন হয়।

এ চিন্তায় প্রণোদিত হয়ে কুরায়শদেরকে তিনি অভিযানের খবর দিয়ে গোপন পত্র লিখলেন এবং একজন স্ত্রীলোককে বিপুল উপহারের বিনিময়ে পত্র বহনের দায়িত্ব দিলেন।

এ ছিলো একটি ভুল পদক্ষেপ, যা আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাকে ভাল বলেছেন। তিনি বলেছেন, আহলে বদরের অবস্থা আল্লাহ্ জানেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم যা ইচ্ছা করো, তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

[যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১]

স্ত্রীলোকটি চুলের বেণীতে পত্র লুকিয়ে রওয়ানা হলো। এদিকে আসমানী সূত্রে খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ও যুবায়র (রা)-কে এ নির্দেশসহ

পাঠালেন, "তোমরা দু'জন 'রওয়াতুল খাস' স্থানে উপনীত হও। সেখানে এক বুড়ীর কাছে কুরায়শের নামে লেখা পত্র রয়েছে।"

তারা ধাবমান ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন এবং কথিত স্থানে স্ত্রীলোকটিকে পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে স্ত্রীলোকটি পত্রের কথা সাফ অস্বীকার করলো। সওয়ারী তল্লাশি করেও কিছু পাওয়া গেলো না। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র রাসূল অসত্য বলেন নি আর আমরাও মিথ্যা বলছি না। আল্লাহ্‌র শপথ! হয় পত্র বের করে দেবে অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে দেখবো। এই হাবভাব দেখে স্ত্রীলোকটি বললো, আচ্ছা, একটু ঘুরে দাঁড়াও। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন আর স্ত্রীলোকটি খোপা খুলে পত্রটি তাদের হাতে তুলে দিলো। আর তারা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

[যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১]

আলী (রা)-কে নবীজীর সান্ত্বনা দান

নবম হিজরী, রজব মাসের তাবুক অভিযান ছিলো 'সীরাতুন্নবী'র অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। বস্তুত তাবুক অভিযানের মাধ্যমে অর্জিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল আরব ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবনে ও ইসলামের ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। [দেখুন নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা ৩৬১-৭২]

এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ আনসারী (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে আহলে বায়তের তত্ত্বাবধায়করূপে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। এ সময় মুনাফিকদের কিছু অসংযত কথায় ব্যথিত হযরত আলী (রা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছিলেন, আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসার সঙ্গে হারুন যেমন ছিলেন তুমি আমার সঙ্গে তেমন হয়ে থাকবে। পার্থক্য শুধু এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই। [বুখারী, অনুচ্ছেদ : তাবুক যুদ্ধ]

অন্য বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আলী (রা)-কে মদীনায় আপন স্থলবর্তী নিযুক্ত করলেন, তখন তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবলা নারী ও শিশুদের সাথে আমাকে রেখে যাচ্ছেন...... ।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫]

ইয়ামানে প্রেরণ ও হামাদানের ইসলাম গ্রহণ

নবম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও তাবুক অভিযানের পর চতুর্দিক থেকে মদীনায় প্রতিনিধিদলের ঢল নামলো এবং দলে দলে আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণ করতে

লাগলো। এ সময় ইয়ামানী ও আশ'আরী প্রতিনিধিদল এই আনন্দগীত আবৃত্তি করে করে এসেছিলো :

غدا تلقى الاحبة محمداً وحزبة۔

"আগামীকাল দেখা হবে বন্ধুদের সঙ্গে, মুহম্মদ ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে।"

আল্লাহ্র রাসূলও আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন :

اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والين قلوبا الايمان يمان والحكمة يمانية۔

"আহলে ইয়ামান তোমাদের মাঝে এসেছে; তারা হলো কোমল চিত্ত ও বিনম্র হৃদয়। ঈমান ও হিকমত হলো ইয়ামানের সম্পদ।"

[যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২]

রাসূল ﷺ হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে একদল মুসলমানের নেতারূপে ইয়ামানে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠালেন। তারা সেখানে ছয় মাস অবস্থান করলেন কিন্তু আহলে ইয়ামান খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত কবুল করলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাওয়াতনামা পড়ে শোনালেন। তখন হামাদানবাসী সকলে ইসলাম গ্রহণ করলো। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হামাদানীদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ-পত্র দিলেন। রাসূল ﷺ পত্র পাঠ করে সেজদায় পড়ে গেলেন। অতঃপর মাথা তুলে বললেন, হামাদানবাসীকে সালাম! হামাদানবাসীকে সালাম!

[যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩]

আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিনিধিত্ব লাভ ও বিনয়-নম্রতা

নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে বছর হযরত আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মুসলমানদের জন্য হজ্জ অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব দিলেন। মক্কার মুশরিকরা তখনও তাদের বাসস্থানে বাস করছিলো।

হজ্জ পালনে ইচ্ছুক তিন শত মুসলমানের কাফেলা আবূ বকর (রা)-এর সাথে মদীনা হতে রওয়ানা হলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর সূরা তাওবা নাযিল হলো। তখন তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ডেকে বললেন, সূরা তাওবার প্রথমাংশের এই

ঘোষণাটুকু নিয়ে তুমি রওয়ানা হও এবং কুরবানীর দিন মিনায় সমবেত লোকদের মাঝে ঘোষণা কর, কোন কাফের জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসবে না। কোন নগ্ন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে কারো জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে তা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর 'আল আযবা' উটনীতে সওয়ার হলেন এবং (পথে) আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। আবূ বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমীর না মামূর?

আলী (রা) বললেন, আমি আমীর নই, মামূর।

অতঃপর উভয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং আবূ বকর (রা) হজ্জ অনুষ্ঠান করলেন। কুরবানীর দিন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) লোকদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশপ্রাপ্ত ঘোষণা প্রচার করলেন।

[সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫-৬]

বিদায় হজ্জ ও গাদীরেখুম-এর ভাষণ

বিদায় হজ্জে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল তেষট্টিটি উটনী নিজ হাতে যবেহ করেছেন। এটা ছিলো তাঁর জীবনের বয়সের সমান সংখ্যা। অতঃপর তিনি নিজে বিরত থেকে আলী (রা)-কে এক'শ উটের অবশিষ্টগুলো যবেহ করার আদেশ দিলেন। তিনি যবেহ করে এক'শ পূর্ণ করলেন।

আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন পূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উপস্থিত হলেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। অতঃপর লোকদেরকে (যার যার ঠিকানায়) ফিরে যাবার আদেশ দিয়ে তিনি নিজে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। গাদীরেখুম (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জলাশয়) নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ভাষণ দান করলেন। তাতে আলী (রা)-এর গুণ বর্ণনা করে বললেন,

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ـ

"আমি যার অভিভাবক", আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্, তার বন্ধুর আপনি বন্ধু হোন এবং তার শত্রুর আপনি শত্রু হোন।"

[সীরাতে ইব্‌নে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৫-৪১৬]

কারণ এই যে, আলী (রা) সম্পর্কে একদল লোকের অভিযোগ ছিলো। ইয়ামানে যারা তার সঙ্গে ছিলো তাদের দু'একজনের প্রতি তিনি তো সুবিচার করেছিলেন কিন্তু তারা সেটাকে অবিচার, অসদাচার ও কৃপণতা ভেবে তার সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

[প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪]

ইব্‌নে কাছীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ শেষে মদীনায় ফেরার পথে গাদীরেখুম নামক স্থানে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তারিখ হলো ১৮ যিলহজ্জ রোজ রবিবার। তখন তিনি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে আলী (রা)-এর ইনসাফ, আমানতদারি, নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেন। ফলে অনেকের অন্তরে তাঁর সম্পর্কে যে খারাপ ধারণা বিদ্যমান ছিলো তা দূর হয়ে যায়। এখানে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রধান হাদীসগুলো 'বিশুদ্ধ ও দুর্বল' নির্ণয়পূর্বক বর্ণনা করবো।

অতঃপর আল্লামা ইব্‌নে কাছীরের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্পর্কে ভেজাল-নির্ভেজাল ও ভুল-নির্ভুল সব রকম বর্ণনাই রয়েছে। কেননা অনেক মুহাদ্দিস বিশুদ্ধ ও দুর্বল নির্বিশেষে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক সব কিছুই পরিবেশনের অভ্যাস অনুসরণ করেছেন। [আল বিদায়া, ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল

সৃষ্টিজগতে যেমন তেমনি নবী-রাসূলগণের মাঝেও আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান কার্যকর হয়ে আসছে। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ.

"মুহাম্মদ তো রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল বিগত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে?" [সূরা আলে ইমরান : ১৪৪]

এদিকে দীন ও শরীয়তের প্রচার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সুসম্পন্ন হলো এবং দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণের 'দৃশ্য' দেখিয়ে আল্লাহ্ তাঁর নবীর চক্ষু জুড়িয়ে দিলেন। এভাবে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভে শুভ ইঙ্গিত প্রকাশ পেলো। সর্বোপরি আপন স্বচ্ছতা ও মৌলিকতার ওপর দীনের পূর্ণ হিফাজত ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবুয়তের ছায়ায় আপন তত্ত্বাবধানে যে 'আল-জামাআত' গড়ে তুলেছিলেন তাদের ব্যাপারে

তিনি পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন। যখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত প্রমাণের প্রকাশ ঘটলো তখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে 'মিলন'-এর জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর মিলন পছন্দ করলেন। এ সময় তিনি বেশ কয়েকটি খুতবার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অসিয়ত করলেন এবং পাঁচ থেকে নয়টি দীনারের মতো সামান্য যা অবশিষ্ট ছিলো তা দান করার ব্যবস্থা করলেন। তারপরও তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ সম্পর্কে মুহম্মদের কী ধারণা, যদি তিনি এই মাল রেখে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে যান, হে আয়েশা! এগুলো তুমি দান করার ব্যবস্থা করো।" [মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯]

অসুস্থতা যখন তীব্র রূপ ধারণ করলো আর তিনি অযূ করে সালাতের জন্য রওয়ানা হলেন, তখন অচেতন হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসা মাত্র জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? তাঁকে অবহিত করা হলো, না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

লোকেরা তখন মসজিদে ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অপেক্ষায় স্থির হয়ে বসে ছিলেন। তখন তিনি আবূ বকর (রা)-কে সালাত আদায়ের আদেশ পাঠালেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন 'নরম দিল' মানুষ। তাই তিনি বললেন, হে উমর! তুমি সালাত পড়াও। হযরত উমর (রা) বললেন, এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে অধিক হকদার। তখন তিনি ঐসব দিন নামায পড়ালেন।

এর মাঝে একবার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আব্বাস ও আলী (রা)- এ দু'জনের কাঁধে ভর করে যোহর সালাতের জন্য বের হলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে দেখে পিছিয়ে আসতে উদ্যত হলেন। তখন তিনি তাঁকে ইঙ্গিতে বারণ করলেন এবং উভয়কে আদেশ করলেন তাঁকে আবূ বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দিতে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে নামায পড়লেন।

[বুখারী, অনুচ্ছেদ : মাবাদুন্নাবী ﷺ ওয়া ওফাতিহি]

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত ও যাকাতের প্রতি যত্নবান হতে এবং দাসদাসীদের প্রতি উত্তম আচরণের অসিয়ত করেন।

[মুসনাদএর বরাতে সীরাতে ইব্নে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৩]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁর 'তত্ত্ব' নিতে নিকটবর্তী হলাম, তখন তিনি আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করে বললেন,

في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى

(সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে, সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে)

তাঁর সামনে মশক ও পানির পেয়ালা রক্ষিত ছিলো। তিনি পানিতে হাত ভিজিয়ে মুখে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। মৃত্যু যন্ত্রণা অবধারিত। অতঃপর তিনি বাম আঙ্গুল উঠিয়ে বলতে লাগলেন, 'সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্যে। এভাবে অবশেষে তাঁর রূহ মোবারক কবয করা হলো এবং তাঁর হাত পানির পাত্রে ঢলে পড়লো।

সাহাবা কিরামের গভীর নবী-প্রেমের কারণে এ মৃত্যু সংবাদ তাঁদের জন্য ছিলো বজ্রপাতের মতো। তাছাড়া সন্তানের জন্য পিতার স্নেহকোল যেমন, সাহাবা কেরামের জন্য নবী ﷺ -এর স্নেহচ্ছায়া তো ছিলো তার চেয়ে অনেক বড় ও মূল্যবান। নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক এবং বিশুদ্ধ স্বভাব ও ফিতরতের স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী সাধারণভাবে আহলে বায়ত ও হাশেমী পরিবার, বিশেষভাবে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আলী ইব্‌নে আবূ তালিব (রা)-এর জন্য এ শোক ও বেদনা ছিলো অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কেননা প্রগাঢ় প্রেম, কোমল অনুভূতি ও উষ্ণ আবেগ ছিলো হাশেমী পরিবারের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঈমানের অসাধারণ শক্তি ও আল্লাহ্‌র ফায়সালার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণের গুণে এ মহাশোক তাঁরা সংবরণ করতে পেরেছিলেন। আহলে বায়তের সদস্যগণই কাফন-দাফনের দায়িত্ব পালন করেছেন, নবীর সঙ্গে তাঁদের ভালোবাসার সম্পর্ক তো ছিলো এমন যা দু'জন মানবের মাঝে কিংবা কোন নবী ও তাঁর উম্মতের মাঝে অথবা কোন প্রেমিক ও তাঁর প্রেমাস্পদের মাঝে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তবু কেউ তাঁর জন্য বিলাপ করেনি। কেননা এ সম্পর্কে তাঁর কঠোরতম নিষেধাজ্ঞা ছিলো। জীবনসায়াহ্নে তিনি বলেছেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.

"ইহূদী ও খ্রীস্টানদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। কেননা তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদা-ক্ষেত্র বানিয়েছিলো।"

একথা বলে তাদের কর্মকীর্তি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে তিনি সতর্ক করেছিলেন। [বুখারী]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ১১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার অপরাহ্নে ইন্তেকাল করেন।

বস্তুত মুসলিম উম্মাহ্ ও সমগ্র মানব জাতির জন্য এ দিনটি ছিলো কঠিনতম ও অন্ধকারতম দিন, যেমন তাঁর জন্মদিন ছিলো পৃথিবীর প্রথম সূর্যোদয়ের পর চরম সৌভাগ্যের দিন। [আস-সীরাতুন্নবুবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৯৩-৪০৭]

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

নাযুক সময় সন্ধিক্ষণ, প্রাচীন ধর্মগুলোর পরিণতি, নবীর খিলাফত ও দায়দায়িত্ব, এ মানদন্ডে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উত্তীর্ণতা, ইসলামে শূরা-এর ভূমিকা এবং আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত– আবূ বকর (রা)-এর হাতে বাইয়াতে বিলম্বে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত লাভের হিকমত, প্রথম দুর্যোগ ও সিদ্দীকী দৃঢ়তা, ফাতেমা (রা)-এর মনঃকষ্ট, আলী (রা)-এর বাই'আত গ্রহণ পরীক্ষার মুখে আলী (রা)-এর অবিচলতা, আবূ বকর (রা)-এর প্রতি আলী (রা) এর সর্বাত্মক আন্তরিক সহযোগিতা, নবী পরিবারের প্রতি আবূ বকর (রা)-এর আন্তরিক শ্রদ্ধা- এক নযরে খলীফা আবূ বকর (রা)-এর জীবন কুরআন সংকলন– আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর আলী (রা)-এর উচ্চ প্রশংসা।

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

ভয়াবহ নাযুক মুহূর্ত

ইতিহাসের যত ক্রান্তিকাল ও নাযুক পরিস্থিতি এই উম্মাহ অতিক্রম করে এসেছে তন্মধ্যে মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকাল অন্যতম নাযুকতম মুহূর্ত। কেননা জাহিলিয়াতের মহাসমুদ্রে ইসলাম তখনও ছিলো এক ক্ষুদ্রতম দ্বীপ, শিরক, কুফর, পাশবিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ঘুটঘুটে অন্ধকারপূর্ণ দাপটের সাথে তখনো বিদ্যমান ছিলো। অন্যদিকে ইসলামের সুশৃংখল জীবনে সদ্যপ্রবেশকারী আরবরা তাদের বিগত গোত্রীয় জীবনে কোন 'শাসন-বন্ধনে' অভ্যস্ত ছিলো না।

ইসলাম-পূর্ব যেসব ধর্ম অতি দ্রুত পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ও বিশাল জনপদ আপন অধিকার ও প্রভাব বলয়ে নিয়ে এসেছিলো সেগুলো বিভিন্ন বিচ্যুতি ও বিকৃতির এবং ভেতর-বাইরের চক্রান্ত ও হানাহানির শিকার হয়ে পড়েছিলো। এজন্য ধর্ম প্রবর্তকদের স্থলবর্তী ধর্মব্যবস্থাপক ও ধর্ম নেতাদের দুর্বলতাই ছিলো দায়ী। কেননা হয় তারা ধর্মের মূল সত্য ও মর্মবাণী অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন কিংবা ধর্মের প্রতি তাদের আন্তরিকতা এবং ধর্মের মৌলিকতা ও স্বচ্ছতা রক্ষায় তাদের আত্মনিবেদন ও সংবেদনশীলতার অভাব ছিলো অথবা তুচ্ছ দুনিয়ার মোহ, পদ ও সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতায় তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ফলে যেসব সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনদর্শন নির্মূল করার জন্য ধর্মের প্রবল উত্থান ঘটেছিলো সেগুলোর মাঝেই স্বয়ং 'ধর্ম' বিলীন হয়ে গিয়েছিলো কিংবা নব ধর্মগ্রহণকারী শাসক ও সরকারগুলোর দাবি ও স্বার্থ রক্ষায় সমঝোতা করে নিয়েছিলো এবং তাতেই নিষিক্ত হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে নবদীক্ষিত শাসক ও সরকারবর্গ ধর্মের যতটা না উপকার করেছে তার চেয়ে বেশি নিজেরা উপকৃত হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জুরথুস্ত্রীয় ধর্মগুলোর ভাগ্যে তাই ঘটেছিলো। আবির্ভাবের পরপর ইহুদী ধর্ম ও হযরত ঈসা (আ)-এর তিরোধানের পর খ্রীস্ট ধর্মও একই ভাগ্য বরণ করেছিলো।

প্রাচীন ধর্মগুলোর পরিণতি

ইসলামের দৃষ্টিতে ইহুদী ও খ্রীস্টানরা হলো আহলে কিতাব এবং তাদের ধর্ম হলো আসমানী ধর্ম। তাই ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্ম সম্পর্কেই আমরা প্রথমে আলোচনা করবো।

ইহুদী ধর্মের বিশ্বকোষ বলে, দেবদেবী ও মূর্তি পূজার প্রতি 'ভাববাদিগণের' ধিক্কার প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ইসরাইলীদের মাঝেই এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো, এমন কি ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে তাদের প্রত্যাবর্তনের দিনগুলো পর্যন্ত এর মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়নি, বরং শিরক ও কুসংস্কারপূর্ণ বিভিন্ন বিশ্বাস তারা গ্রহণ করে নিয়েছিলো। [Jewish Encyclopaedia. VoL. XII. P-568-569]

অন্যদিকে খ্রীস্ট ধর্ম প্রথম যুগ থেকেই গোঁড়া ও মূর্খ লোকদের বিবৃতি ও বিকৃতির এবং নবদীক্ষিত রোমকদের পৌত্তলিকতার শিকার হয়েছিলো। ফলে হযরত ঈসা (আ)-এর সরল ধর্ম-শিক্ষা, আল্লাহ্‌মুখিতা ও একত্ববাদের আলো পৌত্তলিকতার কঠিন ধূম্রজালে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এক্ষেত্রে সেন্ট পোল-এর ভূমিকাই ছিলো প্রধান, যিনি 'প্রায় প্রারম্ভ' থেকেই খ্রীস্টধর্মের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। কতিপয় গবেষক মনে করেন, দেহত্ব ও মূর্তভার বিশ্বাস এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবসম্বলিত বর্তমান খ্রীস্ট ধর্মের অবকাঠামো যীশুর প্রত্যক্ষ শিষ্যবর্গের চেয়ে বরং সেন্ট পোল দ্বারা অধিক প্রভাবিত। বস্তুত পোলীয় চিন্তাধারাকেই খ্রীস্ট জগৎ সুদীর্ঘ আঠারো শতাব্দী ধরে অর্থোডকস খৃস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে।

হিন্দু ধর্মও গোড়া থেকেই 'সত্য পথ' থেকে সরে গিয়েছিলো এবং বিশ্বাসের সরলতা ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়ে পৌত্তলিকতার গ্রাসে এমনভাবে নিপতিত হয়েছিলো যে, তেত্রিশ কোটি হলো তার উপাস্য।

[L. S. S. O. Malley : Popular Hinduism, P p. 6-7]

বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থাও তথৈবচ। এখানে বিকৃতি ও বিচ্যুতি এমন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিলো যে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বৌদ্ধ ধর্ম অতি অল্পকালেই এক নির্ভেজাল পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হলো। মূর্তি ও প্রতিমার নাম ও সংখ্যা ছাড়া হিন্দু ধর্মের সাথে তার কোন পার্থক্য থাকলো না, এমন কি কোন কোন প্রাচ্য ভাষায় বুদ্ধ (Buddha) শব্দটিও মূর্তি ও প্রতিমার সমার্থক হয়ে পড়লো।

[c.v. Vaiday : History of Mediaeval Hindu India, VIP (1). 100. Sup. 97]

জরথুস্ত্রীয় ধর্মের হালচালও অভিন্ন, এর প্রণেতাগণ বলেন,

জরথুস্ত্র-এর তিরোধানের পর বিপরীত প্রতিক্রিয়ারূপে একটি সমান্তরাল সংস্কার আন্দোলনের যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো তাতে 'প্রাচীন উপাস্যবর্গ' (আচার ও বিশ্বাসের জগতে) পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন লাভ করেছিলো এবং হৃদয় ও বিশ্বাসের তখনও প্রাচীন ধর্ম লালনকারীরা এই পুনরুত্থানকে উষ্ণ স্বাগতম জানিয়েছিলো এবং প্রাচীন যাজক সম্প্রদায় পূর্ণ সন্তোষ ও আনন্দের

সাথে তাতে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। এভাবে একত্ববাদে আহ্বানকারী একটি সাহসী ধর্ম নিজেই বহু উপাস্যের গড্ডলিকায় ভেসে গেলো।

নবীর খিলাফত লাভের দাবি ও শর্ত

বস্তুত 'নবীন' ইসলামী উম্মাহ তখন যে সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলো তা ছিলো একান্ত অনিবার্য। কেননা

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا.

"বিগতদের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো আল্লাহ্র বিধান আর আল্লাহ্র বিধানে কখনো তুমি কোন পরিবর্তন পাবে না।" [সূরা আহ্যাব ; পৃ-৬২]

আর এ সংকট সমাধানের একমাত্র পথ ছিলো একজন খলীফা ও প্রতিনিধি নির্বাচন করা যিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ ও যোগ্যতাবলে বিকৃতি ও বিচ্যুতির হাত থেকে দীন ও উম্মাহর হেফাজত সুনিশ্চিত করবেন। তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য হবে এরূপঃ

১. ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজীবন তিনি আল্লাহ্র রাসূলের পূর্ণ আস্থাভাজন এবং তাঁর পক্ষ হতে সত্যনিষ্ঠার সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। দীনের কোন মৌলিক বিধান অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্র রাসূল তাকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং এমন নাযুক ও বিপজ্জনক মুহূর্তে তিনি তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করেছেন যখন মানুষ পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা ছাড়া কারো সঙ্গ গ্রহণ করে না।

২. বিভিন্ন বিপদ ও দুর্যোগ যখন দীনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে উদ্যত হয়, ফলে ধর্মপ্রবর্তনের জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা ও শ্রম ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়, এমন কি তাঁর সান্নিধ্যধন্য ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হৃদয়ও যখন ভয়ের কম্পন অনুভব করে, মহাদুর্যোগের সেই কঠিনতম মুহূর্তেও তিনি পাহাড়ের মতো অটল থাকবেন এবং নবীগণের সত্যে অবিচল শিষ্যবর্গের ভূমিকা পালন করবেন অর্থাৎ অজ্ঞতার ধূলিকণা সরিয়ে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও মূল সত্যকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরবেন এবং সাধারণ অনুসারীদের অন্তর্চক্ষু খুলে দেবেন।

৩. ইসলামের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বোধ অর্জন এবং নবীর জীবদ্দশায় ইসলামের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে তথা যুদ্ধ ও শান্তি, ভীতি ও স্বস্তি, ঐক্য, বিভক্তি, অভাব ও প্রাচুর্যের এক কথায় সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা হবে তার বৈশিষ্ট্য।

৪. দীনের মৌলিকত্ব ও দ্বীনের নববী আকৃতি ও প্রকৃতি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে অতুচ্চ গায়রত ও সংবেদনশীলতা হবে তার বৈশিষ্ট্য এবং এই দীনী গায়রত হবে মা-বোন ও স্ত্রী-কন্যার আবরু রক্ষায় পুরুষের গায়রাত সংবেদনশীলতার চেয়ে অধিক নাযুক ও উত্তাপপূর্ণ। ভীতি বা আপত্তি ও ব্যাখ্যা প্রবণতা বা আপসকামিতা ও নিকটতমদের সঙ্গত্যাগ বা অসহযোগিতা কোন কিছুই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত ও বিচ্যুত করতে পারে না।

৫. নবীর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফা হিসেবে তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা ও অসিয়ত বাস্তবায়নে তিনি হবেন এমন দায়িত্বসচেতন ও আত্মনিবেদিত যে, কোন দাবির মুখে কিংবা কারো নিন্দার ভয়ে তা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হবেন না।

৬. দুনিয়ার ভোগ-আনন্দের ক্ষেত্রে তার দুনিয়াবিমুখতা ও নির্মোহতা হবে এমন যার চেয়ে উচ্চতর অবস্থা কেবল নবী জীবনেই শুধু কল্পনা করা সম্ভব। পারিবারিক ও উত্তরাধিকারভিত্তিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা-কল্পনাও তাকে স্পর্শ করবে না যেমন হয়েছিলো আরব উপদ্বীপের নিকটপ্রতিবেশী রোম ও পারস্যের রাজপরিবারগুলোর ক্ষেত্রে।

মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হযরত আবূ বকর (রা)

বলা বাহুল্য, 'সিদ্দীকে আকবর' সুমহান ব্যক্তিত্বে এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিলো। খিলাফত লাভের পূর্বে মহানবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় এবং খিলাফত লাভের পর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনে এগুলো এমন সমুজ্জ্বল ও স্বতঃসিদ্ধ ছিলো যে, অধিক সন্দেহবাদীরও তাতে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড]

এখানে আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা করে দেখবো।

১. তাঁর প্রতি আল্লাহ্র রাসূলের পূর্ণ আস্থার প্রতিফলন ঘটেছে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসংকুল সফরে তাঁকে সফরসঙ্গী করার মাঝে। শত্রুরা যখন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো সম্ভাব্য সকল স্থানে এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র হত্যার উদ্দেশে পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছুটে আসছিলো স্বগোত্র কুরায়শের হিংস্র হায়েনার দল। বলা বাহুল্য, সাধারণ বুদ্ধির মানুষও পূর্ণ আস্থাভাজন ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকেই শুধু সফরসঙ্গীরূপে গ্রহণ করবে, যিনি জীবন দিয়ে হলেও তাঁর প্রাণরক্ষায় বদ্ধপরিকর।[১]

---

১. শিয়া আলিম ইবনুল মুতাহহের منهاج الكرامة فى معرفة الامامة গ্রন্থে লিখেছেন, হয়তো সতর্কতার খাতিরে তাকে সফরসঙ্গী করা হয়েছিলো যাতে পিছনে থেকে তিনি গোপনীয়তা ফাঁস করতে না পারেন। সুতরাং এখানে আবূ বকরের শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নেই।

কুরআনে উল্লেখপূর্বক এ অনন্যসাধারণ উৎসর্গ কীর্তিকে আল্লাহ্ অমরত্ব দান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ

"দু'জনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা গুহায় অবস্থান করছিলো, তখন আপন সঙ্গীকে তিনি বলেছিলেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" [সূরা তাওবা ঃ ৪০]

বলা বাহুল্য, হযরত আবূ বকর (রা) হলেন এ মহাসৌভাগ্যের একক অধিকারী যাতে কোন শরীকদার নেই।

দ্বিতীয়ত, কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দীনী রোকন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতার প্রশ্ন। এটা তো জানা কথা যে, রোযা ও যাকাত যেহেতু নিজস্বভাবে পালনীয় ব্যক্তিগত ইবাদত, সেহেতু তাতে স্থলবর্তিতার অবকাশ নেই। সালাতের ইমামতি ও হজ্জ পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্য তা সম্ভব। আর উভয় ক্ষেত্রেই হযরত আবূ বকর (রা) সে সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শেষ অসুস্থতার সময় সালাতের ইমামতির জন্য আল্লাহর রাসূল তাঁকে আপন স্থলবর্তী করেছেন এবং সবার মাঝে তাঁকেই উপযুক্ত মনে করেছেন। ওবায়দুল্লাহ ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে উতবা বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেষ অসুস্থতার ঘটনা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলাম। তিনি বললেন,

"অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি পাত্রে করে পানি চাইলেন, আমরা পানি দিলাম, আর তিনি অযু করে রওয়ানা হলেন। কিন্তু উনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতঃপর হুঁশ ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে?

আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমাকে পাত্রে পানি দাও। তখন তিনি বসে অযু করলেন, অতঃপর রওয়ানা হলেন। কিন্তু পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম : না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা আপনার জন্য

(চলমান) বর্ণিত আছে, ইবনুল মুতীহররে উন্নতি ও সৌভাগ্যের পৃষ্ঠপোষক তাতারী বাদশাহ আলীজা খোদা বন্দ খান, যাঁকে উৎসর্গ করে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে তিনি এ বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেছেন যে, কোন বুদ্ধিমান লোক এমন করতে পারে না।

অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমাকে পাত্রে পানি দাও। তখন তিনি বসে অযু করলেন, অতঃপর রওয়ানা হলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম- না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকেরা তখন মসজিদে ঈশার সালাত আদায়ের উদ্দেশে দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য প্রতীক্ষারত ছিলো।

আল্লাহ্‌র রাসূল তখন আবূ বকর (রা)-এর কাছে সালাতের ইমামতি করার বার্তা পাঠালেন। দূত তাঁকে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল আপনাকে নামায পড়ানোর আদেশ করেছেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন কোমল-হৃদয় মানুষ। তাই তিনি বললেন, হে উমর, আপনি নামায পড়ান। উমর (রা) বললেন, এ বিষয়ে আপনি অধিক উপযুক্ত। ফলে সে ক'দিন আবূ বকর (রা) সালাতের ইমামতি করলেন।

পরে একদিন নবী ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলেন। তখন দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যোহরের সালাতে উপস্থিত হলেন। দু'জনের একজন হলেন আব্বাস (রা), আবূ বকর নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখে পিছিয়ে আসতে উদ্যত হলেন, কিন্তু নবী ﷺ ইশারায় তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন, আমাকে তার পাশে বসিয়ে দাও। তারা তাঁকে আবূ বকর (রা)-এর পাশে বসিয়ে দিলো। তখন আবূ বকর (রা) দাঁড়ানো অবস্থায় নবী ﷺ-এর সালাত অনুসরণ করে সালাত আদায় করতে লাগলেন, আর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর সালাত অনুসরণ করতে লাগলেন। নবী ﷺ বসা অবস্থায় ছিলেন।

হযরত ওবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁকে হযরত আয়েশা (রা)-এর পূর্ণ বক্তব্যটি বর্ণনা করলাম। তিনি সমর্থন করে শুধু বললেন, দ্বিতীয় যে লোকটির নাম আয়েশা বলেন নি, তিনি হলেন হযরত আলী।

[বুখারী, অনুচ্ছেদ: ইমাম নিয়োগ করা হয় অনুসরণ করার জন্য, অধ্যায় : সালাত]

হযরত আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থতা বৃদ্ধির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আবূ বকরকে নামায পড়াতে বলে দাও।"

হযরত আশেয়া (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ বকর (রা) খুব নরমদিল মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি স্থির থেকে নামায পড়াতে পারবেন না। তখন তিনি ক্ষীণ স্বরে হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আবূ

বকরকে নামায পড়ানোর আদেশ পৌঁছে দাও। আসলে তোমরা তো হলে (আল্লাহর নবী) ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারিণীদের দল। [মুসলিম, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ইস্তিখলাফুল ইমাম ইসলামের প্রথম হজ্জ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইযা আরাদা লাহু উযরুন আও মারাযা]

আল্লাহর রাসূল হযরত আবূ বকর (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত আমীর নিযুক্ত করেছিলেন, এটা ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক দায়িত্ব। হজ্জ ফরয হয়েছিলো নবম হিজরীতে। সে বছর আল্লাহর রাসূল হযরত আবূ বকর (রা)-কে মুসলমানদের হজ্জ পরিচালনা করার জন্য হজ্জ কাফেলার আমীর হিসেবে প্রেরণ করলেন। হজ্জ মৌসুমে মুশরিকরা নিজ নিজ গৃহেই অবস্থান করছিলো। পেছনেও আমরা বলে এসেছি যে, মদীনা থেকে তিন'শ হজ্জযাত্রী হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গী হয়েছিলেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৫৪৩-৫৪৬]

২. মুসলিম উম্মাহর কঠিনতম বিপদ ও দুর্যোগ তথা নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের নাযুকতম মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ধীর, প্রশান্ত ও অবিচল ব্যক্তিত্বের প্রথম সমুজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিলো। বস্তুত নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের সংবাদ সাহাবা কিরামের জন্য বজ্রপাতের চেয়েও কঠিন ছিলো, এমন কি যাঁরা এ খবর বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় ব্যক্তি, যাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও আত্মসংযম ছিলো সুবিদিত। তিনি মসজিদে এসে সমবেত লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ মুনাফিকদের বিনাশ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাসূলের মৃত্যু হতে পারে না।

[সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৯]

হযরত আবূ বকর (রা)-ই ছিলেন সেই সাহসী পুরুষ, প্রবলতম ঝড়-ঝঞ্ঝার মুখেও যিনি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের মতোই অবিচল থাকেন।

বাসভবন থেকে রওয়ানা হয়ে মসজিদে নববীর দরজায় এসে তিনি অবতরণ করলেন। উমর (রা) তখন সমবেত লোকদের উদ্দেশে কথা বলছিলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র দেহের সামনে হাযির হলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল হতে পর্দা সরিয়ে অবনত হয়ে (ললাটে) চুম্বন করলেন। তিনি বললেন, আপনার জন্য আমার আম্মা-আব্বা উৎসর্গীকৃত হোন! আল্লাহ্ যে মৃত্যুর ফায়সালা করেছেন তার স্বাদ তো আপনি গ্রহণ করেছেন। এরপর মৃত্যু আর কখনো আপনাকে স্পর্শ করবে না। অতঃপর তিনি পুনরায় চাদর টেনে দিয়ে মসজিদে হাযির হলেন এবং

বক্তব্যরত হযরত উমর (রা)-কে শান্ত ও নীরব হতে বললেন, কিন্তু তিনি কথা বলেই চললেন। এ অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা) উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে কথা আরম্ভ করলেন, আর সকলে হযরত উমর থেকে সরে তাঁর বক্তব্য শ্রবণে মনোযোগী হলেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র হামদ্‌-ছানা ও প্রশংসা করে বললেন–

"হে লোক সকল! যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপাসনা করতে তারা শোন, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তারা শোন, আল্লাহ্‌ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ۔

"মুহাম্মদ তো রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নন! তাঁর পূর্বেও রাসূলগণ বিগত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি ইন্তিকাল করেন কিংবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা উল্টো পায়ে পেছনে ফিরে যাবে? আর যে উল্টো পায়ে পেছনে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌ শোকরকারীদের অবশ্যই প্রতিদান দেবেন।" [সূরা আলে ইমরান : ১৪৪]

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী কিরাম বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। আবূ বকরের মুখে সেদিন এ আয়াত শোনার আগে মানুষ যেন জানতই না যে, এমন আয়াত নাযিল হয়েছে!

হযরত উমর (রা) আল্লাহ্‌র কসম করে বলেন, আবূ বকরের মুখে এই তিলাওয়াত শোনামাত্র হতবুদ্ধি অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলাম, যেন আমার পদদ্বয় আমাকে বহন করতে পারছিলো না। তখন আমার বুঝ হলো যে, আল্লাহ্‌র নবী সত্যি সত্যি ইন্তিকাল করেছেন। [সীরাতে ইব্‌নে হিশাম, পৃষ্ঠা ৬৫৫–৫৬]

বিভিন্ন আরব গোত্র যখন যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতা অস্বীকার করলো কিংবা বায়তুলমালে যাকাত আদায়ের বিধান প্রত্যাখ্যান করলো সেই নাযুক সময়ে সিদ্দীকে আকবার যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তার প্রতিটি শব্দে দীনের মৌলিকত্ব, নববী আকৃতি ও প্রকৃতি রক্ষায় সিদ্দীকী মর্যাদাবোধ ও সংবেদনশীলতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিলো, বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল অধ্যায়ের সেই একটিমাত্র বাক্য যে কোন সারগর্ভ ভাষণ কিংবা তত্ত্বপূর্ণ

গ্রন্থের চেয়ে মূল্যবান ও আবেদনপূর্ণ ছিলো। একই সঙ্গে তা ইসলামের প্রাণ ও মর্ম সম্পর্কে সিদ্দীকে আকবরের সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রতিবিম্ব ছিলো।

[আরকানে আরবাআ, যাকাত পর্ব ও খাত্তাবী (র) রচিত সাআলিমুস সুনান]

ইতিহাসের রেকর্ড থেকে এবার শুনুন ঈমানের তেজে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠের সেই ঘোষণা। অহী এখন সমাপ্ত এবং দীন সুসম্পন্ন। সুতরাং আমার প্রাণ থাকতে কি তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে?

মেশকাতুল মাছাবীহের বর্ণনামতে হযরত উমর (রা) তাঁকে বলেছিলেন, হে খালীফাতুর রাসূল! মানুষের প্রতি কোমল ও নমনীয় হোন। তখন সিদ্দীকে আকবার তাঁকে বলেছিলেন,

اجبار فی الجاهلية خوار فی الاسلام اينقص الدين -

জাহিলিয়াতের পরাক্রমশালী তুমি ইসলামে এসে দুর্বল হয়ে গেলে! আমি বেঁচে থাকতে দীন ক্ষুণ্ণ হবে?

অথচ বহু বিশিষ্ট সাহাবী তখন অস্ত্র ধারণের বৈধতা সম্পর্কে এ কারণে দ্বিধান্বিত ছিলেন যে, তারা তো ইসলামের কালিমা উচ্চারণকারী এবং অন্যান্য আহকাম গ্রহণকারী। কিন্তু সিদ্দীকে আকবারের অন্তরে মুহূর্তের জন্যও ছিলো না কোন দ্বিধা সংশয়, বরং তাঁর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ছিলো,

"আল্লাহর কসম! নবীর যামানায় যাকাতের উটের সঙ্গে যে রশিটি দেয়া হতো সেটা বন্ধ হলেও তাদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করবো। যাকাত হলো মালের হক, আল্লাহর কসম! নামায ও যাকাতের মাঝে যারা পার্থক্য করে তাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই হবে।" [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১১]

বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে যাকাত দান অস্বীকার ছিলো শরীয়ত প্রাসাদে এক বিরাট ফাটল সৃষ্টির ও অন্তহীন ফেতনার দুয়ার খুলে দেয়ার শামিল। আল্লাহ না করুন, সিদ্দীকে আকবার যদি এ ফাটল সৃষ্টির সামান্যতম সুযোগ দিতেন এবং মহাদুর্যোগের এ দুয়ার বন্ধ করতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করতেন তাহলে আর কখনো তা বন্ধ হতো না বরং নিত্য নতুন ফিতনা শুরু হতো। নামাযের ক্ষেত্রে জুমা ও জামাতের বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠতো যে, বাড়িতে একা একা পড়াই যথেষ্ট। রোযা সম্পর্কে দাবি উঠতো যে, শুরু ও শেষের সময় সীমা এবং রমযানের সময়াবদ্ধতায় কী প্রয়োজন, এমন কি নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত রোকনে ও সম্মিলিতভাবে হজ্জ আদায়ের বিষয়টিও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়তো। এক কথায় নবুওয়তি খিলাফত ও ইসলামী হুকুমাতের

সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়তো, অথচ এরই ওপর নির্ভর করে ইসলামের শান্তি নীতি ও অন্যান্য বিধানের বাস্তবায়ন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত ও মর্যাদার আসন, বরং রাসূলের ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামেরও মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠতো, অথচ ইসলাম এসেছে কিয়ামত পর্যন্ত প্রাণবন্ত ও কার্যকর থাকার জন্য।

সুতরাং এটা প্রমাণিত সত্য যে, যে অনমনীয়, আপসহীন ও চূড়ান্ত নীতি ও অবস্থান সিদ্দীকে আকবার সেদিন গ্রহণ করেছিলেন সেটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর অন্তরে ইলহামকৃত। তাই কিয়ামত পর্যন্ত দীনের অস্তিত্ব ও মৌলিকত্ব এবং স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা বহাল থাকার ক্ষেত্রে তিনিই হলেন অনন্য গৌরবের প্রথম হকদার।

বস্তুত ইতিহাসের এ সাক্ষ্য আমরা ও অন্যরা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে যে, ধর্মত্যাগের ফিতনার মুকাবিলায় ও ইসলামের মজবুত রজ্জু ছিন্নভিন্ন করার চক্রান্তের মুখে হযরত সিদ্দীকে আকবার যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের অনুসৃত নীতি ও কর্মের প্রায় সমতুল্য ভূমিকাই পালন করেছিলেন এবং নবুয়তি খিলাফতের পূর্ণ হক আদায় করেছিলেন। সুতরাং এই পৃথিবী ও তার মানব সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্র নিরংকুশ মালিকানায় ফিরে যাবে সেদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর সকৃতজ্ঞ প্রশংসা ও দু'আ তিনি অবশ্যই পেতে থাকবেন।

[আরকানে আরবাআ; যাকাত পর্ব]

৫. নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর ইচ্ছা ও অসিয়ত বাস্তবায়নে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সজাগ দৃষ্টি ও নিবেদিত প্রয়াসের সমুজ্জ্বল প্রমাণ হলো হযরত উসামার নেতৃত্বে প্রস্তুতকৃত বাহিনী প্রেরণ। এ বাহিনী আল্লাহর রাসূল স্বয়ং প্রস্তুত করেছিলেন এবং তা প্রেরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এমন কি হযরত উসামা (রা) তাঁর বাহিনীসহ মদীনা হতে এক 'ফরাখ' দূরে জুরুফ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল শেষ অসুস্থতার কঠিন সময়েও "উসামার বাহিনী প্রেরণ করো" বলে বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন।

ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'পরম বন্ধু'-র সান্নিধ্যে চলে গেলেন। সেই নাযুকতম পরিস্থিতিতেও হযরত আবূ বকর (রা) 'অন্তিম নববী ইচ্ছা' বাস্তবায়নে অগ্রসর হলেন এবং উসামা বাহিনীকে অভিযানের আদেশ প্রদান করলেন, অথচ ধর্মত্যাগীদের মদীনা আক্রমণের পূর্ণ আশংকার মুখে মদীনা থেকে মুসলিম বাহিনীর বিদায় কারো কাছেই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছিলো না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) আপন সিদ্ধান্তে ছিলেন অনড়। সুরতহালের বিবরণ প্রসঙ্গে হযরত

আবূ হুরায়রা (রা) এ হাকীকত অতি উত্তমরূপে তুলে ধরেছেন, আবুল আ'রাজ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন,

"যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ্র কসম, আবূ বকর খলীফা না হলে এই যমীনে আর আল্লাহ্র ইবাদত হতো না।"

একথা তিনি দু'বার কিংবা তিনবার উচ্চারণ করে উসামা বাহিনী প্রেরণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

উসামার বাহিনীকে অভিযানের আদেশ প্রদান করে আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূল স্বয়ং যে বাহিনী প্রস্তুত ও প্রেরণ করেছেন আমি তা প্রত্যাহার করতে পারি না এবং যে ঝাণ্ডা তিনি তুলে দিয়েছেন আমি তা খুলে নিতে পারি না। ফল এই দাঁড়ালো যে, উসামা বাহিনীর অগ্রাভিযান দেখে পথিমধ্যের ধর্মত্যাগে উদ্যত গোত্রগুলো বলাবলি শুরু করলো যে, প্রবল শক্তির অধিকারী না হলে এ কাওম এমন সময় এমন অভিযানে বের হতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হলো রোমকদের সাথে এদের মুকাবিলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

পরবর্তীতে উসামা বাহিনী রোমকদের শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলো। ফলে আরব গোত্রগুলো ঈমানের ওপর অবিচল থাকলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৪]

শরীয়তের আহকাম বর্জন ও ঈমান বিসর্জন দিয়ে যারা কুফরী গ্রহণ করেছিলো এবং জাহিলিয়াতের অভ্যস্ত জীবনে ফিরে গিয়েছিলো (আল্লামা খাত্তাবীর ভাষায় এরা হলো প্রথম শ্রেণী) তদ্রূপ নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করে যারা যাকাত অস্বীকার করেছিলো (আল্লামা খাত্তাবীর ভাষায় ধরা হলো দ্বিতীয় শ্রেণী) এ উভয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা) ধর্মত্যাগের ভিত্তিতে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। কেননা দীনের অকাট্য প্রমাণিত কোন বিধান অস্বীকার করা কুফরী। তাই তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্র কসম, নামায ও যাকাতের মাঝে যারা পার্থক্য করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করে যাব। কেননা যাকাত হলো মালের হক।"

পক্ষান্তরে ইমামের অধিকার অস্বীকার করে যারা যাকাত আত্মসাৎ করেছিলো তদ্রূপ যারা ইমামের অধিকার স্বীকার করলেও গোত্রপতিদের প্রভাবে ইমামের হাতে যাকাত অর্পণে বিরত ছিলো তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ভিত্তি ছিলো বিদ্রোহ, কেননা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অপরিহার্যতা সর্বসম্মত এবং কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.

"একদল যদি অন্য দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র বিধানে প্রত্যাবর্তন করে।"

[সূরা হুজুরাত : ৯]

বিভিন্ন আরব গোত্রের ধর্মত্যাগ ও মিথ্যা নবুয়তের ফিতনা গোলযোগ হযরত আবূ বকর (রা) অতি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। আল্লাহ্ না করুন, এ ফিতনার বিস্তার যদি অব্যাহত থাকতো তাহলে ইসলামের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকতো না।

এজন্যই তিনি ভণ্ড নবী মুসায়লামা ও তার অনুসারীদের সমূলে ধ্বংস করেছিলেন এবং এগারজন সেনাপতির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণপূর্বক ধর্মত্যাগী ও যাকাত বিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন এবং শাজাহ ও বনূ তামীমের ফিতনা দমন করেছিলেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৪]

এ সময় ইরাক ও আরব উপদ্বীপের পঞ্চাশ হাজারের মতো মুশরিক ও মুরতাদ নিহত হয়েছিলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯]

পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লামা ইব্নে কাছীর (রা)-এর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য হলো!

ধর্মচ্যুতরা ইসলামে পুনঃদীক্ষিত হয়েছিলো এবং সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং জাযীরাতুল আরবের পুনঃস্থিতিশীলতার মাধ্যমে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকলে সমস্তরে এসে গিয়েছিলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৯]

মুহম্মদ ইব্নে ইসহাকের ভাষায়–

"নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পর আরব গোত্রে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। ইহূদী ও খ্রীস্ট ধর্মের অনুসারীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং মুনাফিকদের প্রতাপ দেখা দিলো। ফলে নবীহারা উম্মত শীতের বর্ষণ-রাত্রে বৃষ্টিতে ভেজা মেষপালের ন্যায় বিপন্ন হয়ে পড়লো। কিন্তু উম্মতকে আল্লাহ্ আবূ বকরের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করলেন।"[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৯]

হযরত খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে 'ইরাক-অভিযান হলো এবং ইরাকের সিংহভাগ এলাকাসহ আমবার ও দাওমাতুল জান্দাল বিজিত হলো এবং বহু যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের অব্যাহত বিজয় সম্পন্ন হলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২–৩]

এভাবে ইসলামের ভিত্তিভূমি ও আশ্রয়কেন্দ্র জাযীরাতুল আরবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং ইসলামের আসল মূলধন সেই আরব জাতির হৃদয়ের গভীরে ইসলামের শিকড় পুনঃপ্রোথিত হলো। ফলে ইসলামের বিজয় স্রোত ইরাক ও সিরিয়া অভিমুখে প্রবাহিত হলো এবং মুসলিম বাহিনী ইসলামের প্রসার, রাজ্য বিস্তার ও প্রতিবেশী দেশ অধিকারের সংগ্রামে নিয়োজিত হলো এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফার আমলে তা পূর্ণতা লাভ করলো। হযরত আবূ বকর (রা) যখন ইহজগৎ ত্যাগ করেন তখন দামেস্ক জয় ও ভাগ্যনির্ধারণী ইয়ারমুক যুদ্ধে বিজয় ছিলো মুসলিম বাহিনীর দোরগোড়ায়। তাছাড়া হযরত উমর ও উসমান (রা)-এর যুগ থেকে উমাইয়া আমল পর্যন্ত অর্জিত বিজয়গুলোর মূলেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর নীতি ও কীর্তির বিরাট অবদান ছিলো, এমন কি তাঁর দু'বছরের সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালই ছিলো পরবর্তীতে সারা বিশ্বের ইসলামের উত্থান ও কল্যাণ প্রসারের ভিত্তি।

৬. হযরত আবূ বকর (রা)-এর দুনিয়াবিমুখতা, মোহহীনতা ও বায়তুল-মালের ভাতা গ্রহণে তাঁর কৃচ্ছ্রের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য সিদ্দিকী জীবনের দু'টি উদাহরণ তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে।

জীবনে একবার তাঁর স্ত্রীর সাধ জেগেছিলো পরিবারের সকলকে হালুয়া তৈরি করে খাওয়াবেন। কিন্তু খলীফা বললেন, আবূ বকরের তো সেই সামর্থ্য নেই! স্ত্রী বললেন, কয়েক দিনের খরচ থেকে কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে রাখবো, খলীফা বললেন, তা দেখো।

এভাবে অনেক কষ্টের উদ্বৃত্ত তিনি খলীফার হাতে তুলে দিলেন হালুয়ার আয়োজনের জন্য। আর খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) কি করলেন? উদ্বৃত্ত অর্থ বায়তুল মালে ফেরত দিয়ে বললেন, এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সুতরাং আগামীতে যেন আবূ বকরের ভাতা এ পরিমাণ কম দেয়া হয়, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মালের পেছনের ক্ষতিপূরণও তিনি আদায় করলেন!

দ্বিতীয় উদাহরণ প্রসঙ্গে হযরত হাসান ইব্‌নে আলী (রা) বলেন, ইন্তিকালের সময় আবূ বকর (রা) বললেন, হে আয়েশা! মুসলমানদের খিদমতে নিযুক্ত থাকার সময় যে উটনীর দুধ আমরা পান করেছি এবং যে লেপ আমরা ব্যবহার করেছি আমার মৃত্যুর পর সেগুলো উমরের কাছে ফেরত দিও।

অসিয়ত মতে হযরত আয়েশা (রা) যখন ফেরত দিলেন তখন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) বললেন, আবূ বকর! আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন! পরবর্তীতে আপনি বড় কঠিন পরীক্ষায় ফেলে গেছেন।

[তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-৮৭]

ইসলামের শুরা ব্যবস্থা ও আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত

প্রাচীন পৃথিবীতে রাজবংশীয় শাসন ও উত্তরাধিকারসূত্রীয় আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ধারা প্রচলিত ছিলো। বস্তুত এ দ্বৈত শাসনের যাঁতাকলে মানব সম্প্রদায় নিষ্পেষিত হচ্ছিলো। একটি হলো রাজবংশের স্বেচ্ছাচারমূলক রাজনৈতিক শাসন যা পিতা থেকে পুত্রের কিংবা রাজপরিবারের অন্য কোন সদস্যের হাতে হাত বদল হতো। কখনো শান্তিপূর্ণ উপায়ে, কখনো বা রক্তপিচ্ছিল পথে। যোগ্যতা কিংবা রাজা ও প্রজার স্বার্থ-চিন্তার কোন অবকাশ ছিলো না সেখানে রাজ্য ও রাজ্যের সম্পদ রাজা ও রাজপরিবারের ভোগ দখলে। রৌপ্য ও হীরা কাঞ্চন ও বল্গাহীন ভোগ বিলাস ও বিনোদনই ছিলো রাজা ও রাজপরিবারের একমাত্র লক্ষ্য। রাজদণ্ডের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের উত্তাপ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাদের যা কিছু কীর্তিকলাপ তা আজকের মানুষের কল্পনাকেও হার মানায়। সেই শাসন-শোষণ ও আনন্দ-বিনোদনের ইতিহাস যারা পড়েছেন তারাই শুধু তা কল্পনা করতে পারেন। প্রজাসাধারণও তাদেরকে অতিমানব বলে বিশ্বাস করতো। কেননা তাদের শিরায় ঈশ্বরের পবিত্র রক্ত প্রবাহিত এবং রাজ্য শাসন ও প্রজা শোষণের ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের অভাব ও দুঃখ-কষ্টের চিত্র ছিলো বড়ই করুণ। পাষাণ হৃদয়ও তাতে বিগলিত হতো এবং নির্দয় চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হতো। ক্ষুধার এক মুঠো অন্ন ও লজ্জার এক টুকরো বস্ত্র লাভের জন্যও তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রাণান্ত হতো। হাজারো কর ও খাজনার ভারে তারা ভারাক্রান্ত হতো এবং চাবুকের আঘাতে আর্তনাদ করতো। দৃশ্য-অদৃশ্য বহু শৃঙ্খলে তাদের চলৎশক্তি ছিলো রহিত। এক কথায় মানুষ ছিলো তারা, কিন্তু জীবন ছিলো মানবেতর। মর্যাদায় ছিলো পশুরও অধম। রাজা ও রাজপরিবারের ভোগস্পৃহা ও সম্পদ চাহিদা চরিতার্থ করাই যেন ছিলো তাদের জন্মের সার্থকতা।

[সীরাতুন্নবী, পৃষ্ঠা ৩৫–৩৬]

দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকারভিত্তিক ধর্মীয় ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব, যা বিশেষ বংশ বা সম্প্রদায়ের হাতে কুক্ষিগত ছিলো যুগ যুগ ধরে বংশ-পরম্পরায়। পূজনীয় পর্যায়ের যে আধ্যাত্মিক অবস্থান ও ধর্মীয় মর্যাদা তারা ভোগ করত সেটাকে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় চাহিদা চরিতার্থের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতো। এক কথায় তারা ছিলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিরংকুশ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, যাদের হালাল-হারাম নির্ধারণের এবং বিধান ও ব্যবস্থা প্রবর্তনের একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিলো। ধর্মীয় মধ্যস্বত্বভোগী ও সম্প্রদায়ের যে চিত্র আল-কুরআন পেশ করেছে তার চেয়ে নিখুঁত ও বাস্তবানুগ চিত্র আর কী হতে পারে!

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۔

"হে ঈমানদারগণ! বহু (ইহুদী) ধর্মনেতা ও (খ্রীস্টান) পাদরী মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে।"

[সূরা তাওবা : ৩৪]

খ্রীস্ট সমাজে উপরোক্ত শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ আরব খ্রীস্টান পণ্ডিত বুতরুস বুস্তানী তাঁর বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেন,

শব্দটি এ ধারণার ইঙ্গিতবাহী যে, এরা হলো প্রভুর উত্তরাধিকারী, মূসার ধর্ম বিধানে লেবীয় সম্প্রদায় যেমন সদাপ্রভুর উত্তরাধিকারী ছিলো। হিব্রু, মিশরীয় ও অন্যান্য প্রাচীন জাতিবর্গের বিধি ব্যবস্থায় উপাসনা ও উপাসনালয় পরিচালনার জন্য বিশেষশ্রেণী ছিলো। খ্রীস্টান গির্জার প্রতিষ্ঠা লগ্নেও অনুরূপ সেবায়েতশ্রেণী গড়ে উঠেছিলো, গির্জা যখন দারিদ্র্যের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলো তখন থেকেই তথা যাজকশ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার শুরু হলো। ফলে শুধু ধর্মসেবক নয়, বরং সমকালীন জ্ঞান ও শিক্ষায় একক প্রাধান্যের মাধ্যমে তারাই হয়ে উঠেছিলো সমাজের একক নিয়ন্ত্রক শক্তি। রোমান শাসনামলে যাজক সম্প্রদায় বহুবিধ কর ও খাজনা থেকে মুক্ত ছিলো। তদুপরি 'জনস্বার্থ' সম্পর্কেও তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিলো না। বরং তাদের কায়েমী ক্ষমতা নিজস্ব পরিমণ্ডল অতিক্রম করে প্রজা সাধারণের ওপরও বিস্তৃত ছিলো।

[বুস্তানীর বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬]

প্রাচীন ইরান তথা পারস্যের অবস্থাও ছিলো অভিন্ন। পারসিক ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কোন-না-কোন সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। গোড়ার দিকে 'মায়দায়া' সম্প্রদায়ের ও জরথুস্ত্র'-এর অনুসারীদের যুগে 'আল-মাগান' সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছিলো। ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিলো পৃথিবীতে বিধাতার ছায়া এবং তার সেবা প্রযত্নের জন্যই তাদের সৃষ্টি। শাসক এ গোত্রের সদস্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা ঈশ্বরের সত্তা তার মাঝেই মূর্ত হয়। সুতরাং এ পরিবারই হবে 'অগ্নিগৃহের' সেবা দায়িত্বের মর্যাদার অধিকারী।

[সাসানী যুগের ইরান, আর্থার ক্রিস্টিয়ান]

হিন্দু-ভারতের ধর্মব্যবস্থায় 'ব্রাহ্মণ সমাজ' ছিলো ধর্মীয় ক্ষমতার নিরংকুশ অধিকারী। মর্যাদা ও পবিত্রতার এমন শীর্ষবিন্দুতে ছিলো তাদের অবস্থান যেখানে অন্য কারো 'উত্তরণ' সম্ভব ছিলো না। সেখানে ব্রাহ্মণের 'পাপ' ত্রিভুবন বিনাশ করলেও তিনি ক্ষমাযোগ্য এবং 'ব্রাহ্মণ হত্যা' সর্বাবস্থায় মহাপাপ। ব্রাহ্মণের ওপর কর ধার্য করা যায় না এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে পারে না।

এ উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকার ধারা বিলুপ্ত করেছিলো। কেননা যুগ যুগ ধরে মানবতার বিরুদ্ধে তা 'মহাঅপরাধ' সংঘটন করেছে যার অসংখ্য প্রমাণ রোম, পারস্য ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে রয়েছে। [সীরাতুন্নবী, পৃষ্ঠা-৩৮]

খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর এবং ইলম ও প্রজ্ঞা, ইখলাস ও বিচক্ষণতার অধিকারী শুরার হাতে অর্পণ করেছে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ রেখে যান নি। বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান 'শরীয়ত কর্তব্য' হলে অবশ্যই তিনি তা কার্যকর করে যেতেন। কেননা তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ হলো,

يَآ أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌছে দিন। এ যদি না করেন তাহলে আপনি তো প্রতিপালকের বার্তা পৌছালেন না! আর আল্লাহ্ আপনাকে 'শত্রু' থেকে রক্ষা করবেন।" [সূরা মায়িদা : ৬৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۨالَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا.

"ইতোপূর্বে বিগত নবীগণের ক্ষেত্রে এ-ই ছিলো আল্লাহ্র বিধান। আর আল্লাহ্র বিধান পূর্ব নির্ধারিত। তারা ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্র বাণীসমূহ পৌছে দিতেন এবং শুধু আল্লাহকে ভয় করতেন। আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। আর হিসেবে গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" [সূরা আহযাব : ৩৮-৩৯]

সহীহ বুখারী শরীফে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবার বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন অন্তিম শয্যায় শায়িত হলেন সেদিন ঘরে কয়েকজন লোক ছিলো। তিনি তাদের বললেন,

هلموا اكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده.

'এসো, তোমাদের আমি একটি ফরমান লিখে দিই, যার পরে তোমরা আর 'বিচ্যুত' হবে না।

কিন্তু কেউ কেউ বললেন, এখন তিনি রোগ যন্ত্রণায় কাতর। আমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছে! সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন ঘরের লোকেরা মতনৈক্য ও বিবাদ করলো। একদল বলে, কাগজ পেশ করো, তোমাদের জন্য তিনি কোন ফরমান লিখুন, যার পর তোমরা 'বিচ্যুত' হবে না। কিন্তু অন্য দল অন্য রকম বলে। বাদানুবাদ বৃদ্ধির মুখে আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছিলেন, "তোমরা উঠে যাও।"

[মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মাবাদুন্নাবী ওয়া ওয়াফাতিহ]

কাগজ তলবের পর তিন দিন তিনি হায়াতে ছিলেন। কিন্তু পুনঃতলব করেন নি। খিলাফত সম্পর্কেও স্পষ্ট কিছু বলেন নি, অথচ সেদিন ও তার পরে বিভিন্ন অসিয়ত করেছেন। তখন তাঁর অন্যতম অসিয়ত ছিলো– "নামায ও ক্রীতদাসদাসী সম্পর্কে সতর্ক থেকো।"

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায, যাকাত ও ক্রীতদাসদাসী সম্পর্কে অসিয়ত করেছিলেন। [বায়হাকী ও আহমাদ]

আরেকটি অসিয়ত ছিলো এই,

قَاتِل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقين دينان على ارض العرب.

"ইহূদী ও নাসারাদের আল্লাহ্ নিপাত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদাস্থল বানিয়েছিলো। আরব ভূমিতে দুই ধর্ম যেন না থাকে।" [মুআত্তা মালিক]

হযরত আয়েশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অসুস্থতার সময় আল্লাহ্‌র রাসূল পবিত্র মুখমণ্ডলের ওপর একটি কাপড় টেনে টেনে দিতেন কিন্তু শ্বাস ভারি হয়ে এলে তা সরিয়ে ফেলতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন,

"ইহূদী নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে 'সিজদাস্থল' বানিয়েছিলো। (উম্মতকে) তিনি এ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

[বুখারী, অনুচ্ছেদ ঃ মাবাদুন্নাবী ﷺ ওয়া ওয়াফাতিহ]

কাগজ তলবের হাদীস প্রসঙ্গে গবেষক আল আক্কাদ বলেন,

"আলী (রা)-এর অনুকূলে খিলাফতের অসিয়তের পথে হযরত উমরই আল্লাহ্র রাসূলের সামনে অন্তরায় হয়েছিলেন।" এটা এমনই দায়িত্ববিবর্জিত মন্তব্য যা হযরত উমর ও তাঁর মত সমর্থনকারীদের নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সকলেরই মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। বস্তুত নবী ﷺ-এর কাগজ তলব কারো অনুকূলে খিলাফত ঘোষণার জন্য ছিলো না। কেননা সে ক্ষেত্রে তাঁর একটিমাত্র শব্দ বা ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিলো। যেমন ইমামতির আদেশ থেকে সাহাবাগণ আবূ বকর (রা)-এর অগ্রাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত বুঝে নিয়েছিলেন।

তাছাড়া কাগজ তলবের পর (তিন দিন) হায়াতে থেকেও তিনি তা পুনঃতলব করেন নি, অথচ হযরত আলী ও তাঁর মাঝে অন্তরঙ্গ সাক্ষাতে কোন বাধা ছিলো না। কেননা হযরত আলী (রা)-এর স্ত্রী ফাতিমা (রা) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত 'সান্নিধ্যে' ছিলেন। সুতরাং ইচ্ছা করলেই তাঁকে ডেকে নিয়ে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারতেন।

এই সম্পূর্ণ 'স্বেচ্ছা নীরবতা' ছাড়াও প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বের নববী সুন্নাত ও নীতি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, পরিবারকে তিনি শাসনপদ থেকে দূরেই রাখতেন এবং নবীগণের উত্তরাধিকার ধারা জোরদারভাবে রদ করতেন। সুতরাং এই নীতি, সুন্নত ও স্বেচ্ছা নীরবতা মোটেই প্রমাণ করে না যে, মুহম্মদ ﷺ হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত চেয়েছিলেন কিন্তু ইচ্ছা প্রকাশে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

[আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা- ৬১৯]

খিলাফতুন্নবী ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে গবেষক আল আক্কাদ অতি উত্তম কথা বলেছেন। তাঁর মতে খিলাফতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার যদি আল্লাহ্র কোন বিধান হতো তাহলে 'পুত্রহীন' অবস্থায় তাঁর তিরোধান যেমন আশ্চর্যতম বিষয় হতো তেমনি আহলে বায়তের খিলাফত সম্পর্কিত সুস্পষ্ট আয়াত ছাড়া নুযূলে কুরআনের সমাপ্তি ঘটাও অদ্ভুত বিষয় হতো।

তদ্রূপ এই উত্তরাধিকার যদি দীনের অপরিহার্য কোন বিষয় কিংবা তাকদীরের অলংঘনীয় কোন ফায়সালা হতো তাহলে দুনিয়াতে তা অবশ্যই কার্যকর হতো, অকাট্য তাকদীর যেমন কার্যকর হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যে কোন খিলাফত ব্যর্থ হতো, বিশ্বজগতের নিয়মবিরুদ্ধ যে কোন উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হয়।

মোটকথা, শরীয়তের সুস্পষ্ট বাণী কিংবা ঘটনা প্রবাহের ইঙ্গিত কিংবা আসমানী ইচ্ছা কোন কিছুই চরমপন্থীদের খিলাফত প্রশ্নে নিকটাত্মীয়তার অগ্রাধিকার কিংবা হাশেমী পরিবারের একক অধিকার সম্পর্কিত মতামত সমর্থন করে না। [আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা-৯৩৬]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বায়আত

মদীনার আনসার-মুহাজির সাহাবীগণ, যাঁরা সংকট সমাধানে যোগ্য অধিকারী, যাঁদের সর্বসম্মত যে কোন সিদ্ধান্ত আরব উপদ্বীপে ও সকল মুসলিম জনপদে সমান কার্যকর, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁরা এক নাযুক সময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েছিলেন। যদি তারা এমন এক ব্যক্তির হাতে বায়'আত গ্রহণে একমত হতে পারেন যাঁর অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং যার প্রতি আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির মনোভাব ও বিভিন্ন নাযুক পরিস্থিতিতে তাঁকে অগ্রবর্তী করার বিষয় সকলে সম্যক অবগত, যদি তারা এমন এক ব্যক্তির বায়'আত ও খিলাফত সম্পর্কে একমত হতে পারেন তাহলে উম্মাহর ঐক্য, সংহতি, উদ্যম ও শক্তি অটুট থাকে এবং ইসলামের ছায়া বিস্তার ও তার প্রচার-প্রসার অব্যাহত থাকে।

পক্ষান্তরে যদি তাঁরা অনৈক্য ও বিভক্তির শিকার হয়ে পড়েন তাহলে অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও ধর্মীয় নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে নাস্তানাবুদ হবে এবং অগ্রগতি স্তব্ধ হবে, এমন কি আল্লাহ্ না করুন ইসলামের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও নাযুকতা আরো বেশি ছিলো এজন্য যে, মদীনা হলো ঘটনাস্থল যেখানে ছিলো দুই বৃহৎ কাহতানী গোত্র আওস ও খাজরাজের প্রাচীন অধিবাস, যাঁরা ইসলাম ও তার নবীকে নিরাপদ আশ্রয় দান করেছিলেন। মুহাজিরগণকে ভাই বলে ভালোবেসেছিলেন এবং ত্যাগ ও কুরবানীর সর্বোচ্চ নমুনা পেশ করেছিলেন।

সুতরাং মদীনার আদি বাসিন্দা ও ত্যাগী আনসার হিসেবে তারা যদি মক্কী ও মুহাজির নবীর উত্তরাধিকার ও খিলাফতের স্বত্ব দাবি করেন তাহলে তা অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না, বরং তা-ই ছিলো স্বাভাবিক ধর্ম।

এই মনস্তাত্ত্বিক সংকট, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকাল-পরবর্তী মহাপরীক্ষার স্বরূপ যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি প্রজ্ঞায় ও বিচক্ষণতায় সাহাবা সমাজে ছিলেন বিশিষ্ট এবং

বিভিন্ন পরিস্থিতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আল্লাহ্প্রদত্ত প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি পরিস্থিতির নাযুকতা যেমন অনুধাবন করলেন তেমনি এটাও বুঝলেন যে, এখন এক মুহূর্ত বিলম্ব বা শৈথিল্যেরও অবকাশ নেই। কেননা সাহাবা জামাতের সঠিক সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে উম্মাহর ঐক্য ও ইসলামের ভবিষ্যত। সুতরাং কোন কারণে যদি ঐক্য-রজ্জু ও সিদ্ধান্ত-ক্ষমতা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে আর কখনো তা ফিরে আসবে না। তাই তিনি ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের আন্তরিক তাগাদা অনুভব করলেন, বিশেষত তাঁর জানা ছিলো যে, মদীনাবাসীরা তাদের মধ্য হতেই খলীফা নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষী ছিলো। কেননা তারাই হলো ইসলামের আনসার এবং মদীনার আদি পরিবার, অথচ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আরব জাতি কুরায়শ ছাড়া অন্য নেতৃত্ব মেনে নেবে না। তাই অবিলম্বে তিনি সিদ্দীকে আকবারের বায়'আতের ওপর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করলেন যাতে শয়তান অনৈক্য ও ভাঙ্গণের সুযোগ না পায় এবং নফসানিয়াত তাদের কলবে দাঁত বসাতে না পারে। সর্বোপরি নবী ﷺ -এর জানাযা, দাফন ও বিদায়কালে মুসলমানদের একজন আমীরের অভিভাবকত্বে যেন পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত থাকে এবং দাফনকার্য যথাযোগ্য মর্যাদা ও পবিত্রতার সাথে হতে পারে। তাই তিনি উঠলেন, সম্বোধন করলেন, এবং বললেন,

"তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে আল্লাহ্ তোমাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি রাসূলের প্রিয় সঙ্গী এবং গুহায় (অবস্থানকালে) দু'জনের দ্বিতীয় ব্যক্তি। সুতরাং এ থেকে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করো।"

তখন লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলো।

যুহরীর সূত্রে ইমাম মালিক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি সময়, পরিস্থিতির নাযুকতা ও ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর অধিকতর আলোকপাত করছে—

হযরত উমর (রা) বলেন, আমরা নবীগৃহে অবস্থান করছিলোম, এমন সময় দেয়ালের, পেছন থেকে আওয়াজ এলো, হে খাত্তাবের পুত্র, বেরিয়ে আসুন। আমি বললাম, যাও, তোমার কথা শোনার চেয়ে বড় কাজে আমি ব্যস্ত আছি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জানাযার বিষয় নিয়ে]।

আবার আওয়াজ এলো, এদিকে ঘটনা এই যে, আনসারগণ বনূ সাঈদা গোত্রের প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে। সুতরাং যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে এবং কিছু ঘটে

যাওয়ার পূর্বেই পরিস্থিতি সামাল দিন। তখন আমি আবূ বকরকে বললাম, জলদি চলুন। [ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০]

বনূ সাঈদা গোত্রের প্রাঙ্গণে বায়'আত অনুষ্ঠানের পরবর্তী দিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে খলীফার প্রথম ভাষণে যথাযোগ্য হামদ-ছানার পর আবূ বকর (রা) বললেন,

"আম্মাবাদ, হে লোক সকল! তোমাদের যিম্মাদারি আমার ওপর চাপানো হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। সুতরাং সঠিক কাজ যদি করি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি ভুল করি তাহলে আমাকে সোজা পথে নিয়ে আসবে। সত্যবাদিতা আমানত, আর মিথ্যাবাদিতা খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল, যতক্ষণ না আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার হক তার কাছে ফিরে আসে। আর তোমাদের সবল ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ না আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার কবল হতে (অন্যের) হক উদ্ধার করতে পারি।

যে কোন কওম আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ বর্জন করবে আল্লাহ্ তাদর অপদস্থ করবেন। আর যখনই অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে আল্লাহ্ তাদের ওপর বালা মুসিবত চাপিয়ে দেবেন। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যে অবিচল থাকি তোমরা আমার আনুগত্য করো। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমি তোমাদের আনুগত্যের হকদার নই।

নামাযে দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের রহম করুন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৭]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত কোন দৈব আনুকূল্য, ঘটনাচক্র, কিংবা সফল ষড়যন্ত্রের ফসল ছিলো না, বরং তা ছিলো সর্বজ্ঞানী ও সর্ব ক্ষমতাবান আল্লাহ্র ফায়সালা। আরও ছিলো এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, আল্লাহ্ চান সর্ব ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় এবং সর্বজাতির ওপর সুসংহত মুসলিম উম্মাহর উত্থান। তাছাড়া চিরস্বাধীন আরবদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। কেননা গোত্রীয় নেতৃত্ব ও সমর অধিনায়কত্বের ক্ষেত্রে গুণ ও বয়স এবং প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার বিচারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই তারা বরণ করে থাকে। এটা তাদের যুগ যুগের ঐতিহ্য।

ভারতবর্ষে ইংরেজী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক-গবেষক সৈয়দ আমীর আলী ইতিহাসের এ সত্যকে বড় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, মূলত আরবদের গোত্রীয় নেতৃত্ব উত্তরাধিকার পদ্ধতির পরিবর্তে নির্বাচন নির্ভর ছিলো এবং এই 'ভোটাধিকার নীতি' তারা যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে পালন ও

সংরক্ষণ করতো। গোত্রপ্রধান নির্বাচনকালে প্রত্যক সদস্য তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতো। পরবর্তীতে গোত্রপ্রধানের পুরুষ উত্তরাধিকারীদের কোন একজনকে বয়স ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন করতো।

প্রথম খলীফা নির্বাচনকালে এই প্রাচীন আরব রীতি অনুসৃত হয়েছিলো। আর পরিস্থিতির নাযুকতার কারণে যেহেতু কোন রকম দীর্ঘসূত্রিতার অবকাশ ছিলো না। তাই সম্ভাব্য দ্রুত প্রক্রিয়ায় (প্রথম) খলীফারূপে আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিলো। অবশ্য বয়স ও অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব ও মর্যাদার বিষয়টিও বিবেচনায় ছিলো। কেননা আরবরা এগুলো পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করতো। আবূ বকর (রা)-এর প্রজ্ঞা ও সংযম বিশেষভাবে স্বীকৃত ছিলো। পক্ষান্তরে নবী-পরিবার ও হযরত আলী (রা) ইসলামের প্রতি স্বভাব আন্তরিকতা ও প্রশ্নাতীত আনুগত্যের কারণে রাসূলের খলীফারূপে আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এভাবে শাসন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্ বংশ কৌলীন্যের প্রতি অতিভক্তিজাত উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পরিহার করেছিলো।

পক্ষান্তরে প্রথমবারেই যদি ও অতি অবশ্যই যোগ্যতার ভিত্তিতে হাশেমী খলীফা নির্বাচিত হতেন তাহলে হাশেমী পরিবারে যুগপৎ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সমাবেশ ঘটতো । খ্রীস্ট ধর্মের যাজক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইসলাম ধর্মেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতো যার অনিবার্য ফল হিসেবে মুসলিম সমাজেও কায়েমী শাসন-শোষণ এবং নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারসহ যাবতীয় অবক্ষয় দেখা দিতো, যেমন অন্যান্য ধর্ম সমাজে দেখা দিয়েছিলো যার বিবরণ বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন। এভাবে ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন 'প্রজন্মধারা' সৃষ্টি হতো নিজেদেরকে যারা সমাজ-উর্ধ্ব, এমন কি মানব-উর্ধ্ব শ্রেণী বলে দাবি করে বসতো এবং অর্থ-শোষণ, দক্ষিণা গ্রহণ ও 'হাদিয়াবৃত্তি'র ওপর তাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল হয়ে পড়তো, অথচ তা আসমানী হিকমতের সম্পূর্ণ খেলাফ। যেজন্য আল্লাহ্র রাসূল হাশেমী পরিবারের 'যাকাত ভোগ' নিষিদ্ধ করে দেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন,

হাসান ইব্ন আলী একবার সাদকার একটি খেজুর মুখে দিলেন। তখন নবী ﷺ 'ওয়াক ওয়াক' করতে লাগলেন যাতে হাসান তা ফেলে দেন। অতঃপর তিনি বললেন, জানো না, আমরা সাদকার মাল আহার করি না?

[বুখারী, মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, নবী পরিবার ও সাদাকা বিষয়ক অধ্যায়]

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন হারিস হতে বর্ণিত। এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেছেন,

ان هذه الصدقات انما هى من اوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لال محمد .

"এ সমস্ত (যাকাত) সাদাকা হলো মানুষের মালের ময়লা। মুহম্মদ ও মুহম্মদ পরিবারের জন্য তা হালাল নয়।" [সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় ঃ যাকাত]

এভাবে আল্লাহ্ হাশেমী পরিবার ও নবী-পরিবারকে এ আয়াতের নযীর হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.

"হে ঈমানদারগণ! অধিকাংশ ইহুদী ধর্মনেতা ও খ্রীস্টান সাধু অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকে।" [সূরা তাওবা ঃ ৩৪]

বস্তুত যুগপৎ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার যদি হাশেমীরা লাভ করতো তাহলে কখনো তা এই পরিবার বৃত্ত থেকে মুক্ত হতো না। কুরায়শের এক স্পষ্টভাষীর এ মন্তব্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই যে,

"বনূ হাশিম যদি তোমাদের ওপর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন তাহলে কুরায়শের অন্য কোন শাখা কখনো তা পাবে না।"

[আল আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৯৩৮]

হযরত আলী (রা)-এর বিলম্বিত বায়'আতের হিকমত

বিভিন্ন বিপ্লব ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগুলোর উদ্ভব ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। কেননা প্রতিটি সংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হতো 'মানব সমাজের সংশোধন এবং অন্যায় ও অসত্যের অপসারণ, এই উদাত্ত আহ্বানের মাধ্যমে। কিন্তু তা পরিণতি লাভ করতো বিপ্লব ও আন্দোলনের প্রবর্তক যিনি তার 'শক্তি ও ক্ষমতা' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণ যে কোন আদর্শিক বিপ্লব ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে অতি সতর্ক ও সংবেদনশীল মনোভাব প্রদর্শন করে থাকেন।

কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ানকে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের 'জিজ্ঞাসাবাদ' থেকেও বিষয়টি বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে ওঠে।

ইসলামের নবীর পক্ষ হতে 'দাওয়া-পত্র' পেয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে তলব করে 'নবী' সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং যে অনুভূতি ও মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা একদিকে যেমন সম্রাটের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক তেমনি তা কোন নব-বিপ্লব সম্পর্কে মানুষের স্বভাব সতর্কতার প্রমাণ। বিভিন্ন প্রশ্নের মাঝে আবূ সুফিয়ানকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আবূ সুফিয়ান বললেন, না।

শেষ পর্যায়ে সম্রাট মন্তব্য করলেন, তুমি বলেছ, তাঁর পূর্বপুরুষে কেউ বাদশাহ ছিলেন না, তখন আমি ভাবলাম যে, তেমন যদি হতো তাহলে বলতে পারতাম যে, একজন মানুষ তার পূর্বপুরুষের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের মতলব করছে। [বুখারী : অহীর সূচনা অধ্যায়]

এখন প্রশ্ন হলো, নবী ও নবুয়ত এবং দাঈ ও দাওয়াত সম্পর্কে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যেখানে 'পূর্বপুরুষে কেউ বাদশাহ ছিলেন না' এই ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন সেখানে এই নবুয়তি দাওয়াত যদি নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পরই নবী-পরিবারে 'শাসনধারা' জন্মই দিতো তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াতো? এমন ভুল ধারণা কি দাওয়াতের পথে অন্তরায় হতো না যে, আল্লাহ্ না করুন পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সংরক্ষণ ও পারিবারিক ব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিলো নবুয়তি দাওয়াতের উদ্দেশ্য?

সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ফায়সালা হিসেবেই নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আহলে বায়ত ও হাশিমী পরিবারের কোন সদস্য মুসলমানদের শাসনভার ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি, বরং যথাক্রমে বনু তায়ম গোত্রের হযরত আবূ বকর (রা) ও বনূ আদী গোত্রের হযরত উমর (রা) এবং বনূ উমাইয়া গোত্রের হযরত উসমান (রা), এরপর চতুর্থ পর্যায়ে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর ওপর, যখন উম্মাহর মাঝে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও খিলাফতের জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ ছিলেন না। ফলে ভুল ধারণারও কোন অবকাশ ছিলো না। কেননা বিষয়টি তখন গোষ্ঠী ও পরিবারের পর্যায় অতিক্রম করে অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার পর্যায়ে এসে গিয়েছিলো। দুষ্ট কথার কোন সুযোগ সেখানে ছিলো না। আর আল্লাহ্‌র ফায়সালা তো চিরঅটল।

নীতির প্রতি অবিচল সিদ্দীকে আকবরের প্রথম পরীক্ষা

হাদীসবিশারদ ও ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সর্বসম্মতরূপে প্রমাণিত হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

انا معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة.

"আমরা নবীগণ মীরাস রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকারূপে গণ্য।" [মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৩]

নিজস্ব সনদে ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا يقسم ورثتى دينارًا ولا درهماً ما تركت بعد نفقة نسائى ومعونة عاملى فهو صدقة.

"আমার ওয়ারিশগণ দীনার দিরহাম বাটোয়ারা করতে পারে না, আমার স্ত্রীদের খোরপোষ এবং আমার ব্যবস্থাপকের ভাতা বাবদ খরচের পর যা থাকবে তা সাদাকারূপে গণ্য হবে।"

বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর সূত্রে তাঁর নিজস্ব সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে অভিন্ন শব্দে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র) উরওয়া (র)-এর সূত্রে, আর তিনি হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর স্ত্রীগণ মীরাস প্রার্থনা করে হযরত উসমান (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট পাঠাতে মনস্থ করলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) এই বলে বাধা দিলেন, আল্লাহর রাসূল তো বলেছেন, আমরা মীরাস রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।

ইমাম মুসলিম (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। বস্তুত এই নববী ফরমানই ছিলো শানে রিসালাতের উপযুক্ত এবং তাঁর সারা জীবনের নীতি ও আচরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা বিপদ-ঝুঁকির মুখে আহলে বায়ত ও বনূ হাশিমকেই তিনি আগে রাখতেন, অথচ গনীমত লাভের সময় তাদেরকে রাখতেন পেছনে। যেমন বদরের মাঠে কুরায়শের শ্রেষ্ঠ বীরদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য তিনি হামযা, আলী ও উবায়দা (রা)-কে ডেকেছিলেন, কিন্তু সাদাকা ও যাকাত গ্রহণ তাদের জন্য বারণ করেছেন, অথচ মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সাদাকা যাকাতই হলো অন্যতম প্রধান অর্থ ক্ষেত্র। এ যেন সম্পদের চিরপ্রবহমান এক স্রোতধারা যা কোনদিন শুকিয়ে যাবে না।

তদ্রূপ জাহিলিয়াতের যুগ থেকে চলে আসা অর্থের সুদ ও 'রক্তের শোধ' যখন বাতিল ঘোষিত হলো তখন তিনি চাচা আব্বাস ও আব্বাস (রা)-এর

ভাতিজা ইব্ন রাবী'আকে দিয়ে তা শুরু করলেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বললেন,

وربا الجاهلية موضوع ، واول ربًا اضعه ربانا مربا العباس بن عبد المطلب ، ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث.

"জাহিলিয়াতের সকল যুদ্ধ রহিত হলো এবং সবার আগে আমাদের আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করলাম। তদ্রূপ জাহিলিয়াতের সকল 'রক্ত-শোধ' রহিত হলো এবং সবার আগে আমাদের ইব্ন রাবী'আ ইব্নুল হারিছের রক্ত শোধ রহিত করলাম।" [মুসলিম, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : হিজ্জাতুন্নাবী ﷺ]

হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর নামে লেখা এক পত্রে হযরত আলী (রা) নিজেও এ সত্য তুলে ধরেছেন এভাবে :

ঘোরতর যুদ্ধে মানুষের দিশেহারা অবস্থায় আপন পরিবারকেই তিনি আগে বাড়াতেন এবং তাদেরকে ঢাল বানিয়ে অন্যদেরকে তীর-তলোয়ারের সামনে থেকে রক্ষা করতেন। তাই বদরের যুদ্ধে ওবায়দার রক্ত ঝরেছে, ওহুদের মাঠে হামযা শহীদ হয়েছেন আর মুতার যুদ্ধে জাফর ইব্ন আবূ তালিব জান দিয়ে ঝাণ্ডা রক্ষা করেছেন। [নাহজুল বালাগাহ, পৃষ্ঠা ৩৬৮-৩৬৯]

ইতোমধ্যে এমন এক নাযুক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যা নীতি ও বিশ্বাসের প্রতি সিদ্দীকে আকবারের অবিচলতা ও আপন জ্ঞান মুতাবিক ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাঁর চিরদায়বদ্ধতার উজ্জ্বলতম প্রমাণ হয়ে আছে। আর মানুষ তো নিজের জ্ঞান ও বিবেচনার কাছেই দায়বদ্ধ!

বস্তুত নীতি ও রাজনীতি এবং আবেগ ও শরীয়তের সমান্তরাল অবস্থানের কারণে বিষয়টি অতি সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু শরীয়তের বিধানকে তিনি আবেগ ও রাজনীতির উর্ধ্বে রেখেছিলেন এবং নবীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তিনি যা জানতেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় ঘটনা এরূপ– হযরত ফাতিমা (রা) ও আব্বাস (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মীরাস হিসেবে খায়বার ও ফাদাক অঞ্চলের জমি ও হিস্সা দাবি করলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আমরা মীরাস রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা। মুহম্মদের পরিবার এই মাল দ্বারাই শুধু জীবিকা নির্বাহ করবে।

অন্য বর্ণনামতে আবূ বকর (রা) বলেছেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীরাস রেখে যান না, তবে তিনি যে ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতেন আমিও তা করবো এবং তিনি যাদের জন্য খরচ করতেন আমিও তাদের জন্য খরচ করবো।

[মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০]

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে মদীনা ও ফাদাক অঞ্চলে যা দান করেছিলেন এবং খায়বারের পঞ্চমাংশ হতে যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো নবী কন্যা ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট সেগুলোর মীরাস দাবি করে পাঠালেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো বলেছেন, "আমরা মীরাস রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।" মুহম্মদের পরিবার শুধু এই সম্পদ হতে জীবিকা গ্রহণ করতে পারে।

"আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় সাদাকার মাল যে অবস্থায় ছিলো আমি তাতে সামান্য পরিবর্তনও করবো না, বরং এ ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন আমিও হুবহু তাই করবো।" [বুখারী, খায়বার যুদ্ধ]

হযরত আবূ বকর (রা) আরো বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূলকে করতে দেখেছি, এমন কোন কাজ না করে আমি ক্ষান্ত হবো না।

মোটকথা, আবূ বকর (রা) যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তার ওপর অবিচল ছিলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নবীর অসিয়ত বাস্তবায়ন করেছিলেন। অন্যদিকে ফাতিমা (রা)-ও মীরাসের দাবির ওপর অটল ছিলেন। কেননা সম্ভবত এ হাদীস তাঁর জানা ছিলো না কিংবা হয়তো তিনি মনে করতেন যে, তাঁর 'পিতৃ-চিহ্ন' লাভের আরযু রক্ষা করার নৈতিক ক্ষমতা ও অবকাশ আল্লাহ্র রাসূলের প্রথম খলীফার ছিলো। মোটকথা, উভয়ে ইজতিহাদ করেছেন এবং উভয়ের নিজস্ব কৈফিয়ত রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনামতে হযরত ফাতিমা (রা) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আপনি যা শুনেছেন সে সম্পর্কে আপনিই ভালো জানেন।

[মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪]

মহানবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পর হযরত ফাতিমা (রা) ছয় মাস বেঁচেছিলেন এবং এ কারণে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আবূ বকর (রা)-এর প্রতি অপ্রসন্ন ও বিমুখ ছিলেন।

বলা বাহুল্য, মানব স্বভাবের প্রকাশ হিসেবে যে কোন সমাজ-জীবনে এ ধরনের ঘটনা অতি স্বাভাবিক। কেননা আবেগ ও সংবেদনশীলতা এবং নিজস্ব

জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি অবিচলতা দু'টোই মানুষের স্বভাব ও ফিতরাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে এটা অবধারিত যে, নবী-কন্যার এই মতভিন্নতা ও অপ্রসন্নতা শরীয়তের সীমাবহির্ভূত ছিলো না কিংবা তাঁর স্বভাব মহত্ত্ব ও চিত্ত ঔদার্যের পরিপন্থীও ছিলো না। হযরত আমির (রা) বলেন, নবী-কন্যার অসুস্থতা যখন তীব্র রূপ ধারণ করেছিলো তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। হযরত আলী (রা) বললেন, এই দেখো, আবূ বকর দরজায় এসেছেন। ইচ্ছা করলে তুমি অনুমতি দিতে পার। হযরত ফাতিমা বললেন, এটাই কি আপনার পছন্দ? হযরত আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত আবূ বকর (রা) গৃহে প্রবেশ করে কৈফিয়তমূলক কথা বললেন আর নবী-কন্যা তাঁর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করলেন।

আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ গ্রন্থে গবেষক আল আক্কাদের যে মন্তব্য সেটাই এ আলোচনার শেষ কথা হতে পারে।

তিনি বলেন, এ অজুহাতে নবী ﷺ-এর প্রতি সিদ্দীকে আকবারের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা বিবেকসম্মত নয়। কেননা আপন কন্যা আয়েশাকেও তিনি একইভাবে বঞ্চিত করেছেন। আসল কারণ এই যে, মুহাম্মদী শরীয়ত মতে নবীগণ কোন মীরাস রেখে যান না। সুতরাং আপন কন্যা আয়েশাসহ নবী-পরিবারকে মীরাস না দেয়ার কারণ 'কৃপণতা' ছিলো না, বরং দীনে মুহাম্মদী ও অসিয়তে মুহম্মদীকে রক্ষা করাই ছিলো এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। আর মন রক্ষার পরিবর্তে দীন রক্ষাই তো কর্তব্য!

[আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৪৪৬]

আল আক্কাদ আরো লিখেছেন,

মীরাস প্রশ্নে হযরত আবূ বকর (রা) যা করেছেন তা থেকে ভিন্ন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কেননা তাঁর সামনে হাদীস ছিলো যে, নবী মীরাস রেখে যান না।

এ ক্ষেত্রে কন্যা আয়েশা (রা)-এর প্রতিও তাঁর আচরণ ছিলো অভিন্ন। মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশা (রা)-কে তিনি অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁকে যে মাল তিনি হেবা করেছিলেন তা যেন মুসলমানদের অনুকূলে তিনি ছেড়ে দেন, অথচ হেবা ও মীরাস সূত্রে হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য ঐ মাল সম্পূর্ণ হালাল ছিলো।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৮]

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য এই যে, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পূর্ণ খিলাফতকালে আহলে বায়তের যথাযথ হক আদায় করেছেন এবং খায়বারের

পঞ্চমাংশ ফাদাক অঞ্চলের সম্পদ ও মদীনার যে সকল ফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মালিকানায় ছিলো তা থেকে আহলে বায়তের প্রাপ্য যথারীতি আদায় করেছেন। এতে হাদীসের ভিত্তিতে ঐ সম্পদে মীরাস অনুমোদন করেন নি।

মুহম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (যিনি মুহম্মদ বাকির নামে সুপরিচিত) ও যায়দ ইব্‌ন আলী শহীদ বলেছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কোন অবিচার বা অভিযোগযোগ্য কোন আচরণ হয়নি।

ফাতিমাতুয যাহ্‌রা (রা)

নবীজীর কলিজার টুকরা ও জান্নাতী নারী সমাজের সভানেত্রী হযরত ফাতিমা (রা) সম্পর্কে এখানে কিছু না লিখে কলম যেন অগ্রসর হতে চায় না। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি ছিলেন নবী ﷺ -এর সর্বকনিষ্ঠা ও প্রিয়তমা দুহিতা। ওয়াকিদীর বর্ণনায় আবূ জাফর আল-বাকির-এর সূত্রে হযরত আব্বাস (রা) বলেছেন,

নবীজীর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণকালে ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাদায়েনী এ বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, নবুয়ত লাভের মাত্র দু'এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম এবং দ্বিতীয় হিজরীর মুহররমের মাথায় হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ। কিতাবুল আমালী গ্রন্থে শায়খ আবূ জাফর তূসী প্রমাণ করেছেন যে, নবী-কন্যার বিবাহ, যৌতুক পছন্দ ও সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আবূ বকর (রা) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। [১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯]

অনুরূপভাবে নববধূর 'সাজসজ্জা' ও নব দম্পতির 'বাসর শয্যা আয়োজনের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা)-এর বিশেষ ভূমিকা ছিলো।

[ইব্‌নে মাজাহ, অধ্যায় : নিকাহ]

একমাত্র হযরত ফাতিমা (রা) দ্বারাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বংশধারা বিস্তার লাভ করেছে, তাঁর বিবাহ হয়েছিলো আঠারো বছর বয়সে। এক বর্ণনামতে তাঁর বয়স হয়েছিলো পনের কিংবা পনের বছর ছয় মাস।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ফাতিমার আব্বাকে ছাড়া তাঁর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ আমি দেখিনি। [তাবারানী]

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ নাঈম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে মারফু হাদীস বর্ণনা করেন,

سيدة نساء اهل الجنة الا ما كان من مريم بنت عمران ـ

"ফাতিমা হলেন জান্নাতের নারীকুলের সভানেত্রী, অবশ্য মারয়াম বিনতে ইমরানের কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরে থাকা অবস্থায় বলতে শুনেছি :

فاطمة بضعة مني ، يؤذيني ما اذاه ويريبني ما رابها .

"ফাতিমা আমার সত্তার অংশ, তার যাতে কষ্ট, আমারও তাতে কষ্ট এবং তার যা পছন্দ, আমারও তা পছন্দ।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার দেখলাম, ফাতিমার হাঁটার ভঙ্গিটা ঠিক যেন আল্লাহ্‌র রাসূলের মতো!

আবূ উমর বলেন, তিনি হাসান, হুসায়ন, উম্মে কুলসুম ও যায়নাবের আম্মা, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আলী (রা) দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি।

আবূ সা'লাবা আল খাশানী-এর সূত্রে উকবা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন জায়গা বা সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। তারপর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সাথে দেখা করে স্ত্রীদের ঘরে যেতেন।

আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনায় উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন :

ما رأيت احدًا كان اشبه كلامًا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة .

"বচনে ও বাচনে আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে ফাতিমার চেয়ে অধিক মিল কারো দেখিনি।" [ইস্তিআব, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪-৩৭৭]

সর্বউপায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তুষ্টি ও সন্তুষ্টি সাধনই ছিলো তাঁর সর্ব সময়ের চিন্তা। সন্তানের স্বাভাবিক ভালোবাসা ছাড়াও তাঁর প্রতি ছিলো তাঁর এক প্রকার 'মাতৃমমতা'। এখানে এমন কতিপয় ঘটনার নমুনা তুলে ধরছি।

১. হযরত ইব্‌নে উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ সফরে যাওয়ার সময় শেষ দেখা এবং ফিরে আসার পর প্রথম দেখা হযরত ফাতিমার সঙ্গে করতেন। তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর যথারীতি তিনি ফাতিমাকে দেখতে গেলেন। ফাতিমা নতুন কাপড়ে জাফরান মেখে দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছিলেন কিংবা চাদর বিছিয়েছিলেন। এটা দেখে নবী ﷺ চলে এলেন এবং মসজিদে বসে থাকলেন। ফাতিমা (রা) তখন বিলাল (রা)-কে খবর পাঠালেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন, কেন তিনি আমার দরজা থেকে ফিরে গেলেন? বিলাল (রা) বিষয়টি আল্লাহ্‌র রাসূলকে অবহিত করলেন। তখন তিনি বললেন, ফাতিমাকে কী সমস্ত করতে

দেখলাম। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) পর্দাসহ নতুন যা কিছু তৈরি করেছিলেন তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং নতুন সাজ-পোশাক ফেলে পুরনো সাধারণ পোশাক পরিধান করলেন। হযরত বিলাল (রা)-এর মাধ্যমে ঘটনা জেনে নবী ﷺ হযরত ফাতিমার গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা তোমার প্রতি উৎসর্গীকৃত! এমনভাবেই থেকো না! [বুখারী ও আবূ দাউদ]

২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দেখা করতে এসে হযরত ফাতিমা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ না করেই ফিরে গেলেন। পরে হযরত আলী (রা) ঘরে এসে ঘটনা জানলেন এবং দরবারে নববীতে হাযির হয়ে বিষয়টি আরয করলেন। তখন তিনি বললেন, ফাতিমার দরজায় পর্দা ঝোলানো দেখলাম। দুনিয়ার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক বলো!

বর্ণনাকারী বলেন, পর্দাটা ছিলো নকশাদার। হযরত আলী (রা)-এর মুখে ঘটনা শুনে ফাতিমা (রা) বললেন, তিনি যা ইচ্ছা আদেশ করুন। তখন নবী ﷺ বলে পাঠালেন, এটা অমুক পরিবারকে দিয়ে দাও, তাদের প্রয়োজন রয়েছে [আহমাদ]

৩. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুক্ত দাস হযরত সাওবান (রা) বলেন, সফরে বের হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরিবার-পরিজনের মধ্যে সবার শেষে ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে দেখা করতেন এবং ফেরার পর সর্বপ্রথম তাঁর ঘরে যেতেন। একবার তিনি এক অভিযান থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। এদিকে ফাতিমা (রা) ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছিলেন এবং হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে রূপোর বালা পরিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দেখা না করেই চলে এলেন। ফাতিমা (রা) ভাবলেন, আর কিছু নয়, এগুলোই তাঁর অপ্রসন্নতার কারণ। তাই তিনি পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বালা খুলে ফেললেন, তাতে বাচ্চাদের কান্না শুরু হলো। তখন তিনি বালা দু'টি তাদের হাতে দিয়ে দিলেন আর তারা কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তিনি বালা দু'টি নিয়ে মদীনার একটি পরিবারের নাম করে বললেন, হে সাওবান, এটা অমুককে দিয়ে দাও। এরা আমার আহলে বায়ত। নিজেদের উত্তম বস্তুগুলো দুনিয়ার জীবনেই এরা ভোগ করে ফেলবে– এটা আমার পছন্দ নয়। হে সাওবান! ফাতিমার জন্য একটি পুঁতির হার ও হাতির দাঁতের দু টি বালা খরিদ করো।

[আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ]

পিতার প্রতি, যিনি ছিলেন তাঁর ও সমগ্র মানব জাতির নবী ভালোবাসা ও 'মাতৃমমতার' পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিলো হৃদয় বিদীর্ণকারী সেই একটিমাত্র শোক-বাক্যে পৃথিবীর সেরা শোকগাথাও যার সমতুল্য হতে পারে না। নবী ﷺ-এর জানাযার পর চিরবিদায়ের সময় তিনি বলেছিলেন,

يا انس! اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب۔

"হে আনাস! আল্লাহ্‌র রাসূলের ওপর মাটি ছড়িয়ে দিতে মন তোমাদের সায় দিলো কীভাবে?" [বুখারী, অনুচ্ছেদ : মারাদুন্নাবী ﷺ ওয়া ওয়াফাতিহ্]

প্রসিদ্ধতম মতে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের ছয় মাস পর হযরত ফাতিমার ইন্তিকাল হয়েছিলো। মৃত্যুশয্যায় আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, নবী-পরিবারে সবার আগে তিনিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। আর বলেছিলেন,

اما ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة۔

"মা, তুমি কি 'তুষ্ট' নও যে, জান্নাতের নারীকুলে তুমি হবে সভানেত্রী!"
[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩২]

ইব্‌ন জোরায়হ-এর সূত্রে আবদুর রাযযাক বলেন, চার কন্যার মাঝে বয়সে ফাতিমা (রা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা কিন্তু নবীর আদর-সোহাগে সবার 'ওপরে।'

আবূ উমর বলেন, মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদিকেই সায় দেয় যে, যায়নাব সবার বড়, এরপর যথাক্রমে রোকাইয়াহ, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা (রা)-(মুসনাদে ফাতিমাতুয-যাহরা)। তাঁর মৃত্যু তারিখ ১১ হিজরীর ৩ রামাযান, রোজ মঙ্গলবার) [আল-ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮০]

হযরত আলী ইব্‌ন হুসায়ন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিলো। হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, যোবায়র ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। জানাযার নামাযের সময় হযরত আলী (রা) বললেন, হে আবূ বকর, অগ্রসর হোন। তিনি বললেন, হে আবুল হাসান, আপনার উপস্থিতিতে আমি নামায পড়াবো! হযরত আলী (রা) বললেন, অবশ্যই, আগে বাড়ুন। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি ছাড়া অন্য কেউ নন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) জানাযা পড়ালেন এবং রাতেই তাঁকে দাফন করা হলো। [মুসনাদে ফাতিমাতুয যাহরা]

তাবাকাত গ্রন্থে ইব্‌ন সা'দ নিজস্ব সনদে বলেন, নবী-কন্যা হযরত ফাতিমার জানাযা আবূ বকর (রা) পড়িয়েছেন এবং চার তাকবীর বলেছেন। তাঁর সন্তানেরা হলেন হযরত হাসান, হুসায়ন, মুহসিন ও উম্মে কুলছুম।
[ইব্‌ন সা'দের তাবাকাত কুবরা, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯]

নবী-দুলালী ফাতিমার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে তুষ্ট করুন।

হযরত আলী (রা)-এর বায়আত গ্রহণ

হযরত আলী (রা)-এর বায়আত গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। হাকিম আবূ বকর আল-বায়হাকী নিজস্ব সনদে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের মাঝে আলী (রা)-কে দেখতে না পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং অভিযোগের সুরে বললেন, হে নবীর পিতৃব্য পুত্র ও তাঁর কন্যার জামাতা! আপনি কি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল দেখতে চান? তিনি বললেন, হে খালীফাতুর রাসূল! কোন তিরস্কার নয়। এরপর তিনি আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯]

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, বিশুদ্ধতম মতে নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই হযরত আলী (রা) বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের কোন মুহূর্তেই আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গ দান ও তাঁর পেছনে নামায আদায় হতে তিনি বিরত থাকেন নি। [প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯]

তবে প্রসিদ্ধতম মত এই যে, ফাতিমা (রা)-এর কিছুটা মন রক্ষার জন্য প্রথম দিকে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন নি। নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের ছয় মাস পর যখন তাঁর ইন্তিকাল হলো তখন তিনি জনসমক্ষে বায়'আত করেছেন।

তবে ইব্‌ন কাছীর ও অন্যান্য বহু 'আহলে ইলম' মনে করেন যে, এটা ছিলো প্রথম বায়আতের নবায়নমাত্র। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এর অনুকূলে কিছু বর্ণনাও রয়েছে। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৬]

প্রথম পরীক্ষা ও অবিচলতা

শুরুতেই হযরত আলী (রা) এমন এক নাযুক অবস্থার সম্মুখীন হলেন যাতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, খলীফা ও খিলাফতের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং জাহিলিয়াতের অহংবোধ ও গোত্রপ্রীতি থেকে তাঁর পবিত্রতার কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেলো এবং তাতে তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণও হলেন। সুয়াঈদ ইব্‌ন গাফলাহ-এর সূত্রে ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

আবূ সুফিয়ান (রা) হযরত আলী ও আব্বাস (রা)-কে বললেন, হে আলী! আর তুমি হে আব্বাস! বলো দেখি, খিলাফতের এ কেমন দুর্গতি যে, কুরায়শের হীনতম এক গোত্রে তা কুক্ষিগত হলো! আল্লাহ্‌র কসম! যদি চাও তাহলে

অশ্বদল ও পদাতিক দলের পদভারে তাঁকে কাঁপিয়ে দেবো। কিন্তু আলী (রা) বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তা চাই না। কেননা আবূ বকর উপযুক্ত না হলে আমরা তাঁকে ছাড় দিতাম না। হে আবূ সুফিয়ান, মু'মিনগণ হিতাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায়। দেশ ও গোত্রের উর্ধ্বে পরস্পরের প্রতি তারা সম্প্রীতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে মুনাফিকেরা হলো ধূর্ত সম্প্রদায়। পরস্পরের প্রতি প্রতারণা তাদের জন্মগত। নাহজুল বালাগা-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইব্‌ন আবিল হাদীদ বলেন,

আবূ সুফিয়ান হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত হওয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত আলী (রা) তখন বললেন, তুমি এমন বিষয় আবদার করছো যা আমাদের জন্য নয়। তাছাড়া আল্লাহ্র রাসূল আমাকে এক ওয়াদায় আবদ্ধ করে গিয়েছেন, আমি তাতে অবিচল থাকতে চাই। আবূ সুফিয়ান তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের ঘরে তাঁর সাথে দেখা করে বললেন, হে আবূ ফাযল, আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের উত্তরাধিকারের আপনিই অধিক হকদার। সুতরাং হস্ত প্রসারিত করুন, আমি বায়আত হবো। আমার বায়আতের পর কেউ আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

আব্বাস (রা) হেসে বললেন, হে আবূ সুফিয়ান! আলী যা অগ্রহণ করছেন আমি তা গ্রহণ করবো? আবূ সুফয়ান তখন নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

[ইব্‌ন আবুল হাদীদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮]

ইব্‌ন আবীল হাদীদের বর্ণনায় আরো আছে যে, ফযল ইব্‌ন আব্বাস যখন বললেন, হে বন্ধু তায়ম! নবুয়তের কল্যাণেই তোমরা খিলাফত পেয়েছো, অথচ তোমরা নও, আমরাই তার হকদার। আবূ লাহব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের এক পুত্র এ সম্পর্কে কবিতাও রচনা করলো।

হযরত যোবায়ের (রা) বলেন, তখন আলী (রা) লোক পাঠিয়ে তাকে বারণ করলেন এবং পূর্ণ সংযম পালনের আদেশ করে বললেন, আমাদের কাছে দীনের নিরাপত্তা অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে।

প্রথম খলীফার প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা

দুই বছরের পূর্ণ খিলাফতকালে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি হযরত আলী (রা)-এর আচরণ ছিলো খুবই আন্তরিক ও হিতাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। কেননা তাঁর কাছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চিন্তাই ছিলো একক অগ্রাধিকারের বিষয়। অবশ্য তাঁর 'বংশ গরিমা ও স্বভাব মহিমা' কাছে এটাই ছিলো প্রত্যাশিত।

এই আন্তরিকতা, কল্যাণ চিন্তা এবং উম্মাহর ঐক্য ও খিলাফতের অস্তিত্বের প্রশ্নে তাঁর সংবেদনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় যিল-কিসসার ঘটনায়। হযরত আবূ বকর (রা) স্বয়ং ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি যিল-কিসসা অভিমুখে যাত্রাও করেছিলেন। কিন্তু এতে একদিকে যেমন ছিলো খলীফার প্রাণের ঝুঁকি, তেমনি ছিলো খিলাফতের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

দারে কুতনির নিজস্ব সনদের বর্ণনায় ইব্ন কাছীর (র) বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর (রা) যখন যিল-কিসসা অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব উটের লাগাম ধরে বললেন, হে খলীফাতুর রাসূল! কোথায় চলেছেন? ওহুদের দিন আল্লাহ্র রাসূল আপনাকে যা বলেছিলেন আমিও তাই বলি, হে আবূ বকর! তোমার শোকে আমাদের বিদ্ধ করো না।

হে খলীফাতুর রাসূল! মদীনায় ফিরে আসুন। আল্লাহ্র কসম! আপনাকে হারালে আর কখনো ইসলামের কোন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না।

তখন আবূ বকর (রা) মদীনায় ফিরে এলেন। যাকারিয়া আস-সাজী ও যুহরী হযরত আয়েশা (রা) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪-৩১৫]

আল্লাহ্ না করুন, তিনি যদি আবূ বকর (রা)-এর প্রতি 'প্রসন্ন' না হতেন এবং তাঁর বায়'আত যদি আন্তরিক না হতেন তাহলে এটা তো ছিলো এক সুবর্ণ সুযোগ। একটি 'দুর্ঘটনা' আশায় তিনি তো খলীফাকে তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে পারতেন! এতে তাঁর খিলাফত লাভের পথ নিষ্কণ্টক হওয়ার একটা সুযোগও থাকতো।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষ এতই যদি ফেনায়িত হয়ে থাকে এবং এই 'বিপদ' থেকে নিস্তার লাভের চিন্তা এতই যদি প্রবল হয়ে থাকে (আল্লাহ্র সাক্ষী, এমন নীচতা থেকে তিনি পবিত্র) তাহলে অতি সহজেই তো ঐ যুদ্ধে তিনি গুপ্তঘাতকের আশ্রয় নিতে পারতেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেমন করে থাকে ক্ষমতা ও রাজনীতির 'কুশলী' খেলোয়াড়রা!

মুসলমানদের শাসক ও আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রতি তাঁর অসাধারণ আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা এবং উম্মাহর কল্যাণ সাধন ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ সহযোগিতার কথা বাদ দিলেও ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে স্থির প্রত্যয়ের সাথে আমরা বলতে পারি যে, সুখে-দুঃখে ও সুসময়ে-দুঃসময়ে সর্বাবস্থায় উভয়ের মাঝে প্রীতি ও সম্প্রীতির এক সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। যেমন থাকে একই পরিবারের দুই সদস্যের মাঝে। এক কথায় তারা ছিলেন رحماء بينهم (সূরা ফাতহ্ : ২৯)-এর জীবন্ত নমুনা।

হাশেমী আলাবী পরিবারের বিশিষ্ট সদস্য মুহম্মদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন (আলবাকির)-এর বর্ণনায়ও এ অনন্য সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, একবার আবূ বকর (রা)-এর কোমরের ব্যথার উপশমের জন্য আলী (রা) আগুনে নিজের হাত গরম করে তাঁর কোমরে সেঁক দিয়েছিলেন।

[আর-রিয়াদুন নাদরা, ১ম খণ্ড, দুররে মানসূর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১]

আহলে বায়তের প্রতি আবূ বকর (রা)-এর মূল্যায়ন ও সৌহার্দ্য

নবী পরিবারের সকল সদস্যের, বিশেষভাবে নবী দৌহিত্র হাসান-হুসায়নের সঙ্গে খলীফাতুল মুসলিমীন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ছিলো অতি সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক যা উভয় পক্ষের জন্যই যথোপযুক্ত।

হযরত উকবা ইবনুল হারিস (রা)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) একবার আসর নামায শেষে বের হলেন, তখন হাসান (রা) সমবয়সীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে কাঁধে তুলে নিলেন আর বললেন, আমার পিতা তোমার জন্যে উৎসর্গীকৃত হোন! ইনি তো নানাজীর আদল পেয়েছেন, বাবাজীর নয়। আলী (রা) তখন মৃদু হাসছিলেন।

[কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ সিফাতুন্নাবী ﷺ]

অন্যদিকে হযরত আলী (রা) স্বয়ং মুহম্মদ ইবন আবূ বকরকে প্রতিপালন করেছিলেন, এমন কি খিলাফতের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করে মানুষের সমালোচনাও শুনেছেন। তাছাড়া সিদ্দীকে আকবরের স্মৃতি স্মরণ করে এক পুত্রের নাম আবূ বকর রেখেছিলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩২]

এক নযরে খিলাফতকালের সিদ্দীকী জীবন

এখানে আমরা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর চিরবিদায় ও আলী (রা)-এর শোকবাণী উল্লেখ করে আলোচ্য অধ্যায়ের ইতি টানবো। তবে তার আগে দু'বছরের সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে কেমন ছিলো তাঁর জীবন সে সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। বস্তুত শুধু সরলতা ও অনাড়ম্বরতাই নয়, বরং চূড়ান্ত যুহদ, নির্মোহতা, সংযম ও কৃচ্ছের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই ছিলো তাঁর জীবন ও চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুনিয়া ও দুনিয়া ভোগ সম্পর্কে তিনি নবী-জীবনের পূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

ড. ফিলিপ হিট্টি তাঁর সুবিখ্যাত "A Short History of the Arabs" গ্রন্থে লিখেছেন, ধর্মত্যাগের ফিতনা দমনপূর্বক আরব উপদ্বীপকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধকারী আবূ বকর (রা) একান্ত অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর জীবন যাপন করতেন। সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালের প্রথম ছয় মাস তিনি মদীনার অদূরবর্তী 'সানাহ' এলাকায় অতি সাধারণ এক ঘরে সস্ত্রীক বাস করতেন এবং সেখান থেকে প্রতিদিন রাজধানী মদীনায় আসতেন। কোন বেতনভাতা তখন তিনি গ্রহণ করতেন না। কেননা নবীন রাষ্ট্রের তেমন কোন আয় ছিলো না। মসজিদে নববীর অঙ্গনে থেকেই যাবতীয় সরকারী দায়িত্ব তিনি পরিচালনা করতেন।

ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি বিদ্বেষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনামের (?) অধিকারী স্যার উইলিয়াম ময়্যুর পর্যন্ত তার "প্রথম খিলাফতের ঘটনাবলী" গ্রন্থে লিখেছেন,

আবূ বকরের মজলিস ছিলো খুবই অনাড়ম্বর, যেমন ছিলো মুহম্মদ ﷺ-এর মজলিস। সেখানে কোন সেবক প্রহরী ছিলো না এবং ছিলো না

এমন কিছু যাতে শাসকের প্রতাপ ও খিলাফতের জৌলুস প্রকাশ পায়। খিলাফতের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালের বহু ঘটনা প্রমাণ করে যে, যাবতীয় বিষয়ের খুঁটি-নাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। অভাবী ও মজলুম মানুষের খোঁজে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেন। প্রশাসক ও কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিচিন্তা' থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে সুগভীর চিন্তা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রাখতেন।

কুরআন সংকলন

ধর্মত্যাগীদের দমনের সফল অভিযানগুলো ছাড়াও তাঁর যে অমর কীর্তি ইসলামের 'রূপ ও স্বরূপ' অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছে তা হলো কুরআন সংকলনের শুভ প্রচেষ্টায় তাঁর আত্মনিয়োগ, মুরতাদবিরোধী বিভিন্ন অভিযানে[১] বহু হাফিযে কুরআনের শাহাদত বরণের প্রেক্ষিতে তিনি কুরআন সংকলন ও অনুলিপি প্রস্তুতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রসিদ্ধতম মতে তাঁর খিলাফতকালে এ মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

সিদ্দীকে আকবরের ইন্তিকাল ও আলী (রা)-এর শোক প্রকাশ

নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের মাত্র দু'বছর পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকাল গোটা উম্মাহর জন্য ছিলো সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা। আর উম্মাহর এক নিবেদিতপ্রাণ সদস্য হিসেবে হযরত আলী (রা)-ও দারুণভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি যে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর শোক প্রকাশ করেছিলেন তা এখানে তুলে ধরে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের ইতি টানছি।[২]

---

১. মুরতাদবিরোধী ইয়ামামা যুদ্ধে সত্তরজন (বা আরো বেশি) হাফিয সাহাবীর শাহাদত বরণের ঘটনায় ভীষণ বিচলিত হযরত উমর (রা) খলীফ আবূ বকর (রা)-কে কুরআন সংকলন ও অনুলিপি প্রস্তুতকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে বিলুপ্তির আশংকা থেকে কুরআন নিরাপদ থাকে। কেননা পরবর্তীতেও ইয়ামামা- বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তির আশংকা ছিলো। কিন্তু আল্লাহর নবী যা করেন নি তাতে হাত দেয়া আবূ বকর (রা)-এর কাছে ভয়ঙ্কর মনে হলো। তবে পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

২. আল মুহিব্ব আততাবারী রচিত 'আর রিয়াদুন নাদরা' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর নামে একটি দীর্ঘ শোক ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাৎক্ষণিকতা ও অতি দীর্ঘতার কারণে এর শাব্দিক হুবহুতা ও বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে 'প্রশ্ন' হতে পারে ভেবে 'আল জাওহিরাহ ফী নাসাবিন নাবী ﷺ ওয়া আসহাবিহিল আশারা" গ্রন্থের বর্ণনা পেশ করেছি।

বর্ণনামতে ইন্তিকালের সংবাদ শুনে হযরত আলী (রা) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় ছুটে এলেন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন,

"আবূ বকর! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন, ইসলাম গ্রহণে আপনি ছিলেন সবার আগে। ঈমানের পূর্ণতায়, তাকওয়ার উচ্চতায় ও নবীর প্রতি সজাগ সতর্কতায় আপনি ছিলেন সবার ওপরে। সত্যনিষ্ঠায়, চরিত্রের পবিত্রতায় এবং ভাবগম্ভীরতা ও গুণ বিশিষ্টতায় আপনিই ছিলেন আল্লাহ্র নবীর নিকটতম এবং সবার মাঝে তাঁর আস্থাভাজন ও প্রিয়তম। সুতরাং ইসলামের পক্ষ হতে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, মানুষ যখন মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে আপনি তখন সত্য বলে রাসূলকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ আপনাকে সিদ্দীক বলে উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাকী।" [সূরা যুমার ঃ ৩৩]

সবাই যখন পিছিয়েছিলো এবং বসে পড়েছিলো আপনি তখন সান্ত্বনা হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, কঠিন মুহূর্তে সবাই যখন সরে গিয়েছিলো আপনি তখন দরদী হয়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। আর তা ছিলো দু'জনের দ্বিতীয় জন হিসেবে মহত্তম সঙ্গ। গারে ছাওরে আপনি তাঁর সঙ্গী এবং হিজরতের সাথী। সর্বোপরি আপনি ছিলেন তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তি।

উম্মতের মাঝে আপনি তাঁর সর্বোত্তম খলীফা হয়েছিলেন। আপনার সাথীদের দুর্বলতা ও ভেঙ্গে পড়ার মুখেও আপনি অনমনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন। যখন তারা হিমশিম খেয়ে থেমে গেছে তখন আপনি নিজ কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন দীর্ঘ নীরবতায় তেমনি বাকনৈপুণ্যে আপনি ছিলেন অনন্য। হিম্মতে ও মনোবলে অতুলনীয় এবং আখলাকে ও আমলে সবার অনুকরণীয়। আল্লাহ্র রাসূল যেমন বলেছেন, তুমি ছিলে শারীরিকভাবে দুর্বল কিন্তু

আল্লাহ্র ব্যাপারে অতি সবল। নিজের চোখে নিজে তুচ্ছ কিন্তু আল্লাহর কাছে অতি উচ্চ। আসমানে ও যমীনে সবার প্রিয়। সুতরাং আমাদের পক্ষ হতে ও ইসলামের পক্ষ হতে আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

[আল-জাওহিরাহ ফী নাসাবিন নাবী ﷺ ওয়া আসহাবিহিল আশারা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬]

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

অন্তিম শয্যায় প্রথম খলীফা কর্তৃক হযরত উমর (রা)-এর মনোনয়ন আরব ও মুসলিম উম্মাহর নাযুক সময় সন্ধিক্ষণ ও মনোনয়নের সুফল– আরবদের কষ্ট সহিষ্ণুতা, কৃচ্ছ্রতা, সরলতা ও সাহসিকতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দ্বিতীয় খলীফার প্রচেষ্টা, ফারুকী যুগে ইসলামী জাহানের বিস্তার– ফারুকে আযমের প্রতি আলী (রা)-এর সহযোগিতা– ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চিন্তার এবং উমর (রা)-এর প্রতি আন্তরিকতার প্রমাণ– উমর (রা)-এর বাইতুল মুকাদ্দাস সফর, নবী ﷺ পরিবার ও আহলে বাইতের প্রতি উমর (রা)-এর মনোভাব– হিজরী বর্ষ গণনার উদ্বোধন এবং উমর (রা)-এর অবদান, উমর (রা)-এর শাহাদত, আলী (রা)-এর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

প্রথম খলীফা কর্তৃক হযরত উমর (রা)-এর মনোনয়ন ও ইসলামের নাযুক সময় সন্ধিক্ষণে এ মনোনয়নের সুফল

অন্তিম শয্যায় হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে স্থলবর্তী মনোনীত করেছিলেন। কেননা দীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা)-এর কঠোর স্বভাব ও খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনের স্বভাব যোগ্যতার কথা তিনি অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তখন ছিলো ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল যা একটি নবীন ধর্ম ও নবীন উম্মাহর ভাগ্য ও ভবিষ্যত নির্ধারণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। তদুপরি তখন ছিলো ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয়াভিযানের সূচনা পর্ব জাতি ও ধর্মের ইতিহাসে যা অতুলনীয়। আর হযরত আবূ বকর (রা) জানতেন যে, কঠোর ও আপসহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হযরত উমর (রা)-ই ছিলেন ইতিহাসের এই অগ্নি পরীক্ষার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি।

আগুয়ান ইসলামী খিলাফতের মুকাবিলা 'ভাগোয়ান' রোম ও পারস্যের তখন পতনপর্ব শুরু হয়েছিলো। ফলে রোমান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও পার্সিয়ান সাসানী সাম্রাজ্যের অফুরন্ত সম্পদের প্রবল প্রবাহ আরবমুখী হয়ে পড়লো এবং দুই ভোগবাদী সমাজের বিচিত্র ভোগ-বিলাসের এক নতুন দুনিয়া আরবদের সামনে খুলে গেলো। অথচ তথাকথিত সভ্য জীবন ও তার ভোগ সামগ্রী বিলাস প্রাচুর্যের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন কি ইরাকে আরবরা লবণ ভেবে কর্পূর জিহ্বায় লাগাতে শুরু করেছিলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড. পৃষ্ঠা-৬৭]

তাছাড়া একদিকে ছিলো আরবদের স্বভাবগত সাহসী জীবন এবং ইসলামের নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতি বিধান যা আল্লাহ্‌র নবী উম্মাহর জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। অন্যদিকে ছিলো অতি উচ্চ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ ও তাদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন এ দুই ধারার কল্যাণপূর্ণ সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বিজেতা জাতি যে সকল কঠিন সংকট সমস্যার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তার প্রাথমিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

এসব কিছুর আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খিলাফতের জন্য হযরত উমর (রা)-এর মনোনয়ন ছিলো এক আসমানী ফায়সালা যা আল্লাহ্ সিদ্দীকী-হৃদয়ে ইল্‌হাম করেছিলেন এবং তাওফীক দান করেছিলেন। কেননা মানবের প্রতি অনুগ্রহবশত আল্লাহ্ ফায়সালা করেছিলেন যে, ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ সর্বজাতির ও সর্বধর্মের ওপর বিজয়ী হবে এবং যেসব জড়াগ্রস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রে মানব জাতির মালিক মোখতার ও মানব সভ্যতার গতি-প্রকৃতির নিয়ন্তা সেজে বসে আছে তাদের হাত থেকে মানুষ ও মানব সভ্যতার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে।

বলা বাহুল্য, মানব জাতির সামনে ইসলামের এই সুমহান আদর্শের বাস্তব প্রকাশ হলো খিলাফতে রাশেদা এবং এই খিলাফতে রাশেদার গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত উমর (রা)-ই ছিলেন উম্মাহর যোগ্যতম ও বিশ্বস্ততম ব্যক্তি।

সর্বসাধারণের মাঝে ফারুকী প্রভাব এমনই অপ্রতিহত ছিলো যে, কারো কোন প্রকার অবাধ্যতা বা প্রবৃত্তিপরতা ছিলো অকল্পনীয়। স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী যাঁকে আল্লাহ্‌র তরবারি বলেছেন সেই খালেদ সাইফুল্লাহকে অপসারণের ঘটনাই দেখুন। উম্মা ও মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে ছিলো তখন তাঁর অবস্থান ও লাগাতার বিজয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলো তাঁর সৈনিক জীবন। ফলে জিহাদী জযবায় জোরওয়ার ইসলামী সমাজে বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় একটা জ্যোতির্বলয় তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো। তদুপরি এমন এক সময় 'অপসারণ আদেশ' কার্যকর করা হয় ময়দানে যখন তাঁর প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশি। ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানরা যখন সারিবদ্ধ হয়েছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর অপসারণ ও আবূ ওবায়দা (রা)-এর মনোনয়ন পত্র এসে পৌঁছেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র তরবারি হযরত খালিদ "আমীরুল মু'মিনীনের আদেশ শিরোধার্য" বলে অম্লান বদনে তা মেনে নিলেন। [আল-বিদায়া ওয়ান্না নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮–১৯]

এমন কি এ পরিবর্তন ফিতনার কারণ হতে পারে বলে কোন কোন সেনা নায়ক যখন আশংকা প্রকাশ করলেন তখন হযরত খালিদ (রা) এই বলে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন যে, উমর যতদিন আছেন ততদিন ফিতনার আশংকা নেই।

[কাযী আবূ ইউসুফকৃত কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-৮৭ ও তারীখে তাবারী, পৃষ্ঠা-২৫২]

এ ঘটনা একদিকে যেন সর্বযুদ্ধের বিজয়ী ও সর্বজনপ্রিয় সেনাপতি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর আনুগত্য ও আত্মত্যাগের এমন এক সমুজ্জ্বল নিদর্শন যার তুলনা পৃথিবীর সমর ইতিহাসে অতি বিরল, অন্যদিকে তেমনি তা

খালীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা)-এর নির্ভীক, কঠোর ব্যক্তিত্ব, প্রবল প্রতাপ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো মিশর বিজয়ী শাসক আমর ইব্‌নুল 'আস (রা)-এর ঘটনা।

মিসরে একবার তিনি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। তাতে কার ঘোড়া অগ্রগামী– এ নিয়ে তাঁর পুত্র মুহম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস ও জনৈক মিসরীয় প্রতিযোগীর মাঝে বাদানুবাদ হলো। এক পর্যায়ে মুহম্মদ ইব্‌ন আমর দোররা হাতে ছুটে গেলেন এবং চাবুক উঁচিয়ে বললেন, নাও বনেদী ঘরের সন্তানের চাবুক।

পিঠে চাবুকের দাগ নিয়ে সেই মজলুম গিয়ে হাযির হলো খলীফার দরবারে। আর তিনি পিতা-পুত্রকে তলব করে আনলেন মিসর থেকে এবং মজলুমের হাতে দোররা তুলে দিয়ে বললেন, শায়েস্তা করো বনেদী ঘরের পুত্রকে।

অতঃপর তিনি আমর ইব্‌নুল আস (রা)-কে কঠোর তিরস্কারের ভাষায় বললেন–

কবে থেকে মানুষকে তোমরা গোলাম বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের জন্ম হলো স্বাধীন মাতৃগর্ভে। [সীরাতে উমর ইব্‌নুল খাত্তাব, পৃষ্ঠা-৮৬]

বিজেতা আরবদের স্বভাব সরলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও শৌর্যগুণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন জাতি বহু নাযুক সময় সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করেছে। কিন্তু আরব মুসলিম উম্মাহ তখন নাযুকতম এক সময় সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছিলো। কেননা তারা মরুভূমির তাঁবুর ছায়ায় উট-রাখালির অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এমন দু'টি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিলো যাদের ভোগ-বিলাস ও জীবন-জৌলুস ছিলো চরমে। উট বকরীর দুধ-গোশতই ছিলো যাদের প্রধান খাদ্য তাদের কাছে রোম ও পারস্যের ভোজন বিলাস ও খাদ্য বৈচিত্র্য ও ছিলো অকল্পনীয়। ফলে জীবন জৌলুসের এই আচমকা চমকে ও ঝলকে কিছুটা হলেও প্রভাবিত ও অভিভূত হওয়া এবং রুচি সৌন্দর্যের নামে জীবন যাত্রায় পরিবর্তনের হাতছানিতে সাড়া দেয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সামনে হযরত উমর (রা) ছিলেন সহজ-সরল ও কৃচ্ছ্র জীবনের উজ্জ্বলতম নমুনা। অব্যাহত বিজয়াভিযান ও সম্পদ স্রোতের মুখে উম্মাহর জীবন যাত্রায় ও মন-মানসে সূচিত পরিবর্তনের প্রতি ছিলো তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। সেই সাথে ছিলো উম্মাহর অভিভাবক হিসেবে কঠোর শাসন।

হযরত উমর (রা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের বিবরণ প্রসঙ্গে আল বিদায়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানকারী সাহাবা কিরামের গায়ে রেশমী বস্ত্র দেখে তিনি তাঁদের প্রতি পাথর ছুঁড়তে উদ্যত হলেন। আর তাঁরা এই বলে কৈফিয়ত পেশ করলেন যে, অস্ত্র বহন ও রণাঙ্গনে বিচরণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন রয়েছে। তখন তিনি শান্ত হলেন। [৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬]

তারিক ইবন শিহাব বলেন, সিরিয়া সফরকালে হযরত উমর (রা) একটি অগভীর খাল পার হলেন মোজা খুলে উটসহ পানিতে নেমে। এতে আবূ উবায়দা (রা) অনুযোগের সুরে বললেন, স্থানীয় লোকদের সামনে আপনি আজ অবাক কাণ্ড করেছেন!

তখন উমর (রা) তাঁর বুক চাপড়ে বললেন, হায়, আবূ উবায়দা! অন্য কেউ যদি বলতো, তাহলে সান্ত্বনা খুঁজে পেতাম।

তোমরা না ছিলে হীনতম, তুচ্ছতম ও ক্ষুদ্রতম এক জাতি! এরপর কুরআনের মর্যাদায় আল্লাহ্ তোমাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং যতই তোমরা অন্য মর্যাদার প্রত্যাশী হবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় ততই অপদস্থ হবে।

[ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড. পৃষ্ঠা-৬০]

অনারব অঞ্চলের আরব প্রশাসকদের নামে তিনি এই উপদেশ-পত্র প্রেরণ করেছিলেন:

অনারব জীবনের ভোগ বিলাস ও বেশভূষা পরিহার করো এবং রোদ ভোগ করো। কেননা রোদ হলো আরবদের 'স্নান'। সুঠাম ও সবলদেহী হও এবং আহারেপোশাকে পূর্ণ কৃচ্ছ্রমুখী হও। কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়চেতা হও এবং সওয়ারি পশুগুলোর যত্ন নাও। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী হও এবং অবিচলভাবে অগ্রসর হও।

নীচের বক্তব্যেও তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কঠোর শাসননীতি ও নৈতিকতার প্রতি তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টির প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন,

'ইসলাম এখন পরিপক্কতা লাভ করেছে। সাবধান, কুরায়শ চায় আল্লাহ্র মাল ইবাদতরূপে নয়, সাহায্যরূপে গ্রহণ করতে। কিন্তু খাত্তাবের পুত্রের জীবদ্দশায় তা হবে না। আমি হাররা উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছি এবং কুরায়শের মাথা ও নিতম্ব ধরে রেখেছি যাতে তারা জাহান্নামে গিয়ে না পড়ে।

তাঁর সুগভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মানব স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে প্রখর জ্ঞানের আরেকটি প্রমাণ এই যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের এই বলে তিনি মদীনায়

ধরে রেখেছিলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে তোমাদের ছড়িয়ে পড়াই হলো উম্মাহর ব্যাপারে আমার বেশি আশংকার বিষয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন, এ বিষয়ে সামান্য শৈথিল্য বিজিত এলাকায় ফিতনার কারণ হতে পারে। কেননা স্থানীয় জনগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে জড়ো হবে এবং বিভিন্ন রকম সংশয় দানা বাঁধবে এবং 'বহু নেতৃত্বে, ফলে চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতা শুরু হবে।

শিয়াপন্থী বিশিষ্ট আইনবিশারদ ও ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক সাইয়েদ আমীর আলী ফারুকী খিলাফত সম্পর্কে অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলেছেন। দেখুন:

সংক্ষিপ্ত সিদ্দীকী খিলাফত মরুচারী বেদুঈন গোত্রে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই কেটে গিয়েছিলো। ইসলামী সালতানাতের নব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সুযোগ তাঁর ছিলো না।

কিন্তু উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) ছিলেন প্রকৃতই একজন মহান শাসক। খিলাফত লাভ করে বিজিত অঞ্চলের সুখ-শান্তি ও শাসন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার কাজে তিনি তাঁর বিপুল কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। আর এটাই ছিলো প্রাথমিক যুগের ইসলামী সালতানাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

[The Spirit of Islam, P. 278]

অন্যত্র তিনি বলেন, ইসলামের জন্য ফারুকী খিলাফত ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী। তাঁর নৈতিকতা এবং স্বভাব ও মনোভাব ছিলো সুদৃঢ়। ন্যায় নীতি ছিলো অতি কঠোর এবং অনুভূতি ছিলো প্রখর, যা জীবনের পরিপক্কতা ও কর্ম শক্তির বৈশিষ্ট্যে ছিলো ভাস্বর।

[A Short History of the Saracens, P. 27]

অন্যত্র লিখেছেন– তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও দূরদর্শী। আরব জাতির জীবন, চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিলো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি নৈরাজ্যপূর্ণ ও দুর্বিনীত জীবন যাপনে অভ্যস্ত একটি জাতিকে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। অপরাধ ও অপরাধী দমনের স্বভাব ক্ষমতাবলে তিনি যাযাবর গোত্রবর্গের স্বভাবপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন, যাদের অধিকাংশই ছিলো প্রায় 'বন্য জীবনে' অভ্যস্ত। পরবর্তীতে এই আরব বেদুঈনরা যখন উন্নত অনারব শহরে জনপদে বিলাস-প্রাচুর্যের বিচিত্র উপকরণ এবং আয়েশি ও জৌলুস জীবনের সাথে পরিচিত হল তখন খলীফা হযরত উমরের কঠোর শাসনই তাদেরকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছিলো।

সালতানাতের সাধারণতম মানুষটিরও নাগালের মধ্যে তিনি বাস করতেন এবং রক্ষী ও প্রহরী ছাড়া রাতের অন্ধকারে 'অনুসন্ধান সফরে' বের হতেন। এমনই এক সাধারণ ও অনন্যসাধারণ জীবন যাপন করেছেন তাঁর যুগের সর্বাধিক প্রতাপশালী শাসক ব্যক্তিটি। [A Short History of the Saracens. P. 34-44]

স্যার উইলিয়াম ম্যুর লিখেছেন, ইসলামী সালতানাতে নবীর পরে উমরই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সত্যনিষ্ঠারই ফলে খিলাফতের এই দশ বছরে সিরিয়া, মিসর ও পারস্যের সমগ্র অঞ্চল ইসলামের শাসনবলয়ে এসে গিয়েছিলো এবং এখনো ইসলামী অঞ্চলরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হয়েও প্রজ্ঞা ও প্রশান্তির এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যপ্রীতির আকাল হয়নি কখনো তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বে। আমীরুল মু'মিনীন– এই একটিমাত্র সাধারণ উপাধি ছাড়া বড় কোন খেতাব নিজের জন্য তিনি পছন্দ করেন নি, অথচ তিনি ছিলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা!

বিভিন্ন দূর প্রদেশ থেকে আগমনকারী প্রতিনিধি দল তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে জিজ্ঞাসা করতো, আমীরুল মু'মিনীন মসজিদে উপস্থিত আছেন কিনা, অথচ তিনি তখন মসজিদ চত্বরে কিংবা আশেপাশেই বসে আছেন অতি সাধারণ বেশে।

উমর (রা)-এর যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

তদানীন্তন পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা ও সমাজ সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কুক্ষিগতকারী দু'টি বিশ্ব শক্তির মুকাবিলায় যে অভাবনীয় বিজয় ফারুকী খিলাফত আমলে সম্পন্ন হয়েছিলো এবং প্রাচীন দেশ বিজেতাদের সামনে অপরাজেয়রূপে স্বীকৃত শহর ও জনপদগুলো একের পর এক যেভাবে খিলাফতে রাশেদার করতলগত হয়েছিলো এবং নতুন নতুন শহর ও সভ্যতা– কেন্দ্রের যেভাবে গোড়াপত্তন হয়েছিলো সেগুলোর, এমন কি অতি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পেশ করাও এখানে সম্ভব নয়। ইসলামের সাধারণ ইতিহাস কিংবা হযরত উমর (রা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিতই হলো তার উপযুক্ত ক্ষেত্র। [আল বিদায়া ৭ম খণ্ড, আলকামিল (ইব্নুল আছীরকৃত), ৩য় খণ্ড, ফুতূহুল বুলদান, আল ফারূক]

ফারূকে আযমের পাশে হযরত আলী (রা)

তবে হযরত উমর (রা) ও আলী (রা)-এর মাঝে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধার, তাকওয়া ও পুণ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতার যে সুমধুর সম্পর্ক ছিলো এবং খিলাফতের কাজে আন্তরিক পরামর্শ দানের যে আদর্শ হযরত আলী (রা) স্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে দু'একটি নমুনা এখানে আমরা অবশ্যই পেশ করবো।

হযরত নাফে আল-আব্সী (র) বলেন, একবার আমি হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে সাদাকার উট রাখার 'আস্তাবলে' প্রবেশ করলাম।

হযরত উসমান (রা) ছায়ায় বসে বিবরণ লিখে যাচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উমর (রা)-এর বক্তব্য তাঁকে বলে দিচ্ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর গায়ে ছিলো দু'টি কালো চাদর। একটি পরিধানে, অন্যটি মাথায় পেঁচানো। তিনি প্রচণ্ড রোদ ও গরমে দাঁড়িয়ে গণনা করছিলেন এবং রং ও দাঁতের বিবরণ লিখে যাচ্ছিলেন। এ পটভূমিতে আলী (রা) উসমান (রা)-কে বললেন, আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে !

يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الامين.

"হে পিতা, তাকে মজদুর রাখুন। কেননা সবল ও বিশ্বস্তই মজদুরির জন্য উত্তম।"

অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমাদের মাঝে ইনিই হলেন 'সবল ও বিশ্বস্ত'। [তারীখে কামিল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫–৫৬]

এই সুগভীর আন্তরিকতা ও হিতাকাঙ্ক্ষার কারণেই বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটকালে হযরত আলী (রা) তাঁকে সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। একবার তো হযরত উমর (রা) এমনও বলেছেন,

لو لا على لهلك عمر

"আলী না হলে উমর হালাক হয়ে যেতো।" [ইস্তিআব, পৃষ্ঠা ১৫–২০]

আর ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থের একটি স্বীকৃত প্রবাদ হলো,

قضية ولا ابا حسن لها (এমন সংকট, অথচ কোন আবুল হাসান নেই!) সর্বোপরি নবী ﷺ বলেছেন, اقضاهم على, বিচার জ্ঞানে আলী তাদের সর্বোত্তম।"

বায়তুল মাকদিস গমনকালে উমর (রা) তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। আর হযরত আলী (রা) কর্তৃক উমর (রা)-এর কাছে তাঁর কন্যা উম্মু কুলসুমকে বিবাহ দানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্পর্ক গড়ার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

উমর (রা)-এর প্রতি আলী (রা)-এর আন্তরিকতা এবং ইসলাম ও মুসলিম সংস্কারে আলী (রা)-এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে ভাগ্য-নির্ধারণী নেহাবন্দ যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা) দিক-নির্দেশনামূলক যে সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করেছিলেন, সেটাই হলো ইসলাম ও

মুসলিম উম্মাহর প্রতি ও খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা)-এর প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনুন

আঠারো কিংবা উনিশ হিজরীতে অনুষ্ঠিত নেহাবন্দ যুদ্ধ এ কারণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো যে, মুসলিম বাহিনী যখন পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আহওয়াজ শহর দখল করে নিলো তখন পারসিক বাহিনী 'আরব' -এ অবস্থানরত সম্রাট 'ইয়াজদাজারদ'-কে পরিস্থিতি জানিয়ে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালো, আর সম্রাটের ফরমান পেয়ে খোরাসান, হালওয়ান ও সিন্ধুর রাজন্যবর্গ সাজ সাজ রবে সাড়া দিলো। এভাবে নেহাবন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে দেড় লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী জড়ো হলো।

পারস্য সম্রাট সমগ্র জাতির অন্তরে ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতীয় চেতনা ও সুপ্রাচীন সাসানী সাম্রাজ্য রক্ষায় প্রাণ বিসর্জনের উদ্দীপনা জাগ্রত করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করলেন। তার সাথে ছিলো 'দুরকিশ কাবিয়ানী' নামক কারুকার্যপূর্ণ ও রত্নখচিত জাতীয় পতাকা। পারসিকদের চোখে যা ছিলো তাদের জাতীয় সৌভাগ্যের প্রতীক। উপাস্য অগ্নিকুণ্ডও ছিলো পতাকার সঙ্গে। হরমুজ-পুত্র মরদান শাহকে বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে সম্রাট তাকে অবিলম্বে নেহাবন্দ অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিলেন।

ওদিকে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) প্রথমে পত্র-যোগে এবং পরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে হযরত উমর (রা)-কে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললেন, কুফাবাসী অগ্রাভিযানের জন্য আপনার অনুমতিপ্রার্থী যাতে প্রথম আঘাতের সুযোগে শত্রুশিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করা যায়।

হযরত উমর (রা) মজলিশ ডেকে বিশিষ্ট সাহাবা-কিরামের পরামর্শ চাইলেন এবং স্বাগত বক্তব্য রেখে বললেন, এ যুদ্ধের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। তাই আমার পরিকল্পনা এই যে, যতটা সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করে পশ্চাদ্‌শক্তিরূপে আমি শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করি। তারপর অগ্রাভিযানের নির্দেশ প্রদান করি যেন আল্লাহ্ প্রত্যাশিত বিজয় দান করেন।

হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ (রা) বললেন, সিদ্ধান্তের পূর্ণ এখতিয়ার আপনার। সুতরাং আপনি আদেশ করুন, আমরা পালন করবো এবং আহ্বান করুন আমরা লাব্বাইক বলবো।

হযরত উমর (রা) আরো মতামত চাইলেন। তখন উসমান (রা) অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মতামত এই যে, সিরিয়াবাসীদের

নিকট পত্র প্রেরণ করুন যেন তারা সিরিয়া থেকে অভিযান বের করে। তদ্রূপ ইয়ামানবাসীর নিকট পত্র প্রেরণ করুন যেন তারা ইয়ামান থেকে অভিযান বের করে। অতঃপর আপনি হারামাইনবাসীদের নিয়ে অভিযানে বের হোন, এভাবে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী নিয়ে সমন্বিত মুশরিক বাহিনীর মুকাবিলা করুন।

হযরত উমর (রা) আরো পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত আলী (রা) উভয়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে হযরত উমর (রা)-কে যুদ্ধের দায়িত্ব কোন স্থলবর্তীর হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে মদীনায় অবস্থান করার পরামর্শ দিলেন এবং বসরাবাসীদের নামে পত্র প্রেরণপূর্বক মুসলিম বাহিনীকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তদুপরি প্রশাসকগণকে নিজ নিজ প্রদেশে বহাল রাখার পরামর্শ দিয়ে তিনি এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনের কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অটুট শক্তি এমনভাবে বিধ্বস্ত হবে যে, তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে না। অতঃপর তার কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে না এবং পুনঃঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায়ও থাকবে না।

হযরত উমর (রা) বললেন, এটাই সঠিক মত। অতঃপর তিনি এ মত গ্রহণ করে বললেন, অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন কারো নাম বলুন। তবে তিনি ইরাকের অধিবাসী হলে ভালো হয়। তাঁরা বললেন, আপনার বাহিনী সম্পর্কে আপনিই ভালো জানেন। তিনি নোমান ইব্‌নুল মুকরন আল মুযানীকে নির্বাচিত করলেন। তখন সকলে সায় দিয়ে বললেন, ইনি এ দায়িত্বের উপযুক্ত।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের বক্তৃতা ও পত্র সংকলন 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থে তাঁর উপরোক্ত পরামর্শমূলক বক্তব্য ও মতামত সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে,

হযরত উমর (রা) যখন পারসিকদের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর নিকট পরামর্শ চাইলেন তখন হযরত আলী (রা) বললেন,

ইসলামের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতা দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র দীন, যাকে আল্লাহ্ বিজয়ী করেছেন। আর মুজাহিদগণ হলেন আল্লাহ্‌র সৈনিক, যাদেরকে আল্লাহ্ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং সাহায্য করেছেন। ফলে তারা এত দূর-দূরান্তে পৌঁছেছে এবং এত দিগ-দিগন্তে তাদের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত আর আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং তাঁর সৈনিকদের অবশ্যই সাহায্য করবেন।

শাসক ও তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা হলো মুক্তার মালায় সুতার মতো যা সকল মুক্তাকে একত্রে গেঁথে রাখে কিন্তু সেই সুতা একবার ছিঁড়ে গেলে সকল মুক্তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। আর কখনো তা একত্র হতে পারে না।

আরবরা আজ সংখ্যা অল্প হলেও ইসলামের কল্যাণে তারা বহু গুণ বেশি ঐক্যের বলে বলীয়ান। সুতরাং আপনি মেরুকেন্দ্রের ভূমিকা পালন করুন এবং আরবদের মাঝে যুদ্ধের চাকা ঘোরান এবং নিজে দূরে থেকে তাদেরকে যুদ্ধের আগুনে উত্তপ্ত করুন। কেননা আপনি কেন্দ্রভূমি থেকে দূরে গেলে চারদিক থেকে আরবরা আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। ফলে সম্মুখবর্তী শত্রু শিবিরের চেয়ে পশ্চাতে ছেড়ে আসা অরক্ষিত এলাকাই আপনার জন্য অধিক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আগামীকাল অনারবরা আপনাকে দেখলে বলে উঠবে, ইনি হলেন আরবদের মূল শিকড়। তাঁকে উপড়ে ফেলতে পারলেই তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ফলে আপনার প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে এবং সর্বশক্তি নিয়ে আপনার ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাদের বিশাল অভিযানের যে কথা আপনি বলেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, তাদের অভিযান আপনার চেয়েও আল্লাহ্‌র বেশি অপছন্দনীয়। আর আল্লাহ্ তাঁর অপছন্দের বিষয় পরিবর্তনে অধিক সক্ষম। আর তাদের সংখ্যাধিক্যের যে কথা আপনি বলেছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, অতীতে আমরা সংখ্যাধিক্যের বলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি, বরং আল্লাহ্‌র মদদ ও সাহায্যের বলে লড়াই করেছি।

[নাহজুল বালাগা, পৃষ্ঠা ২০৩-৩৪]

একই ঘটনা ঘটেছিলো ইয়ারমুক যুদ্ধের পূর্বে যখন হযরত উমর (রা) স্বয়ং রোম অভিযানে গমনের বিষয়ে হযরত আলী (রা)-এর পরামর্শ চেয়েছিলেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধ ছিলো সিরিয়ার বৃহত্তম যুদ্ধ, যার ওপর সিরিয়ার বিজয়াভিযানে মুসলিম বাহিনীর ভাগ্য নির্ভর করছিলো। সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হযরত আবূ ওবায়দা (রা) দূত প্রেরণ করে হযরত উমর (রা)-কে অবহিত করলেন যে, জল ও স্থল– উভয় পথে রোমক বাহিনী বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো এগিয়ে আসছে। তখন হযরত উমর (রা) মুহাজির ও আনসারদের জমায়েত করে হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-এর পত্র পড়ে শোনালেন। পত্রের মর্ম অবগত হয়ে সাহাবা কিরামের পক্ষে আত্মসংবরণ করা

সম্ভব হলো না। ভাবাতিশয্যে তাঁরা কেঁদে ফেললেন এবং আবেগোদ্দীপ্ত ভাষায় আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমীরুল মু'মিনীনকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, তিনি আমাদেরকে সিরিয়া অভিমুখে অভিযানের অনুমতি প্রদান করুন। আমরা সিরিয়ায় জিহাদরত আমাদের ভাইদের জন্য রক্তের শেষ বিন্দুটুকু উৎসর্গ করতে চাই। এভাবে আনসার মুহাজিরদের জোশউদ্দীপনা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। অবশেষে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) প্রস্তাব করলেন, আমীরুল মু'মিনীন স্বয়ং যেন সিরিয়ার মুজাহিদীনদের সমর্থনে সাহায্যকারী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আপন উপস্থিতি দ্বারা তাদের মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধি করেন।

কিন্তু হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, এই দীনের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ কেন্দ্রের সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ করেছেন। আর যে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন কঠিন সময়েও সাহায্য করেছেন যখন তারা ছিলো অতি অল্প এবং বিজয় ছিলো অকল্পনীয়, তাদেরকে সুরক্ষিত করেছেন যখন তারা ছিলো নগণ্য এবং তাদের সুরক্ষা ছিলো অসম্ভব। সেই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।

আপনি যখন এই শত্রুবাহিনীর মুকাবিলায় উপস্থিত হবেন তখন অতি বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হবে। মুসলমানদের ভূখণ্ডের শেষ সীমানায় গিয়ে তাদের আশ্রয় কেন্দ্র হওয়া আপনার উচিত নয়। কেননা আপনার পরে তাদের আশ্রয় গ্রহণের আর কোন স্থান থাকবে না। সুতরাং সিরিয়া অভিমুখে একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কে প্রেরণ করুন এবং তাঁর সাথে নিবেদিতপ্রাণ ও পরীক্ষিত যোদ্ধাদের প্রেরণ করুন। অতঃপর আল্লাহ্ যদি বিজয় দান করেন তাহলে তো আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো! আর অন্য কিছু হলে আপনি তখন হবেন মুসলমানদের আশ্রয় ও অবলম্বন। [নাহজুল বালাগা, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩]

বলা বাহুল্য, হযরত আলী (রা) যদি হযরত উমর (রা)-এর প্রতি অহিতাকাঙ্ক্ষী হতেন কিংবা বিদ্বেষ পোষণ করতেন, খিলাফত জবরদখলকারী ভেবে তাঁকে বিপদে ফেলার আকাঙ্ক্ষী হতেন, তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন যাতে তাঁর পথ নিষ্কণ্টক হয়ে যায় এবং তাঁর অনুকূলে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন হতে পারে, তাহলে তো কোন রকম দায়-দায়িত্ব ছাড়াই তাঁর হাত থেকে রেহাই লাভের এটা ছিলো অতি মোক্ষম সুযোগ। কেননা যুদ্ধে হযরত উমর (রা)-এর কোন দুর্ঘটনা হতে পারতো কিংবা আলী (রা) তাঁকে গুপ্তহত্যা করার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু এ সকল

নীচতার বহু উর্ধ্বে থেকে মুসলমানদের প্রতি ও খলীফাতুল মুসলিমীনের প্রতি তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর এ পরামর্শ ছিলো এমন সুচিন্তিত, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও নিঃস্বার্থ যা এমন ব্যক্তির পক্ষ হতেই সম্ভব যার অন্তর স্বচ্ছ ও পবিত্র, চিন্তা-ভাবনা হলো সুমহান এবং দৃষ্টি হলো সুদূর- প্রসারী। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে আল্লাহ্ তাঁকে ঐ সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন যা তিনি আপন প্রিয় ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের দান করে থাকেন। সোনার খনিতে সোনা হলে তাতে আশ্চর্য কী! এ আরবী প্রবাদ তাঁর জীবনে ছিলো ধ্রুব সত্য।

পক্ষান্তরে খ্রীস্টান শক্তি যখন আবেদন জানাল যে, হযরত উমর (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে সন্ধিপত্র লিখে দিন। তারা তাঁর হাতেই পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের চাবি অর্পণ করবে। এদিকে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হযরত আবূ ওবায়দা (রা) পত্রযোগে আমীরুল মু'মিনীনকে জানালেন যে, তাঁর শুভাগমনের ওপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় নির্ভর করছে। তখন তিনি এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য বিশিষ্ট সাহাবা-কিরামকে একত্র করলেন।

হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর পরামর্শ ছিলো এই যে, (পরাজিত শত্রুর দাবি মেনে) আমীরুল মু'মিনীনের সেখানে গমন করা উচিত হবে না, যাতে তারা অধিক অপদস্থ এবং অধিক শায়েস্তা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু হযরত আলী (রা) বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কেননা এটা ইতিহাসের এমন এক অমর মর্যাদা যা সব সময় সবার ভাগ্যে জোটেনি। তদুপরি এতে মুসলিম বাহিনীও স্বস্তি লাভ করবে।

উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ১৬ হিজরীর রজব মাসে হযরত আলী (রা)-কে খিলাফতের যাবতীয় বিষয়ে স্থলবর্তী করে তিনি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

[তারীখে কামিল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪০২]

হযরত উমর (রা)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস সফর

সম্ভবত প্রিয় পাঠক জানতে একান্ত উদ্গ্রীব যে, রোম ও পারস্যের সম্রাট যাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত সেই আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) কিভাবে কোন্ সাজে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেছিলেন, পরিবেশ-পরিস্থিতি তো রাজকীয় জাঁকজমক ও জৌলুস দাবি করছিলো, যাতে বিজিত জাতির হৃদয় খলীফাতুল মুসলিমীনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধার পূর্ণ অনুভূতিতে আলোড়িত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু পাঠকবর্গ, আলোচ্য সফরের আসল চিত্র প্রত্যক্ষ করুন।

মেটে রংগের এক উটে চড়ে তিনি জাবিয়া এসে পৌঁছলেন। টুপি ও পাগড়ীবিহীন তাঁর খোলা মাথা রোদে ঝলসে যাচ্ছিলো। পা-দানি ছাড়া বাহনের দু'পাশে ছিলো দু'পা। এক পশমী চাদর ছিলো যা আরোহণের গদিরূপে এবং বিশ্রামের সময় বিছানারূপে ব্যবহৃত হতো। খেজুর ছোবড়াপূর্ণ একটি থলে ছিলো তোশাদান। সফরের এই তোশাদানই ছিলো তাঁর বিশ্রামকালের বালিশ। গায়ে ছিলো খসখসে কাপড়ের জামা যার এক পার্শ্ব ছিলো ছেঁড়া।

তিনি বললেন, এখানকার নেতাকে আমার কথা বলে ডেকে আনো।

তখন জুলুমুসকে ডেকে আনা হলো। হযরত উমর (রা) বললেন, আমার জামাটা সেলাই করে ধুয়ে দাও। আর তোমাদের একটা জামা বা কাপড় আমাকে ধার দাও। তারা কাতানের জামা হাযির করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি কাপড়? তারা বললো, এটা কাতান। তিনি কাতানের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা কাতানের পরিচয় বললো, তখন তিনি গায়ের জামা খুলে দিলেন এবং তা ধুয়ে রিপু করে তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তখন তিনি তাদের দেয়া জামা খুলে দিলেন এবং নিজের জামা পরিধান করলেন।

জুলুমুস তখন তাকে বললেন, আপনি আরবের বাদশাহ। আর এ ভূখণ্ড উটের উপযোগী নয়। সুতরাং আপনি যদি এ ছাড়া অন্য কোন পোশাক গ্রহণ করতেন এবং তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করতেন তাহলে রোমকদের চোখে তা অধিক সম্ভ্রমের বিষয় হতো। তিনি বললেন, আমরা এমন কাওম যাদেরকে আল্লাহ্ ইসলাম দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আমরা চাই না।

অতঃপর তাঁর খিদমতে তুর্কী ঘোড়া পেশ করা হলো। আর তিনি জ্বিন ও গদি ছাড়া শুধু নিজের একটা চাদর ঘোড়ার পিঠে ফেলে তার ওপর চড়ে বসলেন, (ঘোড়া গর্বিত চালে চলতে শুরু করলো)। আর তিনি বলে উঠলেন, ধরো, ধরো, মানুষ শয়তানের পিঠে সওয়ার হয় এর আগে আমি তো দেখিনি! তখন তাঁর উট আনা হলো এবং তাতে তিনি স্বস্তির সঙ্গে আরোহণ করলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০]

১৮ হিজরীতে হযরত উমর (রা)-এর দ্বিতীয় দফা সিরিয়া সফরের সংক্ষিপ্ত চিত্র অবলোকন করুন। আল্লামা তাবারী বর্ণনা করেছেন :

হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে একদল সাহাবা-কিরামসহ রওয়ানা হলেন এবং লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে

আয়লার পথ ধরে কিছু দূরে গেলেন। গোলাম তাঁকে অনুসরণ করলো। তিনি বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন এবং ফিরে এসে গোলামের উটে আরোহণ করলেন। সে বাহনের পিঠে লোমের উল্টানো চাদর ছিলো। গোলামকে তিনি নিজের বাহন এগিয়ে দিলেন।

স্বাগত জানানোর জন্য আগত লোকদের অগ্রগামী অংশের সাথে দেখা হলে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আমীরুল মু'মিনীন কোথায়? তিনি (নিজেকে বুঝিয়ে) বললেন, তোমাদের সামনে। তখন তারা ভুল বুঝে তাঁকে অতিক্রম করে আরো সামনে চলে গেলো। এদিকে তিনি নিজে আয়লাতে গিয়ে অবতরণ করলেন। আর সাক্ষাতকারীদেরকে বলা হলো, আমীরুল মু'মিনীন তো আয়ালাতে পৌঁছে গেছেন! তখন তারা তাঁর নিকট ফিরে এলো।

[আত-তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৪]

নবী-পরিবারের প্রতি হযরত উমর (রা)-এর আচরণ ও মনোভাব

প্রবল প্রতাপশালী শাসকরূপে মানুষের মাঝে ইনসাফপূর্ণ শাসন পরিচালনা ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনে তাঁর সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা ও আত্মনিয়োগ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনকে তিনি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা করতেন, এমন কি আপন পরিবার ও সন্তানদের মুকাবিলায়ও তাঁদেরকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। নমুনাস্বরূপ দু'একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করছি :

হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেন, উমর (রা) একদিন আমাকে বললেন, হে বৎস! যদি আমাদের এখানে বেড়াতে আসতে তাহলে ভালো হতো। তাই একদিন আমি গেলাম। তিনি তখন মুআবিয়া (রা)-এর সঙ্গে একান্তে ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর ভেতরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। এ অবস্থায় আমি ফিরে চলে এলাম। পরে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! তোমাকে যে আমাদের ওখানে যেতে দেখলাম না। আমি বললাম, গিয়েছিলোম। আপনি তখন মুআবিয়া (রা)-এর সঙ্গে একান্তে ছিলেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা)-কে ফিরে যেত দেখে আমিও ফিরে গিয়েছিলোম।

হযরত উমর (রা) বললেন, তুমি তো উমরের পুত্র আবদুল্লাহর চেয়ে অনুমতি লাভের অধিক হকদার! আমাদের মাথায় যে গুরু দায়িত্ব চেপেছো, তা তো দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু আল্লাহ্! তাই বলে তোমাদের ব্যাপারেও। অতঃপর তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলালেন।

হযরত জাফর সাদিক (রা)-এর সূত্রে ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর খিদমতে ইয়ামান থেকে কিছু পোশাক এলো। তিনি লোকদের মাঝে তা বণ্টন করে দিলেন। মানুষ সেই পোশাক পরে চলাফেরা করতে লাগলো। উমর (রা) কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বসা ছিলেন। লোকেরা তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে সালাম পেশ করতে লাগলো এবং তাঁকে দু'আ দিতে লাগলো। এমন সময় হাসান ও হুসায়ন (রা) তাঁদের আম্মা হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘর থেকে বের হলেন এবং লোকজনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁদের গায়ে ইতিপূর্বে বণ্টিত কোন পোশাক ছিলো না।

উমর (রা)-এর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদেরকে পোশাক দান করে আমার মন খুশি হয়নি। সকলে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপন প্রজাবর্গকে পোশাক দান করে আপনি উত্তম অনুগ্রহ করেছেন (তবে কিসে আপনার অসন্তোষ?) তিনি বললেন, (আমার অশান্তি হলো) এ দুই বালকের কারণে , যারা লোকজনের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে, অথচ তাদের গায়ে (বণ্টনকৃত) কোন পোশাক নেই। কেনা পোশাকগুলো তাদের চেয়ে বড় আর তারা পোশাকগুলোর চেয়ে ছোট ছিলো। অতঃপর তিনি ইয়ামানে খবর পাঠালেন যে, অবিলম্বে হাসান ও হুসায়নের জন্য দুই জোড়া পোশাক প্রেরণ করো। আদেশমতো পোশাক প্রেরণ করা হলো। আর তিনি উভয়কে পোশাক পরিয়ে দিলেন।

হযরত আবূ জাফর (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত উমর (রা)-কে বিভিন্ন বিজয় (ও বিজয়লব্ধ সম্পদ) দান করলেন তখন তিনি নবী ﷺ -এর সাহাবাগণের এক জামাতকে জমায়েত করলেন। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বললেন, (অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে) আপনাকে দিয়ে শুরু করুন। তিনি বললেন, না, আল্লাহর শপথ, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটতমকে দিয়ে ও তার খান্দান বনী হাশেমকে দিয়ে শুরু করবো। অতঃপর তিনি যথাক্রমে আব্বাস ও আলী (রা)-এর জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন। এভাবে পাঁচটি গোত্র হয়ে বনী আদী ইব্‌ন কা'ব পর্যন্ত উপনীত হলেন। প্রথমে বনী হাশিমের বদরী সাহাবীগণের জন্য, অতঃপর বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শামসের বদরী সাহাবীগণের জন্য, অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতরদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর জন্যও ভাতা নির্ধারণ করলেন।

ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) ও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন দিওয়ান (ভাতাপ্রাপ্তদের তালিকা) তৈরি করলেন তখন নবী ﷺ-এর নৈকট্যের কারণে হাসান-হুসায়ন উভয়কে বদরী সাহাবীগণের সঙ্গে তাঁদের পিতার সমপরিমাণ ভাতা প্রদান করলেন এবং উভয়ের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম করে নির্ধারণ করলেন।

আল ফারূক গ্রন্থে 'আহলে বায়তের হক ও আদব রক্ষা' শিরোনামে আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন,

উমর (রা) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা)-ও পূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতা সহকারে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরামর্শ দিতেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের সময় হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-কে মদীনায় খিলাফতের যাবতীয় বিষয়ে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। তবে উভয়ের মাঝে প্রীতির ও সম্প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। হযরত আলী (রা) যখন হযরত উমর (রা)-এর সাথে তাঁর ও ফাতিমার কন্যা সৈয়দা উম্মে কুলসুম (রা)-কে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর তিন পুত্রের নাম উমর, আবূ বকর ও উসমান রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, মানুষ তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তির নামেই আপন পুত্রের নাম রেখে থাকে যাকে সে পূর্ণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব মনে করে।

হিজরী বর্ষ গণনার সূচনা

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব যতদিন পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান থাকবে ততদিন হযরত আলী (রা)-এর একটি কীর্তি ও স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে। হযরত উমর (রা)-এর যামানায় দিন, তারিখ ও বর্ষ গণনার বিষয়ে মানুষের মাঝে মতভেদ দেখা দিলো। একদল পারসিকের রাজপরিবারকেন্দ্রিক বর্ষ গণনার অনুরূপ কিম্বা রোমকদের বর্ষ গণনার অনুরূপ বর্ষ গণনা শুরু করতে চাইলো। অন্য দল বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম লাভ বা নবুয়ত প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে বর্ষ গণনা শুরু করো। কিন্তু আলী (রা) পরামর্শ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ষ গণনা করা হোক।

হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবা-কিরাম এ মতামত পছন্দ করলেন এবং হিজরতের ঘটনা থেকে বর্ষ গণনার আদেশ জারি করলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫]

এভাবে ইসলামী বর্ষপঞ্জীকে কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিবর্তে হোক না তা স্বয়ং নবী ﷺ-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব যা আল্লাহ্ ও আল্লাহর বান্দাদের নিকট মানব সমাজের মাঝে প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব এবং যুদ্ধ ও বিজয়ের কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার পরিবর্তে এমন একটি বড় ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যার রয়েছে নিজস্ব ভাব ও মর্মবাণী এবং নিজস্ব চেতনা ও দিকনির্দেশনা।

বস্তুত হিজরতের সঙ্গে ইসলামী বর্ষপঞ্জীর সংযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব ও মর্ম এই যে, এর ফলে ইসলামী বর্ষপঞ্জী দাওয়াত ও রিসালাতের এক সুস্পষ্ট ও স্থায়ী ছাপ গ্রহণ করেছে। ফলে মুসলমানদের নিকট ও সকল চিন্তাশীল মানুষের নিকট এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ঈমান, আকীদা ও বিশ্বাসই হলো ইজ্জত ও মর্যাদার উৎস তথা উন্নতি ও অগ্রগতির সূচক। স্বদেশের ও স্বজনদের সকল প্রীতি বন্ধন ও অভ্যস্ত জীবনের সকল আকর্ষণ হতে ঈমান ও আকীদার দাবি অনেক বড়। তাছাড়া তাতে গোটা বিশ্ব মানবতার জন্য নিহিত ছিলো একটি শুভ ইঙ্গিত। কেননা হিজরতের মহান ঘটনা ছিলো মানব জাতির ইতিহাসে ও মানব সভ্যতার যাত্রাপথে এক নবযুগের সূচনা। বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার এবং বিপদসংকুল ও সংগ্রামমুখর জীবনে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করার অনুপ্রেরণা লাভের এক অফুরন্ত উৎস।

হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাত

হযরত উমর (রা) যুবক ও তরুণ বয়সের কোন যিম্মীকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। কিন্তু হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) কুফায় অবস্থানকালে একবার ফিরোয ওরফে আবূ লুলু নামক এক তরুণ গোলামের ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পারস্যের অগ্নিপূজক কিংবা খ্রীস্টান এই দাস যুবক ছিলো নেহাবন্দের বাসিন্দা এক দক্ষ কারিগর। প্রথমে সে রোমকদের হাতে বন্দী হয়েছিলো, পরবর্তীতে মুসলমানরা তাকে রোমকদের হাত থেকে নিয়ে নেয়। ২১ হিজরীতে নেহাবন্দের বন্দীরা যখন মদীনায় আগমন করেছিলো তখন আবূ লুলু বন্দীদলের কোন ছোট শিশুকে দেখতে পেলেই তার মাথায় হাত বুলিয়ে কেঁদে ফেলতো এবং তাকে লক্ষ্য করে বলতো, উমর আমার কলজে জ্বালিয়ে ফেলেছে।

সে একাধারে কামার, ছুতার ও কারুকার ছিলো। তদুপরি অতি উত্তম যাঁতা প্রস্তুত করতে পারতো। তাই হযরত মুগীরা (রা) তার থেকে প্রতিদিন চার দিরহাম হিসেবে গ্রহণ করতেন।

একদিন সে হযরত উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো, মুগীরা আমার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছেন। আমার পক্ষ হয়ে আপনি তাকে বলুন, তিনি যেন আমার ভার কিছুটা লাঘব করে দেন। হযরত উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কি কাজ তুমি ভালো পারো? সে কাজের ফিরিস্তি দিলো, তখন হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, তোমার 'করের' পরিমাণ বেশি নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং মনিবের প্রতি সদাচরণ করে যাও। কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর মনে মনে ইচ্ছা ছিলো যে, মুগীরার সঙ্গে দেখা করে তাকে তিনি করের পরিমাণ লাঘব করার কথা বলবেন।

দাস আবূ লুলু তখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলো এবং দুই মাথাওয়ালা এক খঞ্জর তৈরি করে তাতে বিষ মাখালো। অতঃপর পারসিক যুগের বহু পুরনো নেতা হরমুযানকে তা দেখিয়ে বললো, এটা কেমন মনে হয় আপনার? সে বললো, আমার তো মনে হয় এটা দ্বারা কাউকে তুমি আঘাত করা মাত্র তার মৃত্যু অবধারিত। মোটকথা, এটা ছিলো অগ্নিপূজকদের একটা ষড়যন্ত্র যাতে ব্যক্তি ক্রোধ এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক জিঘাংসা কার্যকর ছিলো।

উমর (রা)-এর শহীদ হওয়ার দিন সকালে হযরত আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) বলেছেন, গতকাল সন্ধ্যায় হরমুযান, আবূ লুলু ও জাফীনাকে গোপন আলাপরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। তারা যখন সটকে পড়লো তখন তাদের হাত থেকে ঐ খঞ্জরটি পড়ে গিয়েছিলো যা দ্বারা উমর (রা)-কে আঘাত করা হয়েছে।

এ কারণেই বহু গবেষক এই মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, উমর (রা)-এর হত্যা একটি পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই ফল ছিলো, যাতে অনারব ও ইহুদীদের সম্মিলিত হাত ছিলো। অবশ্য বিজিত জাতিবর্গের পক্ষ হতে এ ধরনের সন্ত্রাসী পদক্ষেপ অস্বাভাবিক নয়। কেননা যারা স্বাধীনতা হারিয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ লাভের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সুযোগ-সুবিধা মতো তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেই পারে। ঘটনার দিন হযরত উমর (রা) ফজরের নামায পড়াতে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাকবীর বলা মাত্র মানুষ শুনতে পেল তিনি চিৎকার করে বলছেন, আমাকে মেরে ফেলা হয়েছে অথবা কুকুর আমাকে কামড় বসিয়েছে। আবূ লুলু সে সময় তাঁকে কাঁধে ও পিঠে (এক বর্ণনা মতে) ছয়টি আঘাত করেছিলো। অতঃপর ঘাতক দু'ধারী ছুরি হাতে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগলো এবং ডানে বামে যাকে পেলো তাকেই আঘাত করলো। এভাবে মোট তেরজনকে জখম করে ফেললো।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) এ অবস্থা দেখে তাকে কাবু করার জন্য তার ওপর নিজের চাদর ছুঁড়ে ফেললো। ঘাতক যখন দেখলো যে, সে ফাঁদে পড়ে গেছে, নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলো। এদিকে হযরত উমর (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে লুটিয়ে পড়লেন : وكان امر الله قدراً مقدوراً "আল্লাহ্‌র ফায়সালা অটল।" [ইব্‌ন সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩]

পরে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কে তাকে ছুরিকাঘাত করেছে? যখন তাঁকে মুগীরা (রা)-এর গোলামের কথা বলা হলো তখন তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্, আমার ঘাতক এমন কেউ নয়, কখনো কোন সিজদা করেছে, যা দ্বারা সে আল্লাহ্‌র নিকট আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কোন আরব আমাকে হত্যা করবে এমন হতে পারে না। [উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭]

পুত্র আবদুল্লাহকে তিনি বললেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বলো, উমর আপনাকে সালাম বলেছেন। আমীরুল মু'মিনীন বলো না। কেননা আমি আজ মু'মিনদের আমীর নই। তাঁকে গিয়ে বলো, উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ গিয়ে সালাম করলেন এবং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, হযরত আয়েশা (রা) বসে বসে কাঁদছেন। তখন তিনি সালাম পেশ করে বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপন সঙ্গীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এটা তো আমি নিজের জন্য আশা করছিলাম। তবে আজ আমি তাঁকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দেব।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ফিরে গেলে উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর এনেছো? তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করছেন, তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন। উমর (রা) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ্, আমার কাছে ঐ শয়নস্থলটুকুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই ছিলো না। তবে দেখো, আমার মৃত্যুর পর খাটিয়ায় বহন করে আমাকে নিয়ে যাবে। অতঃপর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, উমর ইবনুল খাত্তাব অনুমতি প্রার্থনা করছে, যদি তিনি অনুমতি দেন তবেই শুধু আমাকে প্রবেশ করাবে। আর যদি ফিরিয়ে দেন তবে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে আমাকে নিয়ে যাবে। কেননা আমার আশংকা এই যে, হয়তো বা শাসকের প্রতি সমীহ তাঁর অনুমতি প্রদানের কারণ হতে পারে।

যখন তাঁকে খাটিয়ায় তোলা হলো তখন মনে হচ্ছিলো যে, সেদিন ছাড়া আর কখনো মুসলমানদের ওপর কোন মুসীবত নাযিল হয়নি। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে পুনঃঅনুমতি প্রদান করলেন। ফলে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হলো এবং আল্লাহ্ তাঁকে নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর সান্নিধ্যে বিশ্রাম লাভের মহাসৌভাগ্য দান করলেন। [ইব্ন সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪]

বিদগ্ধ লেখক সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'আরব জাতির ইতিহাস' নামক গ্রন্থে হযরত উমর (রা)-এর মৃত্যুর ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন,

ইসলামের জন্য হযরত উমর (রা)-এর মৃত্যু ছিলো এক বিরাট শোকাবহ ঘটনা ও অপূরণীয় ক্ষতি। [A Short History of the Saracens, P-43- 44]

২৩ হিজরীর ২৯ যিলহজ্জ তেষট্টি বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ওপর হামলা হয়েছিলো ২৬ যিলহজ্জ তারিখে অর্থাৎ ঘটনার তিন দিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন এবং ২৪ হিজরীর ১ মুহররম রোজ শনিবার তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

হযরত আলী (রা)-এর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

হযরত আবূ জুহায়ফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রা)-এর জানাযার নিকট ছিলাম। জানাযা চাদরে আচ্ছাদিত ছিলো। এমন সময় হযরত আলী (রা) উপস্থিত হলেন এবং মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরিয়ে এক নজর দেখে বললেন,

"হে আবূ হাফস! আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যার আমলনামা নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হওয়া আমার নিকট অধিকতর প্রিয় হতে পারে।"

[মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে আলী ইব্ন আবূ তালিব]

হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাত বরণ করার সময় হযরত আলী (রা) অস্বাভাবিকভাবে কেঁদেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, উমরের মৃত্যুতেই আমি কাঁদছি। কেননা তাঁর মৃত্যু ইসলামের প্রাসাদে এমন এক ফাটল সৃষ্টি করেছে যা কিয়ামত পর্যন্ত আর মেরামত করা যাবে না।

[আল-ফুতূহাতুল ইসলামিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৯]

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

উসমান (রা)-এর বাই'আত, উসমান (রা)-এর ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা বিজয়াভিযান এবং ইসলামী সালতানাতের বিস্তার, উসমান (রা)-এর অমর কীর্তি, খিলাফত পরিচালনায় হযরত উসমান (রা)-এর অগ্নি পরীক্ষা, ফিতনা যখন চরমে পৌঁছলো– আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা)-এর অবরোধ ও শাহাদাত, খলীফাকে রক্ষার জন্য হযরত আলী (রা)-এর অবিস্মরণীয় ভূমিকা। হযরত উসমান (রা)-এর জীবনে আকীদা ও বিশ্বাসের গভীরতা এবং ইসলামে তার অতুচ্চ মর্যাদা।

পঞ্চম অধ্যায়

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী (রা)

উসমান (রা)-এর বায়'আত

গুপ্তঘাতকের হাতে গুরুতর জখম হওয়ার পর উমর (রা) যখম মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের বিষয়টি তিনি ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর পরামর্শের ওপর ছেড়ে দিলেন। তাঁরা হলেন উসমান ইব্‌ন আফফান, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, তালহা ইব্‌ন ওবায়দুল্লাহ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)।

ছয়জনের কোন একজনকে সুনির্দিষ্টভাবে মনোনীত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হযরত উমর (রা) বললেন, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আমি এ দায়িত্বভার বহন করতে রাজী নই। আল্লাহ্ যদি তোমাদের কল্যাণ চান তবে এঁদের সর্বোত্তম জনের পাশে তোমাদেরকে একত্র করবেন, যেমন তোমাদের নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পর তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পাশে তোমাদেরকে একত্র করেছিলেন।

তাঁর পূর্ণ তাকওয়া ও সতর্কতার অবস্থা এই ছিলো যে, হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)-কে তিনি মজলিসে শুরার নামভুক্ত করেন নি। কেননা তিনি ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। ফলে তাঁর আশংকা হয়ে ছিলো যে, নিকট সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করে হয়তো তাঁকেই খিলাফতের দায়িত্বভার প্রদান করা হতে পারে। তাই শুরা থেকেই তাঁকে বাদ দিয়েছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবার অন্যতম। শুরা সদস্যদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের পরামর্শ সভায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর উপস্থিত থাকবে। কিন্তু খিলাফতের কোন দায়িত্ব তার হাতে যাবে না।

শুরার সিদ্ধান্ত হওয়া পর্যন্ত তিনদিন হযরত সুহায়ব ইব্‌ন সিনান রোমীকে তিনি সালাত আদায়ের অসিয়ত করলেন এবং মজলিসে শুরাকে লোকদের সঙ্গে পরামর্শপূর্বক ছয়জনের ঐকমত্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসিয়ত করলেন। সেই সঙ্গে তিনি এও বললেন, আমি মনে করি না, মানুষ উসমান ও আলী (রা)-এর সমতুল্য কাউকে মনে করবে।

হযরত উমর (রা)-এর কাফন-দাফন হতে যখন অবসর পাওয়া গেলো তখন হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) তাঁদেরকে এক ঘরে একত্র করলেন। কিন্তু সেখানে অনেক কথা হলো এবং শোরগোল উঠলো। অতঃপর পরিস্থিতি এই পর্যায়ে উপনীত হলো যে, তাঁদের তিনজন নিজেদের অধিকার অপর তিনজনের অনুকূলে সোপর্দ করলেন। হযরত যুবায়র (রা) তাঁর খিলাফত লাভের অধিকার হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করলেন। হযরত সা'দ (রা) আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর হাতে সোপর্দ করলেন। পক্ষান্তরে হযরত তালহা (রা) আপন অধিকার হযরত উসমান (রা)-এর অনুকূলে সোপর্দ করলেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত আলী ও উসমান (রা)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের কে এ বিষয় থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবেন? তখন তাঁর হাতেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করবো। আর তিনি আল্লাহ্ ও ইসলামকে সাক্ষী রেখে অবশিষ্ট দু'জনের শ্রেষ্ঠ জনকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করবেন। এ প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী ও উসমান (রা) উভয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেন। তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) বললেন, দেখুন, আমি আমার অধিকার পরিত্যাগ করছি। এখন আমি আল্লাহ্ ও ইসলামকে সাক্ষী রেখে ইজতিহাদ করবো এবং আপনাদের উভয়ের মাঝে যোগ্যতর ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করবো। এ প্রস্তাবে উভয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি উভয়ের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সম্বোধন করলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, তাঁর হাতে শাসনভার অর্পণ করলে তিনি ইনসাফ করবেন, পক্ষান্তরে অপরজনকে মনোনীত করা হলে তিনি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করবেন। তাঁরা উভয়ে হ্যাঁ বলে প্রতিশ্রুতি দান করলেন।

অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) উভয়ের ব্যাপারে মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং একত্রভাবে ও আলাদাভাবে, দু'জন দু'জন ও একজন একজন করে একান্তে ও প্রকাশ্যে মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মতামত সংগ্রহ করতে লাগলেন, এমন কি পর্দার ভেতরের নারীগণের মতামত চেয়ে পাঠালেন। মক্তবের বালকদেরও জিজ্ঞেস করলেন এমন কি মদীনায় আগত সওয়ার ও বেদুঈনদেরও বাদ দিলেন না। তিন দিন তিন রাত এটা চললো। এর মধ্যে উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর অগ্রগণ্যতার বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশকারী কাউকে তিনি পেলেন না। এই মধ্যবর্তী সময়ে খুব সামান্যই তিনি ঘুমিয়েছেন। পুরো সময় তাঁর কেটেছে নামায, দু'আ ও ইসতিখারায় কিংবা বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ জিজ্ঞাসায়।

অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাত বরণের চতুর্থ দিন তিনি সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যেখানে শুরার সদস্যগণ একত্র হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আলী ও উসমান (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। উভয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন,

আপনাদের উভয় সম্পর্কে আমি মানুষের মতামত গ্রহণ করেছি, এমন কাউকে আমি দেখিনি, যে অন্য কাউকে আপনাদের সমতুল্য মনে করে।

অতঃপর তিনি উভয়ের নিকট থেকে পুনঃপ্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন, তাঁকে শাসনভার প্রদান করলে তিনি ইনসাফ করবেন। পক্ষান্তরে অপরজনকে তাঁর ওপর শাসক নিযুক্ত করা হলে তিনি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করবেন। অতঃপর উভয়কে নিয়ে তিনি মসজিদে গেলেন। সে সময় তিনি ঐ পাগড়ী মোবারক পরিধান করেছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং একটি তরবারিও ধারণ করেছিলেন।

বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজিরগণকে তিনি ডেকে পাঠালেন এবং জনসাধারণ্যে নামাযের এলান করলেন। ফলে মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। মানুষ গায়ে গায়ে লেগে বসলো। তারপরও হযরত উসমান (রা) সবার পেছনে বসার জায়গা পেলেন। কেননা তিনি খুব লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)।

অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে নীচু স্বরে বহু দু'আ করলেন। উপস্থিত লোকেরা তা শুনতে পেলো না। অতঃপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বক্তব্য শুরু করে বললেন,

"হে লোক সকল! আমি একান্তে ও প্রকাশ্যে তোমাদেরকে তোমাদের মনের কথা জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পাইনি, যে এ দু'জনের মুকাবিলায় কাউকে যোগ্য মনে করে হয় আলী কিংবা উসমান। সুতরাং হে আলী! আপনি উঠে আসুন, হযরত আলী (রা) উঠে এসে পাশে মিম্বরের নীচে দাঁড়ালেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর নীতি ও কর্মের ওপর আমার বায়'আত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ রহম করুন, তা করবো না, তবে আমার সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করার শর্তে করতে পারি।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তখন তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, "হে উসমান! আপনি আমার কাছে উঠে আসুন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর নীতি ও কর্ম অনুসরণের শর্তে আমার বায়'আত গ্রহণ করতে সম্মত আছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ রহম করুন, আমি সম্মত আছি।"

তখন হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হযরত উসমান (রা)-এর হাত নিজের হাতে ধারণ করে মসজিদের ছাদের দিকে মাথা তুললেন এবং ঘোষণা করলেন, "হে আল্লাহ্! শুনুন এবং সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ্! শুনুন এবং সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! শুনুন এবং সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ্!। আমার কাঁধে খিলাফতের যে দায়িত্ব ছিলো তা আমি উসমান (রা)-এর কাঁধে অর্পণ করলাম।"

উপস্থিত লোকেরা তখন উপচে পড়ে হযরত উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত হতে লাগলো, এমন কি মিম্বরের নীচে তারা তাঁকে ঢেকে ফেললো। তখন হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) নবী ﷺ -এর বসার স্থানে বসলেন এবং হযরত উসমান (রা)-কে নীচে মিম্বরের দ্বিতীয় ধাপে বসালেন আর লোকেরা তাঁর নিকট এসে বায়'আত হতে লাগলো। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) প্রথমে বায়'আত হলেন। কোন কোন মতে তিনি শেষে বায়'আত হয়েছিলেন। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৪-৪৭]

হযরত উসমান (রা)-এর ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা

বলা বাহুল্য, এ দায়িত্বভার হযরত উসমান (রা)-এর বয়স, গুণ, বৈশিষ্ট্য ও আরব ইসলামী সমাজে তাঁর অশেষ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে পূর্ণ সংগতিপূর্ণ ছিলো। হস্তিবাহিনীর ঘটনার ষষ্ঠ বছর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন।

কুরায়শের নির্যাতন ও নিপীড়ন যখন ভীষণ রূপ ধারণ করলো তখন তিনি নবী ﷺ -এর নিকট সস্ত্রীক হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হযরত রুকাইয়া (রা)-সহ হাবশায় হিজরত করলেন। এ দু'জন সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

انهما الاول من هاجر الى الله عز وجل وال ابراهيم ولوط -

এ দু'জনই সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র দিকে হিজরত করেছে ...।

অতঃপর নবী ﷺ সাহাবা-কিরাম মদীনায় হিজরত করার পর তিনি হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় হিজরত করলেন।

হযরত রুকাইয়া (রা)-এর ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা)-কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন। এ এমন অনন্য সৌভাগ্য যা হযরত উসমান (রা) ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিলো "যিন্নূরাঈন" (দুই নূরের অধিকারী)।

সমগ্র কুরায়শ গোত্রেও তিনি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হযরত উমর (রা)-কে হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে কুরায়শের নিকট দূত রূপে প্রেরণ করতে মনস্থ করলেন তখন উমর (রা) বলেছিলেন, আমি আপনাকে এমন লোকের কথা বলবো যিনি কুরায়শের মাঝে আমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে ডেকে আবূ সুফিয়ানসহ কুরায়শের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট পাঠালেন। উসমান (রা) মক্কায় আগমনপূর্বক আবূ সুফিয়ানসহ বিশিষ্ট কুরায়শ নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বার্তা পৌঁছে দিলেন। তখন কুরায়শ নেতৃবর্গ তাঁকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পার। কিন্তু তিনি এক কথায় তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তা করতে পারি না। [সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৫]

উসমান (রা) ফিরে আসার পর মুসলমানগণ তাকে বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি তো মন ভরে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে নিয়েছেন! তখন তিনি বললেন, আমার প্রতি খুবই খারাপ ধারণা করেছ তোমরা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ! যদি এক বছরও আমি সেখানে থাকতাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ায় অবস্থান করতেন তাহলেও তিনি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতাম না। কুরায়শরা তো আমাকে তাওয়াফ করার আহ্বান জানিয়ে ছিলো কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলোম।

[যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮২]

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, উসমান (রা) নিহত হয়েছেন। তখন তিনি জিহাদের বায়'আত গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তিনি বৃক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন আর মুসলমানগণ তাঁর কাছে এসে এই শর্তে বায়'আত হচ্ছিলেন যে, যুদ্ধ থেকে তাঁরা পলায়ন করবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নিজের হাতে হাত রেখে বললেন, এ হাত উসমান-এর পক্ষ হতে। এভাবে বায়'আতে রিযওয়ান সম্পন্ন হলো।

হযরত উমর (রা)-এর নিকটও হযরত উসমান (রা) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মানুষ যখন কোন বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর কাছে কোন নিবেদন পেশ করতে চাইতো তখন তারা হযরত উসমান ও আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে সুপারিশ ধরতো। তাছাড়া তাঁকে 'রাদীফ' বলে ডাকা হতো। আরবী ভাষায় রাদীফ ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় যাকে প্রধান ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তরূপে মনে করা হয়। এ দু'জনকে দিয়ে কার্যোদ্ধার না হলে লোকেরা হযরত আব্বাস (রা)-কে গিয়ে ধরতো। [তারীখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩]

তাবুক অভিযানের দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটকালীন সময়ে হযরত উসমান (রা)-ই মুসলিম বাহিনীর সামান ও রসদ সরবরাহ করেছিলেন। তাছাড়া বীরে রুমা নামক মিঠা পানির কূপ খরিদ করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবন খাব্বাব (রা) হতে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, তাবুক অভিযানের বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য নবী ﷺ সকলকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। তখন উসমান (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাওদা ও গদিসহ এক'শ উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার উৎসাহ প্রদান করলেন। তখন হযরত উসমান (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যাবতীয় সামানসহ দু'শ উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার উৎসাহ প্রদান করলেন। তখন হযরত উসমান (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যাবতীয় সামানসহ তিন'শ উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে মিম্বর থেকে নেমে এলেন,

ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيئ.

"এ ঘটনার পর উসমান আর কোন আমল না করলেও ক্ষতি নেই।"

হযরত আনাস (রা) হতে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম (র) হযরত আবদুর রহমান ইবন জামুরাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণিত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাবুক অভিযানের সংকটকালীন বাহিনী প্রস্তুত করছিলেন তখন উসমান (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এক হাজার দীনার পেশ করলেন এবং সেগুলো তাঁর কোলে ঢেলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেগুলো গ্রহণ করে দু'বার বললেন :

ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم.

"আজকের পর উসমান যা কিছু করুক তার ক্ষতি নেই।"

হাকিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উসমান নবী ﷺ হতে দু'বার জান্নাত খরিদ করেছিলেন। কেননা তিনি বীরে রূমা খরিদ করেছিলেন এবং সংকটকালীন (তাবুক অভিযানের) বাহিনীকে রসদ দান করেছিলেন।

হযরত উসমান (রা) বীরে রূমা বা রূমা কূপটি বিশ হাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। কূপটি জনৈক ইহূদীর মালিকানাধীন ছিলো। সে সময় মুসলমানদের জন্য প্রচুর মিঠা পানির ব্যবস্থা করার ভীষণ প্রয়োজন ছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন :

من يشترى بيرومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه فى دلائهم وله بها شرب فى الجنة.

"যে ব্যক্তি বীরে রূমা খরিদ করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেবে, অবশ্য সেও অন্যদের ন্যায় তা থেকে পানি তুলতে পারবে। এর বিনিময়ে জান্নাতে সে একটি 'আশরাব' বা 'পানীয় উৎস' লাভ করবে।"

ইসায়ী হিসেবে ৬৮ বছর ও হিজরী হিসেবে ৭০ বছর বয়সে হযরত উসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার লাভ করেছিলেন।

হযরত উসমান (রা)-এর আমলে বিজয়াভিযান ও ইসলামী সালতানাতের বিস্তার

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলামী বিজয়াভিযান শীর্ষ শিখরে উপনীত হয়েছিলো। অবশ্য এর পেছনে ঐ সকল কার্যকারণই সক্রিয় ছিলো, যা ইসলাম মুসলমানদের অন্তরে শুরু থেকে সৃষ্টি করে দিয়েছিলো; যথাঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ ও শাহাদাতের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার জিন্দেগীর ক্ষণস্থায়ী স্বাদ-আহ্লাদের প্রতি তুচ্ছতা, সংখ্যা ও শক্তির প্রতি পরোয়াহীন, অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতা এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রত্যক্ষ অবলোকন, এ সকল কার্যকারণের চূড়ান্ত প্রকাশরূপে রোম, পারস্য ও

উত্তর আফ্রিকার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামী বিজয়াভিযানের বাঁধ ভাঙ্গার স্রোত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিলো এবং সে স্রোতের প্রবল তোড়ে ভেঙ্গে গিয়ে ছিলো দেশের পর দেশ এবং শহরের পর শহর, যেমন খড়কুটা ভেঙ্গে যায়।

সম্ভবত খলীফারূপে হযরত উসমান (রা) হযরত উমর (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পেছনে আল্লাহ্‌র এই হিকমত ও উম্মতের এই কল্যাণ নিহিত ছিলো যে, হযরত উমর (রা)-এর আমলে ইসলামী বিজয়াভিযানের যে শুভ সূচনা হয়ে ছিলো এবং ক্রমশ সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত হয়ে চলে ছিলো হযরত উসমান (রা)-এর হাতে তার পূর্ণতা লাভ সহজ হবে। কেননা নতুন বিজিত এলাকার অধিকাংশ প্রশাসক ও ইসলামী বাহিনীর অধিকাংশ বিজয়ী সেনাপতির হযরত উসমানের সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক ছিলো। উদাহরণস্বরূপ মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান, আমর ইবনুল 'আস, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহ, মারওয়ান ইবনুল হাকাম, ওয়ালীদ ইবনুল হাকাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এ বিজয়াভিযান লক্ষ লক্ষ মানুষের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের কারণ হয়েছিলো যা নিঃসন্দেহে অতি বিরাট কল্যাণকর বিষয়।

উসমান (রা)-এর যুগেই আজারবাইজান ও তাবারিস্তান বিজিত হয়ে ছিলো এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন রাবীয়া বাহেলী ক্যাসপিয়ান সাগরের সুবিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। বালাজার, কুহিস্তান থেকে নিশাপুর, তাগারিস্তান থেকে মারূব, বলখ ও খাওয়ারিযম এবং আরমেনিয়া থেকে তালিক্রিয়া পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এর আওতাভুক্ত ছিলো। এভাবে অব্যাহত বিজয় যাত্রা 'তাফলীগ' পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। তাঁর খিলাফত আমলেই মু'আবিয়া (রা) সাইপ্রাস দ্বীপ জয় করেছিলেন এবং ত্রিপোলী থেকে তাঞ্জা পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলীয় অঞ্চল বিজিত হয়েছিলো।

উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলেই ইসলামী খিলাফত নৌশক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছিলো। রোমকদের যুদ্ধ জাহাজগুলো দখল করার পাশাপাশি হযরত মু'আবিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ নতুন নতুন যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করেছিলেন। ইসলামী সীমান্তে রোমকদের ক্রমাগত হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি মজবুত নৌশক্তির অপরিহার্য প্রয়োজনও ছিলো।

[তারীখুল উমাম আল-ইসলামিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭-৩০]

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী বাহিনী পারস্য ও সিরিয়ার সমগ্র অঞ্চল ও মিসর বিজয় সম্পন্ন করেছিলো বটে, কিন্তু কিছু কিছু

বিজিত এলাকায় খিলাফতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং কোন না কোন ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা মাত্র স্থানীয় অধিবাসীরা তাতে সাড়া দিতো এবং ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসতো। উসমান (রা)-এর যুগে ইসলামী বাহিনী বিদ্রোহ কবলিত এলাকায় অশান্তি দমন এবং ইসলামের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলো। সুতরাং বিদ্রোহকবলিত এলাকাগুলোকে পুনরায় খিলাফতের আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা নতুনভাবে জয় করারই নামান্তর ছিলো। তাছাড়া এমন বহু এলাকা উসমান (রা)-এর আমলে বিজিত হয়ে ছিলো যেখানে এর পূর্বে মুসলিম মুজাহিদগণের পদধ্বনি শ্রুত হয়নি। [আল খুলাফা আর-রাশিদূন, পৃষ্ঠা ২৭০]

উসমান (রা)-এর আমলেই মুসলমানগণ বলখ, হেরাত, কাবুল, বাদাখশান দখল করেছিলো এবং দক্ষিণ ইরানের বিদ্রোহী কিরআন ও সিজিস্তান বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলো।

বিজিত রাষ্ট্র, বিজিত এলাকার উন্নয়ন প্রচেষ্টাতেও পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলো। নদী ও খাল খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ যেমন ব্যাপক পর্যায়ে করা হয়েছিলো তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য পুলিশ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীও সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

এদিকে রোমকদের অব্যাহত হামলা এশিয়া মাইনর ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রাভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দিয়ে ছিলো এবং আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ত্রিপোলী, বারকিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপদেশ সাইপ্রাসও এ সময় মুসলিম অধিকারে এসে ছিলো এবং মিসর জয়ের উদ্দেশে রোমানদের তৈরী নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিলো। [তারীখে আরব, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪]

সৎ পথপ্রাপ্ত উসমান (রা)-এর খিলাফত

ইনসাফ ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তার বিধান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে উসমান (রা)-এর খিলাফত ছিলো পূর্বসূরি দুই খলীফার খিলাফতের আদর্শানুসারী।

তারীখে তাবারী ও সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে, উসমান (রা) খিলাফত গ্রহণের পর শেষ ক'বছর ব্যতীত সব ক'বছর হজ্জ করেছিলেন। তিনি জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সকল প্রদেশে এই

মর্মে ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, প্রতি হজ্জ মৌসুমে প্রশাসকগণ ও তাদের বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ রয়েছে তারা যেন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়।

এই উপদেশবাণী ও তিনি বিভিন্ন প্রদেশে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমরা পরস্পর সৎ কাজের আদেশ দান করো এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করো। কোন মুমিন যেন নিজেকে অপদস্থ না করে! কেননা আল্লাহ্ চাহে তো আমি সবলের বিরুদ্ধে ও দুর্বলের পক্ষে থাকব, যতক্ষণ সে মজলুম থাকবে।

মানুষ এ নীতির সুফল ভোগ করে চলেছিলো, কিন্তু এক সময় কিছু লোক এটাকে উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা শুরু করলো। আল বিদায়া ওয়া নিহায়ার বর্ণনায় এসেছে, "হযরত উসমান (রা) তাঁর অধীনস্থ প্রশাসকগণকে প্রতি বছর হজ্জে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। প্রজাসাধারণের মাঝে তিনি ঘোষণা জারি করতেন যে, কোন প্রশাসকের বিরুদ্ধে কারো কোন ফরিয়াদ থাকলে সে যেন হজ্জে উপস্থিত হয়! আমি আমার প্রশাসকের নিকট হতে তার হক আদায় করে দেব।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৮]

উসমান (রা)-এর অমর কীর্তি

হযরত উসমান (রা)-এর অন্যতম মহান কীর্তি, সমগ্র মুসলিম জাহানকে তিনি কুরআনের অভিন্ন অনুলিপি ও অভিন্ন পঠনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং অনুলিপির অসংখ্য নোসখা বা কপি তৈরি করে ইসলামী খিলাফতের সকল অঞ্চলে বিতরণের ফরমান জারি করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং উম্মতের ওপর তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান।

ইমাম বদরুদ্দীন মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যারকাশী (র) বলেন, "বিভিন্ন কিরাত যা মানুষের মুখস্থ ছিলো তাই তাদেরকে পড়ার অনুমতি দিয়ে রাখা হয়েছিলো। কিন্তু এক সময় ফাসাদের আশংকা দেখা দিলো, তখন উম্মতকে ঐ 'পঠন'-এর ওপর ঐক্যবদ্ধ করা হলো যা এখন আমরা অনুসরণ করছি। সাধারণ্যে এটাই প্রচলিত যে, হযরত উসমান (রা) ছিলেন কুরআন সংকলক। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। তিনি শুধু এতটুকু করেছিলেন যে, তিনি ও উপস্থিত আনসার মুহাজির সাহাবা-কিরাম সর্বসম্মতভাবে কুরআনের প্রচলিত বিভিন্ন পঠনরীতির একটির ওপর উম্মতের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, কেননা ইরাক ও সিরিয়ার অধিবাসীদের মাঝে কুরআনের বিভিন্ন ক্বিরাত বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়ার কারণে ফিতনার আশংকা উপস্থিত হয়েছিলো।

এর পূর্বে কুরআনের অনুলিপি ও মাসহাফগুলো কিরাতের বিভিন্ন পঠন অনুযায়ী লিখিত ছিলো। কেননা কুরআন সাত কিরাতের ওপরই নাযিল হয়েছিলো। পক্ষান্তরে কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকর (রা)-ই হলেন অগ্রগামী ব্যক্তি। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) বলেছেন, "আবূ বকর (রা)-কে আল্লাহ্ রহম করুন। তিনিই প্রথম কুরআন সংকলন করেছিলেন।"

হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর যামানায় সাহাবা-কিরাম এ ধরনের (অভিন্ন) সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি যা হযরত উসমান (রা) করেছিলেন। কেননা তাঁর যুগে যে ধরনের মতভেদ দেখা দিয়ে ছিলো তেমনটি পূর্ববর্তী খলীফাদ্বয়ের যামানায় দেখা দেয়নি। বস্তুত আল্লাহ্র অতি বিরাট একটি পদক্ষেপের তাওফিক তাঁকে দান করেছিলেন। কেননা তিনি মতভেদ নিরসনে ও একতাবদ্ধকরণের মাধ্যমে উম্মতকে স্বস্তি দান করেছিলেন।

[আল বুরহান, পৃষ্ঠা-২৩৯]

আলী (রা) আরো বলেছেন, "উসমানকে যে দায়িত্বভার প্রদান করা হয়ে ছিলো আমাকে তা করা হলে আমিও মাসহাফ সম্পর্কে তাই করতাম যা তিনি করেছিলেন।" [আল-বুরহান, পৃষ্ঠা-২৪০]

সুয়াইদ ইব্ন গাফালাহ (র)-এর সূত্রে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা) বলেছেন, "হে লোক সকল! উসমান (রা) সম্পর্কে মুখ খুলতে সাবধানতা অবলম্বন করো। তোমরা বলে থাকো, উসমান (রা) সকল মাসহাফ পুড়িয়ে ফেলেছেন। আল্লাহ্র কসম, তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবাগণের এক বিরাট জামা'আতের সম্মুখেই পুড়িয়েছেন। যে দায়িত্বভার তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়ে ছিলো তা আমার ওপর অর্পণ করা হলে আমিও তাই করতাম যা তিনি করেছেন।" [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৮]

হযরত উসমান (রা)-এর আরেকটি কীর্তি হলো মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণ। নবী ﷺ -এর যামানায় মসজিদ ছিলো ইটের গাঁথুনির। ছাদ ছিলোখেজুর পাতার। আর খুঁটি ছিলো খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড। আবূ বকর (রা) তাতে কোন পরিবর্তন করেন নি। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় মসজিদের যে ভিত্তি ছিলো সে অনুসারেই ইটের গাঁথুনি ও খেজুর পাতার ছাউনি দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এবং খেজুর বৃক্ষের নতুন খুঁটি লাগিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা) তাতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। কারুকার্য করা পাথর ও চুনা দ্বারা দেয়াল তুলেছিলেন, কারুকার্য করা পাথর দ্বারা খুঁটি তৈরি করেছিলেন এবং মূল্যবান কাঠ দ্বারা ছাদ দিয়েছিলেন।

খিলাফত পরিচালনায় হযরত উসমান (রা)-এর পরীক্ষা

এই ব্যাপক বিজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ইসলামী উম্মাহর মাঝে সম্পদ সচ্ছলতার যে ঢল নেমে ছিলো এবং নাগরিক জীবনযাত্রার আরাম-আয়েশ ও বিলাস উপকরণের যে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছিলো সেগুলোর কিছু নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল দেখা দেয়া ছিলো খুবই স্বাভাবিক। দেশ, জাতি ও সভ্যতার ইতিহাসে এ সকল অবস্থার চড়া মাশুলও আদায় করতে হয় অনিবার্যভাবেই। তাই দেখা যায়, হযরত উসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে না করতেই ইসলামী সমাজে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেলো এবং যে জীবনধারার ওপর নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে গড়ে তুলেছিলেন এবং যে শিক্ষা-দীক্ষার ওপর তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সেই পবিত্র জীবনধারা থেকে তাদের গতিমুখ ক্রমশ সরে যাচ্ছিলো। উক্ত আদর্শ জীবন ধারণ ও তারবিয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, দুনিয়ার জিন্দেগী ও তার চাকচিক্যকে আখিরাতের লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে বিচার করা হতো। ফলে দুনিয়া তাদের অন্তরে এমনভাবে কখনো প্রবেশ করতে পারেনি যাতে দুনিয়া নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি দেখা দিতে পারে।

নববী প্রশিক্ষণের সকল রেখা থেকে জীবনের গতিধারার এই পরিবর্তন হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর খিলাফত আমলে গুরুতর আকার ধারণ করেছিলো। এর কারণ ছিলো বিজয়ের অব্যাহত ধারা এবং অভাবিতপূর্ণ সম্পদ প্রাচুর্য। বলা বাহুল্য, এটাই হলো বস্তুর ধর্ম এবং বাস্তবতার দাবি যদি না তার দমন ও নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যেমনটি করেছিলেন হযরত উমর (রা)।

হযরত উসমান (রা)-এর যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের উপাদানসমূহই ছিলো বিভিন্ন ফিতনার ঝড়ো হাওয়া প্রবেশের বাতায়ন পথ। তবে হযরত উসমান (রা) তাঁর নিজের জীবন ও আচার-আচরণে কিন্তু সত্য থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হন নি এবং খিলাফত পরিচালনার ক্ষেত্রেও সরল পথ থেকে সরে দাঁড়ান নি এবং প্রজা শাসনের ক্ষেত্রেও ন্যায় ও ইনসাফের নীতি পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মানুষের স্বভাব ও প্রবৃত্তি যখন জীবনের আয়েশ ও প্রাচুর্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় এবং সম্পদের চোরাবালিতে আটকা পড়ে, তদুপরি আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা অনুপস্থিত থাকে, তখন সে এমনই অন্ধ হয়ে পড়ে যে, সত্যের আভাস মাত্র দেখতে পায় না এবং এমনই ভ্রষ্ট হয় যে, তার আকল-বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়।

বিদগ্ধ গবেষক আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ চমৎকার বলেছেন, "সামনে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো যে, হযরত উসমান (রা)-এর জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো এই যে, তিনি তাঁর খিলাফতকালে এমন কোন কাজ করেন নি যার পূর্ব নযীর বিদ্যমান ছিলো না। কিন্তু উভয়ের মাঝে সর্ববিষয়ে মিল ও সাদৃশ্য থাকলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কোন মিল ছিলো না। কেননা সময়ের আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো, কিন্তু পরিবর্তন ধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে পদক্ষেপ গ্রহণই ছিলো আসল সমস্যা [আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৭৬১]

তিনি আরও বলেন, হযরত উসমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ হতে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ পর্যন্ত আরব সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গিয়ে ছিলো এবং ইসলামী ধারা প্রকৃতি এক ধরনের আন্তর্জাতিক ধারা প্রকৃতির রূপ ধারণ করেছিলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল জাতির জীবন পদ্ধতি অতি কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭০]

এখান থেকেই শুরু হয়ে ছিলো খলীফা উসমান (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষীদের পক্ষ হতে খিলাফতের কঠোর সমালোচনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ। আল-আক্কাদ বলেন, "নিজেদের জীবন যাপন ও চাহিদা ও দাবি পূরণের ক্ষেত্রে তো মানুষ অন্যান্য রাজ্যের প্রজাবর্গের অনুসরণ করবে। কিন্তু শাসকের নিকট তাদের দাবি ছিলো, তাদের ব্যাপারে তিনি খিলাফতের শাসন নীতি অনুসরণ করবেন। তৃতীয় খলীফার কাছে তাদের প্রত্যাশা ছিলো, কোন ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার নীতি ও কর্মপন্থা থেকে চুল পরিমাণও সরে আসতে পারবেন না, অথচ তারা নিজেরাই প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার প্রজাবর্গের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে গিয়েছিলো।

এ বিষয়ে অবশ্য বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, উসমান (রা) শক্তি ও যোগ্যতার বিচারে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সমপর্যায়ের ছিলেন না, কিন্তু স্বয়ং হযরত উমর (রা)-ও তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিকে যুগের ব্যবধানের চাপ অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি এভাবে দু'আ করতেন:

"হে আল্লাহ্! আমার বয়স বেড়ে গেছে এবং আমার শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার প্রজাবর্গ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং কোন অনিষ্ট ব্যতীত আমাকে তুলে নিন।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১৭]

উসমান (রা) নিজের উভয় যুগের এ বিরাট পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ব্যাধির ক্রমবিস্তারের কারণে শংকিত ছিলেন। তাই বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে ও বিভিন্ন ভাষণে তিনি বলতেন, "এ উম্মত যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী তাকদীর যা রোধ করা সম্ভব নয়। কেননা দুনিয়ার মোহ মানুষের অন্তর এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, কোন কৌশল ও প্রচেষ্টাই অতঃপর সফল হতে পারে না।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৭৯৯]

গবেষক আল-আক্কাদ বলেন, "আগাগোড়া সংকট এই ছিলো যে, এ ক্রান্তিকাল কখনো খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতো আবার কখনো (কিংবা একই সময়ে) বাদশাহী ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন অনুভব করতো। কিন্তু কোনটাই পাওয়া যায়নি। আর যে শাসন ব্যবস্থা নিজস্ব স্থানে খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতা ও নিজস্ব স্থানে ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু এটা বা সেটা কোনটাই লাভ করতে পারে না সে শাসন ব্যবস্থা নিরাপদ থাকতে পারে না।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২৬]

তা সত্ত্বেও আল-আক্কাদের মন্তব্য হলো, "খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর উদ্ভূত বৈদেশিক সমস্যার যে সার্থক মুকাবিলা তিনি করেছেন তার চেয়ে উত্তম কিছু সে সময় দায়িত্ব গ্রহণকারী কোন খলীফার পক্ষে করা সম্ভব হতো না।" স্থির সংকল্প, যথোপযুক্ত পদক্ষেপ, সতর্কতা ও সহনশীলতার সঙ্গে ক্ষিপ্রতা ও শাসনকার্যে আপন-পর সকলের সঙ্গে নম্র আচরণ এই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০৪]

উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রথম অসন্তোষ দেখা দিয়ে ছিলো প্রশাসকদের নিযুক্তিকে কেন্দ্র করে। কেননা তাদের অনেকেরই অতীত জীবনে বিশেষ কোন ইসলামী অবদান ও সমাজের বুকে উচ্চ দীনী মর্যাদা ছিলো না। তাছাড়া কারো কারো এমন কিছু কার্যকলাপ প্রকাশ পেয়ে ছিলো যা সমালোচনা ও অসন্তোষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কেননা অনেকে প্রশাসকদেরকে তখনও সেই দৃষ্টিতেই দেখতো, যে দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা)-এর প্রশাসকদের দেখতো। তাই তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা শ্রুত হতে লাগলো এবং সমালোচনার ঝড় উঠতে লাগলো, অথচ খলীফা ও শাসকের দৃষ্টিতে এমন কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিচার-বিবেচনা থাকে যা প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সকলের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। ওস্তাদ কুরদ আলী তাঁর 'ইসলামী প্রশাসন' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তারিখে তাবারীর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন :

"নবী ﷺ -এর প্রশাসকগণের তিন-চতুর্থাংশই ছিলেন বনূ উমাইয়া গোত্রীয়। কেননা দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যোগ্য ও সমর্থ লোকদেরই ডেকেছেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও দুর্বল লোকদের ডাকেন নি। এটা এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে, বাহিনীর নেতৃত্ব, শাসন ও প্রশাসন পরিচালনার সবকিছু ইমাম বা প্রধান শাসকেরই ইখতিয়ারভুক্ত। এ বিষয়ে তিনি সম্পদশালী হওয়া, গোত্রীয় আভিজাত্য, ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাচীনতা কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠত্বের দিকে তাকাবেন না, বরং তিনি দেখবেন জ্ঞান ও যোগ্যতার বিষয়টি অর্থাৎ অর্পিত দায়িত্ব পালনের এবং ন্যায় ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শাসন পরিচালনার সামর্থ্য কি পরিমাণ আছে।" [আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১০২]

প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা)-এর অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার সমর্থনে প্রধান বিচারপতি আবদুল জাব্বার যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন আবুল হাদীদ বলেন,

"এ কথা দাবি করা সম্ভব নয় যে, প্রশাসকদেরকে নিয়োগ করার সময় হযরত উসমান (রা) তাদের মাঝে সততা ও পবিত্রতা ছাড়া অন্য কোন অবস্থার কথা জানতেন। কেননা তাদের যেসব মন্দ আচরণের কথা বলা হয়েছে তা পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছে। আর পরবর্তীতে মন্দ প্রকাশ পাওয়ার কারণে এটা অসম্ভব নয় যে, প্রথম দিকে প্রকৃতপক্ষেই তাদের অবস্থা অজ্ঞাত ছিলো। কিন্তু অন্তত তাঁর নিকট অজ্ঞাত ছিলো।" [শরহে নাহজুল বালাগা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২]

ওস্তাদ কুরদ আলী বলেন, "এটাই কি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয় যে, প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত উসমান আপন গোত্র ও গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করবেন যারা তাঁর পূর্ণ আস্থাভাজন ছিলেন এবং (স্বভাবতই) তাঁর সফলতা লাভের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন।

[আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১০৩]

প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ সমর্থনে কৈফিয়তমূলক যা কিছু বলা সম্ভব সেগুলো সত্ত্বেও আমরা তাঁকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করি না, বরং আমরা তাঁকে একজন মুজতাহিদ মনে করি যিনি কখনো ভুল করেন, কখনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। তাছাড়া আল্লাহ্‌র সামনে কারো পবিত্রতা ঘোষণা করতে চাই না। মারওয়ান ইবনুল হাকাম, ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহএর কার্যকলাপ ও খলীফার সাথে তাদের নিকট আত্মীয়তার স্পর্শ ও খলীফার দরবারে তাদের

প্রভাব ও মর্যাদায় অপব্যবহার সম্পর্কেও কোন কৈফিয়ত পেশ করতে চাই না কিংবা তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা, যোগ্যতা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই না। তবে একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে চাই, উসমান (রা)-এর প্রতি অসন্তোষ ও বিদ্রোহ পোষণকারীদের অধিকাংশই আন্তরিক ছিলো না এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেও মুক্ত ছিলো না।

বিদগ্ধ গবেষক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ উসমানবিরোধী অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইনসাফপূর্ণ অতি উত্তম বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, খলীফার নীতি ও কর্মপন্থার সমালোচনা ও কৈফিয়ত তলব করার ক্ষেত্রে অতিশয় বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা হয়েছে। ইসলামী উম্মাহর সদস্যদেরকে ইসলাম যে বাক স্বাধীনতা প্রদান করেছে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। উসমান (রা)-এর সমালোচনায় যারা সোচ্চার হয়ে ছিলো তারা ছিলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একদল লোক। কথায় ও কাজে তাদের কোন মিল ছিলো না। যা বলতো তা করতো না, বরং বিপরীতটাই করতো। তাদের মাঝে এমন লোকও ছিলো যার ওপর হযরত উসমান (রা) হদ্দ কায়েম করেছিলেন কিংবা কোন গুরুতর অপরাধে তার পিতাকে আটক করেছিলেন কিংবা তার ও তার অবৈধ স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের আদেশ জারি করেছেন কিংবা প্রশাসনিক পদে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর খলীফা এ সকল পদক্ষেপ শুধু এজন্যই গ্রহণ করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত ছিলো। এ সকল স্বার্থই খলীফার নীতি ও কর্মের সমালোচনায় আন্দোলনকে দানা বাঁধিয়ে তুলেছিলো।

[আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৭০৬]

ফিতনা চরমে

এখানে আমরা আল্লামা ইব্‌ন কাছীর লিখিত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত ফিতনার চরম পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো যা স্বগৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় উসমান (রা)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। মিসরে একটি দল হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো এবং তাঁর সম্পর্কে অশালীন কথাবার্তা বলতো। একদল বিশিষ্ট সাহাবাকে বরখাস্ত করে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য কিংবা অযোগ্য লোকদেরকে প্রশাসনে নিযুক্ত করেছেন বলে তাঁর তীব্র সমালোচনা করতো। তাছাড়া হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর স্থলে নিযুক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ-এর প্রতিও মিসরবাসী ক্ষুব্ধ ছিলো। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাদ

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ও বারবারীদের এলাকাসহ স্পেন ও আফ্রিকা বিজয়ের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন। ইত্যবসরে সাহাবা তনয়দের একটি দল মিসরে আত্মপ্রকাশ করলো যাঁরা মানুষকে তাঁর বিরোধিতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও প্ররোচিত করতে লাগলেন। এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হোযায়ফা ছিলেন সর্বাধিক তৎপর। অবশেষে তাঁরা ছয়'শ সওয়ারের একটি দলকে রজব মাসে উমরার বেশে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা করিয়ে দিলেন যাতে তারা উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এদিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (সরকারি পত্রযোগে) হযরত উসমান (রা)-কে জানিয়েছিলেন যে, এ সমস্ত লোক তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে উমরার বেশে মদীনায় এসেছে।

তারা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলো তখন উসমান (রা) হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই তাদেরকে বুঝিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এমনও কথিত আছে, বরং উসমান (রা) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রা) নিজেকে পেশ করলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। বিশিষ্ট লোকদের একটি জামাতও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। আলী (রা) জুহফা এলাকায় তাদের সাথে মিলিত হলেন। তারা তাঁকে অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো। তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তারা আত্মতিরস্কার করে বলতে লাগলো, এই ব্যক্তির জন্য তোমরা আমীর-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছো এবং তার বিরুদ্ধে এর নাম ব্যবহার করছো (অথচ ইনি তা থেকে মুক্ত)।

আলী (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের অসন্তোষের কারণ কি? তখন তারা কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করলো আর তিনি হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ হতে কৈফিয়তমূলক উত্তর দিলেন। তাদেরকে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে তারা বিফলমনোরথ হয়ে যেখান থেকে এসে ছিলো সেখানেই ফিরে গেলো। তাদের আশা ও উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র পূরণ হলো না।

হযরত আলী (রা) ফিরে এসে হযরত উসমান (রা)-কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে কিছু পরামর্শ দিলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁর আন্তরিক পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন এবং অম্লান বদনে মেনে নিলেন।

এরপর মিসর, কুফা ও বসরাবাসীরা পরস্পর চিঠি চালাচালি করলো এবং মদীনায় অবস্থানকারী সাহাবা কিরামের নাম স্বাক্ষরে বহু জাল চিঠি তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হলো। ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিসরীয়দের একটি দল মানুষের কাছে হজ্জের কথা বলে বের হলো এবং মদীনায় এসে অবরোধ করে বসলো। সাহাবা কিরাম অবরোধকারীদের কাছে গিয়ে তাদের আবার ফিরে আসার কারণে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। আলী (রা) তাদের বললেন, তোমাদের চলে যাওয়ার পর আবার মত পরিবর্তন করে ফিরে আসার কারণ কি? তারা বলল, ডাক বাহকের নিকট আমরা আমাদেরকে হত্যা করার আদেশ সম্বলিত একটি পত্র পেয়েছি।

বসরা ও কূফা থেকে আগত দলটিও একই কথা বললো। প্রতিটি শহর থেকে আগত লোকেরা বললো, আমরা শুধু আমাদের সাথীদের সাহায্য করার জন্য এসেছি। তখন সাহাবা কিরাম তাদেরকে বললেন, তোমাদের সাথীদের বিপদের কথা তোমরা জানলে কি করে, অথচ তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক মঞ্জিলের দূরত্বে চলে গিয়েছো? নিশ্চিতই এটা তোমাদের পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়।

কথিত আছে, মিসরীয়রা যখন স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলো তখন পথে তারা একজন ডাকবাহককে দেখতে পেয়ে তাকে আটক করলো। তার দেহ তল্লাশী করে হযরত উসমান (রা)-এর যবানীতে লেখা একটি পত্র পাওয়া গেলো, যাতে তাদের একদলকে হত্যা করার, একদলকে শূলে দেয়ার এবং একদলকে হাত-পা কর্তন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। পত্রে হযরত উসমান (রা)-এর আংটির মোহর অংকিত ছিলো। আর ডাকবাহক ছিলো হযরত উসমান (রা)-এর গোলাম, তার নিজস্ব উটের ওপর সওয়ার।

মিসরীয় দলটি ফিরে এসে ঘুরে ঘুরে লোকজনকে পত্রটি দেখাতে লাগলো। আর লোকজনও আমীরুল মু'মিনীনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। তখন তিনি বললেন, আমার বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সাক্ষী পেশ করো। অন্যথায় আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি নিজেও লিখিনি, কাউকে দিয়ে লেখাইওনি এবং এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর আংটির অনুরূপ আংটি জাল করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যাদের বিশ্বাস করার তারা আমীরুল মু'মিনীনের কথা বিশ্বাস করলো। আর যাদের মিথ্যা মনে করার তারা মিথ্যা মনে করলো। আল্লামা ইবন কাছীর বলেন, এ পত্র হযরত উসমানের নামে জাল করা হয়েছিলো। কেননা তিনি এমন আদেশ করেন নি, এমন কি এ সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেনও না।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন যে, মিসরীয়রা ঐ পত্র মিসরের প্রশাসকের কাছে প্রেরিত ডাকবাহকের নিকট পেয়েছিলো। তাতে তাদের কারো সম্পর্কে হত্যার এবং কারো সম্পর্কে শূলে চড়ানোর আর অন্যদের সম্পর্কে হাত-পা কর্তনের আদেশ ছিলো। পত্রটি মারওয়ান ইবনুল হাকাম উসমান (রা)-এর নামে লিখেছিলো। সে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সমর্থন গ্রহণ করেছিলো :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الى اخر الاية۔

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং যমিনে ফাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে".... ।

[বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তারীখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫]

কোন সন্দেহ নেই যে, মিসরীয় দলটি অনুরূপই ছিলো কিন্তু মারওয়ানের কোন অধিকার ছিলো না হযরত উসমানের নামে মনগড়া কিছু করার এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর যবানীতে পত্র লিখে তাঁর মোহর জাল করে তাঁর গোলামকে তাঁর উটের ওপর সওয়ার করে মিসরে প্রেরণ করার। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৬]

তবে কতিপয় গবেষক লেখক মনে করেন, হযরত উসমানের পক্ষ হতে পত্র প্রেরণের বিষয়টি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিলো। موارد الظمان الى زدوائد ابن صبان-এর একটি বর্ণনা এ মতের সত্যতা প্রমাণ করে। তারীখে তাবারীতেও প্রায় একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মিসরীয়রা ফিরে গেলো। পথিমধ্যে তারা এক সওয়ারের দেখা পেলো। একবার সে তাদের কাছে ভেড়ে, আবার দূরে সরে যায়। আবার ফিরে আসে, আবার দূরে সরে যায় এবং তাদের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায়। (তার সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে) তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, বলো দেখি, তোমার ব্যাপার কি? তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। নির্ভয়ে বলো। সে বললো, আমি মিসরের প্রশাসকের উদ্দেশে প্রেরিত আমীরুল মু'মিনীনের দূত। তখন তারা তাকে তল্লাশী করে হযরত উসমান (রা)-এর যবানীতে মিসরের প্রশাসকের নামে লেখা একটি পত্র পেয়ে গেলো যাতে হযরত উসমান (রা)-এর আংটির মোহর অংকিত ছিলো। আর তাতে সশ্লিষ্ট লোকদের

শূলে চড়ানোর কিংবা হাত-পা কর্তন করার আদেশ ছিলো। তখন তারা পত্রসহ মদীনায় ফিরে এলো এবং হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, দেখুন না, আল্লাহ্‌র দুশমন আমাদের সম্পর্কে কী কী আদেশ লিখে পাঠিয়েছে। এখন আল্লাহ্ আমাদের জন্য তার রক্ত হালাল করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের সঙ্গে তার কাছে চলুন।

তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। তারা বললো, তাহলে আমাদের কাছে পত্র লিখেছিলেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার নামে কখনো কোন পত্র লিখিনি। তখন তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বললো, এরই জন্য কি তোমরা লড়াই করছো? এরই জন্য তোমরা উদ্দীপ্ত হচ্ছো?

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আলী (রা) বলেছিলেন, হে বসরাবাসি! তোমরা কিভাবে মিসরীয়দের অবস্থা জানতে পারলে, অথচ তোমরা কয়েক মঞ্জিল চলে গিয়েছিলে? এরপরই না তোমরা আমাদের কাছে ফিরে এসেছ। আল্লাহ্‌র শপথ! মদীনাতেই এ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত ও তাঁকে রক্ষায় আলী (রা)-এর প্রশংসনীয় ভূমিকা

এরপর খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে এমন কিছু 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' হলো যা খিলাফাতের অত্যুচ্চ মর্যাদা, নবুয়তের নিকটবর্তী, আবূ বকর ও উমর (রা) এই দুই মহান খলিফার সংলগ্ন যুগের পবিত্রতার সাথে মোটেও উপযোগী ছিলো না। কিন্তু গবেষক আল-আক্কাদের ভাষায় তা ছিলো এমন জঘন্য একটি চক্রের সৃষ্ট গোলযোগ, যাদের পক্ষে এ ধরনের কোন কাজই অসম্ভব ছিলো না।

বিদ্রোহীরা তাঁকে আপন বাসগৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো এবং কঠোর অবরোধ আরোপ করে তাঁর জীবন ধারণ দুর্বিষহ করে ফেললো। সাহাবা কিরামের অনেকেই স্ব স্ব গৃহে বসে গেলেন। হযরত হাসান-হুসায়ন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-সহ সাহাবা-তনয়গণের একটি দল তাঁদের পিতাগণের নির্দেশে হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহে পৌঁছে গেলেন। বিদ্রোহীদেরকে তাঁরা তাঁর পক্ষ হতে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং প্রাণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত হলেন যাতে কেউ তাঁর নিকটেও পৌঁছতে না পারে।

এভাবে উসমান (রা) মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আর এ অবরোধ যিলকাদ মাসের শেষ ভাগ হতে যিলহজ্জ মাসের আঠারো তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকলো। এর একদিন পূর্বে উসমান (রা) বাসগৃহে তাঁর নিকট উপস্থিত প্রায় সাত শ' আনসার-মুহাজিরকে লক্ষ্য করে বললেন, তাঁদের মাঝে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র, হাসান-হুসায়ন ও আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর একদল আযাদকৃত গোলামসহ উপস্থিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁদেরকে সুযোগ দান করলে অবশ্যই তাঁরা তাঁকে রক্ষা করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, যাদের ওপর আমার কোন-না-কোন হক রয়েছে তাঁদেরকে আমি শপথ দিয়ে বলছি, তারা যেন নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে এবং নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়, অথচ তখনও তাঁর নিকট বিশিষ্ট সাহাবা ও তাঁদের পুত্রদের এক বিরাট জামাত উপস্থিত ছিলো, এমন কি হযরত উসমান আপন গোলামদের উদ্দেশে বললেন, যে তার তলোয়ার খাপবদ্ধ রাখবে সে স্বাধীন। বর্ণিত আছে, হযরত উসমান (রা) এভাবে চলে যাওয়ার কসম দেয়ার পর সর্বশেষে যিনি হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহ ত্যাগ করেছেন তিনি হলেন হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)। [ইব্ন কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১]

হযরত আলী (রা) তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন উসমান (রা) বললেন, যে কেউ তার ওপর আল্লাহ্র হক রয়েছে বলে মনে করে এবং তার ওপর আমার হকও স্বীকার করে তাকে আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলি, আমার জন্য যেন নিজের কিংবা অন্যের এক ফোঁটা রক্তও প্রবাহিত না করে। হযরত আলী (রা) পুনঃ আবেদন জানালে তিনি একই জবাব দিলেন। অতঃপর নামাযের সময় আলী (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেরা বললো, হে আবুল হাসান! অগ্রসর হোন এবং নামায পড়ান। আলী (রা) বললেন, ইমাম অবরুদ্ধ অবস্থায় আমি তোমাদের নামায পড়াতে পারি না, বরং আমি একা নামায পড়বো। অতঃপর তিনি একা একা নামায পড়ে ঘরে ফিরে গেলেন। [উসমান ইব্ন আফ্ফান যুন্নুরাইন, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯]

এদিকে হযরত উসমান (রা)-এর সংকটাবস্থা চরমে পৌঁছলো এবং সঞ্চিত পানি ফুরিয়ে গেলো। তিনি মুসলমানদের নিকট পানির ফরিয়াদ জানালেন। তখন হযরত আলী (রা) স্বয়ং পানির মশক নিয়ে উটে

সাওয়ার হলেন এবং অনেক চেষ্টার পর তাঁর নিকট পানির মশকগুলো পৌঁছালেন। এজন্য তাঁকে অবরোধকারী মূর্খদের বহু অশালীন কথা ও আচরণের মুকাবিলা করতে হয়েছে, এমন কি তারা তাঁর উটকে তাড়া করার স্পর্ধাও প্রদর্শন করেছে।

বর্ণিত আছে, মু'আবিয়া (রা) হযরত উসমান (রা)-কে বলেছিলেন, "প্রবল শত্রুদের হামলার আগেই আপনি আমার সঙ্গে সিরিয়ায় চলুন। কেননা তখন আপনি তাদের প্রতিহত করতে পারবেন না। কিন্তু উসমান (রা) তাঁকে বললেন, কোন কিছুর বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিবেশ বিসর্জন দিতে পারি না, এমন কি তাতে যদি আমার ঘাড়ের রগ কাটা যায় তবুও না।

তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, তাহলে সিরীয় বাহিনীর একটি অংশ আপনার নিকট প্রেরণ করি, যারা সম্ভাব্য গোলযোগের মুকাবিলার জন্য মদীনাবাসীদের মাঝে অবস্থান করবে। উসমান (রা) বলেন, আমি কি বহিরাগত বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতিবেশীদেরকে খাদ্য সংকটে ফেলতে পারি এবং আনসার ও মুহাজিরদের জীবন দুর্বিষহ করতে পারি? তখন মু'আবিয়া (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! হে আমীরুল মু'মিনুন! হয় আপনি ঘাতকের হাতে নিহত হবেন কিংবা হানাদার বাহিনীর শিকার হবেন। উসমান (রা) বলেন, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাপক।

[আবূ জাফর তাবারী, তারীকুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১]

সে সময় বাসগৃহের কতিপয় লোক শহীদ হলেন, সেই পাপাচারীদের কতিপয় লোকও নিহত হলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) ক্ষত বিক্ষত হলেন এবং হাসান ইব্ন আলী (রা)-ও আহত হন।

আনসাবুল আশরাফ গ্রন্থে বালাযুরী লিখেছেন, দুষ্কৃতিকারীরা উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করলো, এমন কি হাসান ইব্ন আলীও দোরগোড়ায় রক্তাক্ত হয়ে গেলেন এবং আলী (রা)-র মুক্ত দাস কানবারও মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।

আবূ মুহম্মাদ আল-আনসারী বলেন, আমি উসমান (রা)-কে তাঁর বাসভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। হাসান ইব্ন আলী (রা) তাঁকে রক্ষার জন্য লড়াই করছিলেন। শেষে তিনি আহত হন। যারা তাঁকে

আহত অবস্থায় বহন করে নিয়ে গিয়ে ছিলো আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। [আনসাবুল আশরাফ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২-৯৫]

একই গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে, আলী (রা)-র কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তাঁর জন্য তিন মশকপূর্ণ পানি পাঠান। তা তার ঘরে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। পানি পৌঁছাতে গিয়ে বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়ার কয়েকজন মাওয়ালী (মুক্ত দাস) আহত হন। তবে শেষ পর্যন্ত পানি পৌঁছেছিলো।

দুষ্কৃতিকারীরা হযরত উসমান (রা)-র নিকট খিলাফত পরিত্যাগের দাবি জানালো। কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এটা তোমাদের বিষয়। সুতরাং তোমরা যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করো। কিন্তু তাদের কথা মতো দায়িত্ব পরিত্যাগ করা, সে অসম্ভব। কেননা আল্লাহ্ আমাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন তা আমি নিজে খুলে ফেলতে পারি না। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৪]

হযরত উসমান (রা)-র এ সিদ্ধান্ত ছিলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি উপদেশের আলোকে। কেননা তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেন :

يَا عُثْمَانُ اِنَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَاِنْ اَرَادُوْكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ.

"হে উসমান! আল্লাহ্ হয়তো তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। লোকেরা যদি তোমাকে তা খুলে ফেলতে চাপ দেয় তবে তুমি তা খুলো না।"

উসমান (রা)-এর স্ত্রী নায়েলা বলেন, অবরোধকালে যেদিন তাঁকে শহীদ করা হয় সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। [বিদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩]

নাফে (র) ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, ভোরে হযরত উসমান (রা) লোকদের নিকট বর্ণনা করছিলেন, আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হে উসমান! আমাদের কাছে এসে ইফতার করো। তাই তিনি ভোর থেকে রোযা রাখলেন এবং সেদিনই শহীদ হন (পূর্বোক্ত বরাত)। তাঁর সামনে ছিলো কুরআন শরীফ এবং তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর শাহাদাতের দিনটি ছিলো ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্জ, রোজ শুক্রবার। [বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫]

উসমান (রা)-এর দৃঢ় ঈমান, নৈতিকতা ও ইসলামে তাঁর উচ্চ মর্যাদা

ইসলামের ইতিহাসের চরম লজ্জাজনক ও মর্মান্তিক এ অধ্যায়টি আমরা বিদগ্ধ গবেষক আব্বাস মাহ্‌মূদ আল-আক্কাদের মন্তব্যের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে চাই। বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগকালে হযরত উসমান (রা)-এর অবস্থান ও তাঁর জীবন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল-আক্কাদ বলেন, একজন ব্যক্তি হিসেবে খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর জীবনে ঈমান ও বিশ্বাসের প্রভাব ঐ সকল গোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর প্রোজ্জ্বল ছিলো, যারা তাঁর সাথে বিবাদ করার জন্য ও তার কৈফিয়ত তলব করার জন্য বিভিন্ন শহর থেকে এসে জড়ো হয়েছিলো। অথচ তিনি ছিলেন সেই স্বল্প সংখ্যক লোকদের একজন, যাঁদের সম্পর্কে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে এমন ধারণাও করা সম্ভব নয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর যে অত্যুচ্চ চরিত্র-মহিমায় তাঁরা সুশোভিত হয়েছেন তারপর জাহিলিয়াত তাদেরকে সামান্যই স্পর্শ করতে পারে। [আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা-৭০৮]

আত্মারবিচার ও আত্মসমালোচনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নিজের ও নিজ প্রিয়তম ব্যক্তির জীবন রক্ষার বিনিময়ে হলেও সাধারণ মানুষের প্রাণহানি না করার সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন অটল। নিজে নিহত হওয়ার ব্যাপারে তিনি যখন নিশ্চিত্ত হলেন, তখন তাঁর হত্যা প্রচেষ্টায় অবরোধ আরোপকারীদের প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে তাঁর সাহাবায়ে কিরামের অবস্থান গ্রহণের আবেদন তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। খিলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর দাবি জানালা হলে তাও তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এ প্রত্যাখ্যান কোন মোহ বা আপত্তির কারণে ছিলো না। কেননা জীবনের চেয়ে প্রিয়তর কিছু তো হতে পারে না! আর সেই জীবনটাই ছিলো তাঁর কাছে তুচ্ছ। তদ্রূপ কেউ যেনো একথাও না ভাবে যে, খিলাফত থেকে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। কেননা সকল ঐতিহাসিক এই বিষয়ে একমত যে, দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের দিন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিলো খিলাফতের দায়িত্বভার লাভের দিনের তুলনায় কম।

খিলাফতের দায়িত্ব ত্যাগে তার অস্বীকৃতির কারণ ছিলো এই আশংকায় যে, তিনি পদত্যাগ করলে তা থেকে উদ্ভূত সংঘাত-সংঘর্ষের দায়ভাগ তাঁকেই বহন করতে হবে। একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় তিনি তা

প্রকাশও করেছেন। তিনি বলেছেন, আজ যারা তাঁর শাসনকালকে অসহনীয় দীর্ঘ মনে করছে, হয়তো তারাই পরবর্তীতে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তাঁর শাসনকাল যদি এক শত বছর দীর্ঘ হতো! সুতরাং স্বেচ্ছায় তিনি অশুভ পরিণতির পথ খুলে দিতে পারেন না।

তাছাড়া ঘটনা প্রবাহকে এক পাশে রেখে যদি আমরা আদর্শ ও বিশ্বাসের ধারক হিসেবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে একথা বলা যায় যে, আমরা এমন একটি আঘাতের সম্মুখীন হবো, আকীদা ও বিশ্বাসের প্রভাব ও পর্যালোচনাকারী ব্যক্তি মাত্রকেই যার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু যদি আমরা আদর্শ ও বিশ্বাসের মানদণ্ডে ঘটনা প্রবাহের বিচার করি এবং একথা মনে রাখি যে, ঘটনা-দুর্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে ইতিহাস মুক্ত হতে পারে না এবং মানব সম্প্রদায় ও তার বিবেকের জন্য বিরোধ ও সংঘাতের ঘটনাবলীই সবচেয়ে বড় বিপদ নয়, তাহলেই এটা আর কোন মর্মান্তিক আঘাত নয়।

[আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা-৭০৯]

আল-আক্কাদ তাঁর "আবকারিয়াত উসমান" গ্রন্থের শেষ দিকে লিখেছেন, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড যদি এক চরম মন্দ ও অকল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হবে, জগতের অন্যান্য অকল্যাণের ন্যায় এই অকল্যাণের মাঝেও বিভিন্ন কল্যাণ নিহিত ছিলো, যা দুর্যোগের কালো ছায়া সরে যাওয়ার পর ব্যক্তি ও জাতির জীবন আজো অম্লান হয়ে আছে।

এ মর্মান্তিক ঘটনার একটি কল্যাণ হলো, এই সত্যের প্রতিষ্ঠা যে, চীনের সীমান্ত থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক যিনি তিনিও জনসাধারণের নিকট জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নন। অবশ্য দুষ্কৃতিকারীরা উক্ত অধিকারের অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে অপব্যবহার করেছিলো।

আরেকটি কল্যাণ হলো, ঈমান ও বিশ্বাসের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা নব্বই বছরের নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধ চরম দুর্যোগ মুহূর্তে আপন বাসগৃহে অবরুদ্ধ ও পিপাসার্ত অবস্থায় উম্মতের সামনে রেখেছেন, অথচ তখন তিনি ইচ্ছা করলে হাজার হাজার সাহায্যকারী রক্তের নদী বইয়ে দিতো যেখানে এক ফোঁটা পানিও ছিলো দুষ্প্রাপ্য।

আলহাফেয তাকীউদ্দীন সাবকী (মৃ. ৭৫৬ হি.) বলেন, আমাদের আকীদা হচ্ছে এই যে, হযরত উসমান (রা) ছিলেন ইমামে হক। তিনি মজলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন, তবে সাহাবা-কিরামকে আল্লাহ্ তাঁর হত্যাকাণ্ডে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। বরং এক অবাধ্য অভিশপ্ত শয়তানের হাতে তাঁর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো। তদুপরি এমন একজন সাহাবীর কথাও আমাদের জানা নেই যিনি এ ঘৃণ্য কাজ বিন্দুমাত্র সমর্থন করেছেন, বরং তাদের প্রত্যেকের পক্ষ হতেই কঠোর নিন্দা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত

হযরত আলী (রা)-এর বাই'আত, খিলাফতের পর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালের সমস্যা, সংকট ও দুর্যোগ, মতবিরোধের সূচনা ও জামাল যুদ্ধ, আয়েশা (রা)-এর প্রতি আলী (রা)-এর সম্মান, আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মাঝে সিফ্ফীন যুদ্ধ– খারেজীদের বিদ্রোহ-আলী (রা)-এর সালিশী প্রস্তাব গ্রহণ, তাঁর সম্পর্কে খারেজীদের অন্যায় মীমাংসা, খারেজী ও সাবাঈ মতবাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত

হযরত আলী (রা)-এর বায়'আত

হযরত উসমান (রা)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর মদীনায় অবস্থানকারীরা এমন একজন লোকের সন্ধান কর ছিলো যিনি দায়িত্বভার গ্রহণে তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। "এদিকে মিসরীয়রা আলী (রা)-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করে চলছিলো। আর তিনি বিভিন্ন খেজুর বাগানে তাদের থেকে আত্মগোপন করে ফিরছিলেন। মানুষ তখন হতবুদ্ধি অবস্থায় পড়ে আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে জোর আবেদন জানালো এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলো। কেননা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর সবার মুখে একই কথা ছিলো যে, আলী ছাড়া আর কেউ তা সামাল দিতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষেও তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর মাঝে আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পর যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের মাঝে খিলাফতের দায়িত্ব ও মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণের ব্যাপারে আলী (রা)-এর চেয়ে যোগ্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রা) মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তাঁর পরিধানে ছিলো বড় তহবন্দ ও রেশমী পাগড়ী। জুতা জোড়া ছিলো তাঁর হাতে, আপন ধনুকের ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়ানো ছিলেন। তখন সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁর হাতে বা'য়আত গ্রহণ করলো। সেদিন ছিলো পঁয়ত্রিশ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের উনিশ তারিখ রোজ শনিবার।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭]

খিলাফত গ্রহণের পর আলী (রা)-এর প্রথম খুতবা

পরবর্তী জুমার দিন হযরত আলী (রা) মিম্বরে আরোহণ করলেন। যারা ইতিপূর্বে বায়'আত হয়নি তারা বায়'আত গ্রহণ করলো। এই বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়ে ছিলো যিলহজ্জ মাসের পঁচিশ তারিখে।

প্রথম খুতবায় তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ছানা ও প্রশংসা বর্ণনার পর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পথ প্রদর্শক এক কিতাব নাযিল করেছেন যাতে ভালো ও মন্দ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তোমরা যা ভালো তা গ্রহণ করো এবং যা মন্দ তা পরিহার করো।

আল্লাহ্ তা'আলা অনেক কিছু হারাম করেছেন। তন্মধ্যে মুসলমানের (জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু) হুরমতকে সকল হুরমতের ওপর অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং ইখলাস ও তাওহীদের বন্ধন দ্বারা মুসলমানদের হকসমূহকে সুদৃঢ় করেছেন।

পূর্ণ মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে, তবে হক ও সত্যের খাতিরে হলে ভিন্ন কথা। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়, তবে শরীয়তের বিষয় হলে ভিন্ন কথা।

বিশিষ্ট-সাধারণ সকল মানুষের যাবতীয় বিষয়ের অতি সত্বর যত্ন নও। কেননা পূর্বসূরিগণ তোমাদের সম্মুখে আর সেই মহামুহূর্ত তোমাদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। সুতরাং দ্রুত ধাবিত হও, তাহলে (তাদের সঙ্গে) যুক্ত হতে পারবে। কেননা আখিরাত মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় করো। কেননা তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে, এমন কি পশু-প্রাণী সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, তার নাফরমানি করো না। যদি কল্যাণ ও ভালো কিছু দেখ তবে তা গ্রহণ করো আর যদি অকল্যাণ ও মন্দ কিছু দেখ তবে বর্জন করো।

وَاذْكُرُوٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন পৃথিবীতে তোমরা (সংখ্যায়) অল্প, ও (শক্তিতে) দুর্বল ছিলে এবং এ আশংকা করছিলে যে, লোকেরা তোমাদেরকে থাবা মেরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন এবং আপন সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তি যুগিয়েছেন এবং উত্তম উত্তম খাদ্য দ্বারা তোমাদের রিযিক দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

[সূরা আনফাল : ২৬]

বলা বাহুল্য, আমীরুল মু'মিনীনের এ খুতবা ছিলো পূর্ণ স্থান-কাল উপযোগী। ঠিক সংবেদনশীল স্থানটিতেই তিনি আঘাত করেছিলেন এবং মূল

ব্যাধিস্থলটিতেই অঙ্গুলি স্থাপন করেছিলেন। কেননা ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাধির শিকার হয়ে ছিলো তা হলো মুসলমানের জান-মাল ও আবরু-ইজ্জতের অসম্মান ও নিরাপত্তাহীনতা। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান (রা) এই মহাফিতনারই লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন এবং তা রাসূলের শহরে, তাঁর মসজিদ ও রওযার পার্শ্বে মানুষের চোখের সামনেই ঘটেছিলো। সুতরাং মুসলমানদের শাসনভার লাভকারী খলীফার অবশ্য কর্তব্য ছিলো মুসলমানের সম্মান রক্ষা করা এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করা। আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের ব্যাপারে। এমন কি পশু-পাখিদের ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত করার জন্য সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা।

তদুপরি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও হিকমতের সঙ্গে মানুষকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, নতুন খিলাফতকে কোন নীতি ও কর্মপন্থার মাধ্যমে বরণ করতে হবে। তাই তিনি বললেন, কল্যাণ ও ভালো কিছু দেখতে পেলে তা তোমরা গ্রহণ করো আর অকল্যাণ ও মন্দ কিছু দেখতে পেলে তা বর্জন করো।

অতঃপর তিনি وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ আয়াত দ্বারা তার বক্তব্যের ইতি টানলেন। কেননা এ আয়াতটির মর্মবাণী মানুষের অন্তরে তখন জাগরূক থাকার প্রয়োজন ছিলো যাতে মানুষ নিজেদের ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী জীবনের মাঝের বিরাট পার্থক্য তুলনা করে বুঝতে পারে। কেননা এক সময় সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা, অখ্যাতি ও যিল্লতির এমন স্তরে তাদের অবস্থান ছিলো, যেন এক টুকরো গোশত, যা যে কোন সময় পাখি থাবা মেরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে এমন সংখ্যা, শক্তি, বিস্তার, ব্যাপ্তি, শান্তি-সমৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ-প্রাচুর্য তারা লাভ করলো যে, চারদিকে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো এবং বহু দেশ, বহু জাতি তাদের অনুগত হলো।

আলী (রা)-এর খিলাফত কালের সমস্যা, সংকট ও দুর্যোগ

ইতিহাসের যে চরম ক্রান্তিকালে হযরত আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন তা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এবং ইসলামী খিলাফতের সুদীর্ঘকালে আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। সে সময় খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা বীভৎস ও বর্বরতমরূপে সংঘটিত হয়েছিলো। তদুপরি বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং উত্তাপ ও অগ্নি উদ্‌গিরণের বিভিন্ন উপাদানের একত্র সমাবেশ ঘটে ছিলো তখন। গুজব-গুঞ্জন,

জল্পনা-কল্পনা ও সংশয়-সন্দেহেরও বিস্তার ঘটে ছিলো ভয়াবহ রূপে। উচ্চাভিলাসীদের দাবি ও চাহিদাও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিলো। শহরে-পল্লীতে-মজলিসে-মাহফিলে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাই ছিলো মূল আলোচ্য বিষয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিলো এই যে, মিসর, ইরাক ও বেদুঈন জনগোষ্ঠীর যারা ঘটনার সময় ছিলো সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ও নির্লিপ্ত, এক ফোঁটা রক্ত দূরের কথা, এক ফোঁটা ঘামও যারা ঝরায়নি তখন তারাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিসাসের দাবিতে অতি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো।

অবশ্য দেশকালনির্বিশেষে এটাই হলো মানব সমাজের স্বভাবপ্রকৃতি। কোন অস্বাভাবিক ঘটনা যখন জাতীয় জীবনের গতিধারা স্তব্ধ করে দেয়, শান্তি ও স্থিতিশীলতা অন্তর্হিত হয় এবং তার কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি ব্যয় করার ও মনোযোগ ও প্রয়াস নিবদ্ধ করার উপযুক্ত কোন ক্ষেত্র খুঁজে না পায়, যেমন যুদ্ধাভিযান ও দেশ বিজয় কিংবা সমাজ উন্নয়ন ও দেশ গড়ার গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, তখন গোটা জাতি ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ডেই মেতে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন মুসলিম উম্মাহর অবস্থাও ছিলো অভিন্ন, জাতির চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করার মতো উপযুক্ত কোন ক্ষেত্র তখন বিদ্যমান ছিলো না। কেননা একজন খলীফা সদ্য শাহাদাত বরণ করেছেন, অথচ নতুন কোন খলীফার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে ইসলামী সমাজ একটি শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। আর বলা বাহুল্য, বিপদ ও দুর্যোগবেষ্টিত কোন জাতির জীবনে কিংবা শত্রুপরিবেষ্টিত কোন নবীন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শূন্যতার চেয়ে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক আর কিছুই নেই। খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে হযরত আলী (রা) যে কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার অতি উত্তম চিত্র বিদগ্ধ গবেষক আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ তুলে ধরেছেন। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আলোচ্য ঘটনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্দোষ। কেননা হযরত উসমান (রা)-এর সর্বাধিক হেফাযত প্রচেষ্টায় বিশিষ্ট ও প্রবীণ সাহাবা-কিরামের মাঝে তাঁর ভূমিকাই ছিলো সর্বাধিক এবং যুবক সাহাবা-তনয়দের মাঝে তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর ত্যাগ ছিলো সর্বাধিক।

গবেষক আল-আক্কাদ বলেন, ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও রক্তাক্ত ঘটনার পর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত ও বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কেননা হযরত উসমান (রা)-কে বার্ধক্যের অসহায় অবস্থায় ঘরের চার দেয়ালের মাঝে অবরুদ্ধ রেখে হত্যা করা হয়েছিলো। অথচ খুনীরা কয়েক দিন ধৈর্য ধারণ করলে পিপাসার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যেতো।

এ ঘটনায় সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক ছিলো, এ ফিতনা রোধ করার ও এর অবধারিত পরিণতি পরিহার করার কোন উপায় ছিলো না। কেননা ঘটনার দায়-দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিপুল সংখ্যায় সর্বদিকে ছড়িয়ে ছিলো। কেউ ছিলো তার সমর্থক আর কেউ ছিলো তাঁর বিরোধী। সুতরাং শত্রুদের দমন করা গেলেও সমর্থকদের দমন করা তো সহজ ছিলো না।

তদ্রূপ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ফিতনা প্রতিহত করা সম্ভব হলেও নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ফিতনা তো প্রতিহত করা সম্ভব ছিলোনা। তবে হয়ত সদুদ্দেশ্য ও অসদুদ্দেশ্য দু'টোই এখানে সমান্তরালে কার্যকর ছিলো। তাই দেখা যায়, যে সকল দুঃখজনক কর্মকাণ্ড মর্মান্তিক পরিণতিকে ত্বরান্বিত করে ছিলো তার অনেক কয়টি স্বয়ং উসমান (রা) থেকেই ত্বরিত প্রকাশ পেয়েছিলো। কিংবা হয়তো তিনি চিন্তা-ভাবনা করেই সে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দ্রুত মন্দ পরিণতি ডেকে আনার ক্ষেত্রে শত্রুদের অপতৎপরতার চেয়ে সেগুলো কম দায়ী ছিলো না। [আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৮৮০]

আল-আক্কাদ আরও বলেন, হযরত আলী (রা)-এর দায়িত্ব ছিলো অবাধ্য অশ্বকে লাগাম পরিয়ে বাগে আনা। সেই সাথে অশ্বের চলার পথ থেকে সেই সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করা যা তার চলার গতিকে ব্যাহত করে। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৮৫]

দ্বিতীয় সমস্যা ছিলো, উসমান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা পূর্ণরূপে চিহ্নিত ছিলো না অর্থাৎ তাদের বিপক্ষে প্রত্যক্ষদর্শীর শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান ছিলো না যাতে কিসাস গ্রহণ করা যেতে পারে, এমন কি স্বয়ং উসমান (রা)-এর স্ত্রীও হত্যাকারীদের সুনির্দিষ্টরূপে সনাক্ত করতে পারেন নি। এ ছাড়া আরও সমস্যা ছিলো।

গবেষক আল আক্কাদ বলেন, উসমান-ঘাতকদের ওপর কিসাস জারি করা প্রসঙ্গে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) একবার যখন আলোচনা তুললেন, তখন দেখা গেলো বাহিনীর প্রায় দশ হাজার সৈন্য বর্শা উঁচিয়ে সদম্ভে ঘোষণা দিলো যে, তারা সকলেই উসমানের হত্যাকারী। সুতরাং যারা কিসাস নিতে চায় তারা যেন তাদের সকলের নিকট হতে কিসাস গ্রহণ করে। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২৪]

যারা হযরত আলী (রা)-এর নিকট কিসাস জারি করার দাবি জানাতো তাদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, "দেখ, তোমরা যা জানো আমি সে বিষয়ে অজ্ঞ নই। কিন্তু (সুসংগঠিত) 'জনদল' সম্পর্কে আমি কি করতে পারি যারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, অথচ আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না?"

তদুপরি দেখো না, তাদের সঙ্গে তোমাদের দাসরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং তোমাদের বেদুঈনরাও তাদের দলে ভিড়েছে। প্রকাশ্যেই তোমাদেরকে তারা ইচ্ছামতো হেনস্তা করছে; এমতাবস্থায় তোমরা কি মনে করো, তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর করার মতো কোন সুযোগ তোমাদের রয়েছে? [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২৪]

"বরং উসমান (রা)-এর কিসাসের দাবিদাররা যদি হত্যার প্রতিশোধ ও কিসাস গ্রহণের সহজতম পন্থা অনুসরণ করতো তাহলে তা ছিলো, (বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত) আমীরকে তারা শক্তি সমর্থন যোগাতো, যাতে তিনি কিসাস জারি করতে সক্ষম হন। অতঃপর শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় ইনসাফের সাথে তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করতো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯২৪]

হাফেয ইব্ন হাজার (র) বলেন, আলী (রা)-এর অবস্থান এই ছিলো যে, প্রতিপক্ষ লোকেরা প্রথমে আনুগত্য গ্রহণ করুক, অতঃপর উসমানের রক্তের বৈধ দাবিদাররা তাঁর নিকট কিসাসের দাবি উত্থাপন করুক! তখন তিনি শরীয়তের হুকুম মুতাবিক ফায়সালা জারি করবেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষ এই বলে দাবি জানাচ্ছিলো, আপনি তাদের খুঁজে বের করুন এবং হত্যা করুন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, দাবি উত্থাপন ও প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়া কিসাস বৈধ নয়। মূলত উভয় পক্ষই ছিলেন মুজতাহিদ। [আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৮]

সাহাবা-কিরামের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ লড়াইয়ের কোন পক্ষেই ছিলেন না, তবে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গিয়ে ছিলো যে, হযরত আলী (রা)-ই নির্ভুল অবস্থানের ওপর আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্, দীর্ঘ মতবিরোধের পর আহলে সুন্নাত এ সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হয়ে গেছেন। [প্রাগুক্ত]

মতবিরোধের সূচনা ও উষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আলী (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ যখন সম্পন্ন হলো তখন হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-সহ কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবা (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে হযরত উসমান (রা)-এর কিসাস গ্রহণের ও হদ্দ কায়েম করার দাবি জানালেন। তখন তিনি এই বলে অপারকতা প্রকাশ করলেন যে, এরা যথেষ্ট লোকবলের অধিকারী। ফলে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৮]

তাবাকাতুল কোবরা গ্রন্থে ইবনে সা'দ (রা) হযরত আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবা-কিরামের নাম উল্লেখ করার পর ও মদীনায়

অবস্থানকারী সকল সাহাবী ও তাবেয়ীর বায়'আত গ্রহণ প্রসঙ্গ আলোচনার পর বলেন, হযরত তালহা ও যুবায়র (রা) মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন (হজ্জ উপলক্ষে) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা)-কে সঙ্গে করে হযরত উসমান (রা)-এর কিসাসের দাবিতে বসরা অভিমুখে যাত্রা করলেন। হযরত আলী (রা) এ সংবাদ অবগত হয়ে মদীনা হতে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং হযরত সাহল ইব্‌ন হানীফ (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু পরে পত্রযোগে তাঁকেও তলব করে পাঠালেন এবং আবূ হাসান আমীনীকে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী নিযুক্ত করলেন।

অতঃপর যীকার অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে কুফায় এই মর্মে বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, কূফাবাসী যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেয়। পরে কূফাবাসী তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিল। তখন তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে বসরার উদ্দেশে যাত্রা করলেন এবং হযরত তালহা যুবায়র ও আয়েশা (রা)-এর ডাকে বসরা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সমবেত বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। ছত্রিশ হিজরীর জুমাদাল আখিরায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো যা "উষ্ট্রের যুদ্ধ" নামে খ্যাতি লাভ করেছে। যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর জয় হলো। উভয় পক্ষের শহীদদের সংখ্যা ছিলো তের হাজার মতান্তরে দশ হাজার। বসরায় হযরত আলী (রা) পনের রাত অবস্থান করে কূফায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

যুদ্ধের শুরু হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ হতে ছিলো না, বরং প্রতিপক্ষ লড়াই শুরু করার পরই তিনি অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

ইমাম তাহাবী (রা) নিজস্ব সনদে হযরত সায়দ ইব্‌ন ওয়াহাব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) অভিযান পরিচালনা করে যীকার অঞ্চলে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং কূফাবাসীকে অভিযানে যোগদানের বার্তাসহ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে পাঠালেন। কিন্তু কূফাবাসী বিলম্ব করেন। অতঃপর হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) তাদেরকে আহ্বান জানালেন। তখন তারা অভিযানে শরীক হলো। আমিও হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীতে শামিল ছিলাম। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) তালহা, যুবায়র (রা) ও তাঁদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বিরত থাকলো, এমন কি তারাই তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলো। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন।

হযরত আলী (রা)-এর পক্ষের কোন কোন যোদ্ধা আলী (রা)-এর নিকট তালহা, যুবায়র ও তাঁদের অনুগামীদের সম্পদ (গণীমত)-রূপে তাদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার দাবি জানালো, কিন্তু তিনি তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তাকে 'সাবাঈ' বলে অপবাদ দেয়া হলো। তারা যুক্তি দেখালো, তাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল হলে তাদের সম্পদ কেন আমাদের জন্য হালাল হবে না। হযরত আলী (রা) তাদের বক্তব্য জানতে পেরে বললেন, তোমাদের কে রাজী আছো যে, উম্মুল মু'মিনীন তাঁর ভাগে পড়ুন? তখন প্রতিবাদী লোকেরা নীরব হলো। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫]

কুফায় খিলাফত কেন্দ্রের স্থানান্তর

হযরত আলী (রা) ইরাকের কুফা শহরকে তাঁর খিলাফতের কেন্দ্র ও রাজধানীরূপে গ্রহণ করলেন। কুফাকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাবতীয় সামরিক কার্যক্রম, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হতো।

এখানে পাঠক হয়তো বা প্রশ্ন করবেন, আমীরুল মু'মিনীন তাঁর অবস্থানস্থল হিসেবে কুফাকে কেন অগ্রাধিকার প্রদান করলেন এবং বিশ্ব ইসলামী খিলাফাতের রাজধানীরূপে মনোনীত করলেন? অথচ হিজরতের পর থেকে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাত পর্যন্ত মদীনাতুর রাসূলই ইসলামী শাসনের প্রাণকেন্দ্ররূপে চলে এসেছিলো! আমার মনে হয়, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় শহর ও হিজরত ভূমিকে মুসলমানদের সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ ও সামরিক সংঘাত সংঘর্ষের কলঙ্ক থেকে রক্ষার উদ্দেশেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় হারাম, মসজিদে নববী ও রাওযাতুর রাসূল-এর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের এটাই ছিলো স্বাভাবিক দাবি। আর হযরত আলী (রা)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তি এ বিষয়ে অতি সচেতন ও সংবেদনশীল হবেন এটাই তো স্বাভাবিক! পরবর্তীতে ইয়াযীদের যুগে 'হাররায়' যে হৃদয়বিদারক ও রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে ছিলো সেজন্য মুসলিম উম্মাহকে হাজারবার আক্ষেপ করতে হয়েছিলো, যা এখনো ইসলামের ইতিহাসের এক কলঙ্কতিলক হয়ে আছে। আর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গৃহবিবাদের নাযুক অবস্থায় যে কোন কিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়।

বিদগ্ধ গবেষক আল আক্কাদ অবশ্য এর পেছনে ভৌগোলিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) কুফাকে মনোনীত করেছিলেন যা ইসলামী সালতানাতের ঐ সময় পর্বে বিশ্ব ইসলামী ইমামতের জন্য সর্বোত্তম রাজধানীরূপে প্রমাণিত হয়েছিলো। কেননা কুফা ছিলো তখন সকল জাতির মিলন ক্ষেত্র এবং ভারত, পারস্য, ইয়ামান, ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্যের সেতুবন্ধন। তদুপরি কুফা ছিলো

আরবীয় সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র, যেখানে ভাষা, সাহিত্য, কিরাত, বংশবিদ্যা, বিভিন্ন ধারার কাব্য চর্চা ও বর্ণনাবিদ্যার প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো। সুতরাং একজন ইমামের শাসন পরিচালনার জন্য কুফাই ছিলো সে যুগের যোগ্যতম রাজধানী। [আল আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯৫২]

হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি হযরত আলী (রা)-এর সম্মান প্রদর্শন

হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি হযরত আলী (রা)-এর আচরণ ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত আলী (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন। পুরুষদের একটি জামাতকে ও বসরার সম্ভ্রান্ত চল্লিশজন স্ত্রীলোককে তাঁর সফরসঙ্গী করে দিলেন এবং তাঁকে বার হাজার দিরহাম প্রদানের আদেশ জারি করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর নিকট তা অল্প মনে হওয়ায় তিনি তাঁর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন, আমীরুল মুমিনীন অনুমোদন না করলে এটা আমার যিম্মায় থাকবে। তীরের সামান্য একটু আঁচড় লেগে ছিলো তাঁর। সফরের যাত্রার দিন আলী (রা) তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। লোক সমাগমও ছিলো। তিনি সকলকে বিদায় জানিয়ে বললেন, "হে বৎসগণ! আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার না করি। আল্লাহ্র শপথ! আমার ও আলীর মাঝে শুরু থেকেই কোন কিছু ছিলো না, তবে এক স্ত্রীলোক ও তাঁর শ্বশুরকুলের মাঝে স্বাভাবিকভাবে যা হয়ে থাকে। আমার সাথে বিরোধিতা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তিনি উত্তম ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত।

আলী (রা) তখন বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি সত্য বলেছেন, আমার ও তাঁর মাঝে এ ছাড়া আর কিছু ছিলো না। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের নবীর সহধর্মিণী।

হযরত আলী (রা) তাঁকে বিদায় জানাতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাইল চললেন এবং তাঁর পুত্রদ্বয়কে অবশিষ্ট দিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে বললেন। তাঁর যাত্রার তারিখ ৩৬ হিজরীর রজব মাসের প্রথম শনিবার।

[প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭]

হযরত আয়েশা (রা)-এর অনুশোচনা সম্পর্কিত বহু রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। প্রায়শ তিনি বলতেন, "হায়! ইয়াওমুল জামালের পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু হতো!"

আরো বর্ণিত আছে, জামাল যুদ্ধের দিনটির স্মরণ হলেই তিনি কেঁদে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন।

যুদ্ধশেষে আলী (রা) নিহতদের দেখতে বের হলেন। যখন বসরাবাসী কোন নিহত ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পেতেন বিষণ্ন কণ্ঠে তিনি বলতেন, মানুষের ধারণা যে, তাদের সাথে নির্বোধ ও অপদার্থরাই শুধু যোগ দিয়েছিলো, অথচ এই দেখ, অমুক, অমুক। অতঃপর তিনি নিহতদের জানাযা পড়ালেন এবং তাদেরকে দাফন করার আদেশ করলেন।

জামাল যুদ্ধের দিন যুবায়র (রা) তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ফিরে চললেন এবং "ওয়াদি সিবা" নামক এক উপত্যকায় যাত্রা বিরতি করলেন। আমর ইব্‌ন জুরমূস নামক এক ব্যক্তি তাঁর পিছু নিয়েছিলো। সে তাকে এখানে এসে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলো এবং সে অবস্থায়ই তাঁকে হত্যা করলো।

পক্ষান্তরে হযরত তালহা (রা) একটি অজ্ঞাত তীরের আঘাতে জখমী হলেন। ফলে অব্যাহতভাবে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগলো। এ অবস্থায় তিনি বসরার একটি গৃহে এসে উঠলেন এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করলেন। আল্লাহ্ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪২]

কথিত আছে, তালহা যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আলী (রা) নিহতদের মাঝে চক্কর দিতে গিয়ে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলের ধুলোবালি মুছে দিতে দিতে বলেছিলেন, "হে আবূ মুহাম্মদ! তোমার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন! নক্ষত্ররাজি পরিপূর্ণ খোলা আকাশের নীচে এভাবে তোমাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা আমার জন্য বড় কঠিন।" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র কাছেই আমি আমার অসহায় অবস্থার অনুযোগ পেশ করছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আজকের এ দিনের বিশ বছর আগে আমার মৃত্যু হলে আমি খুশী হতাম।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮]

এদিকে হযরত যুবায়র (রা)-এর হত্যাকারী আমর ইব্‌ন জুরমূস তাঁর কর্তিত মস্তকসহ আলী (রা)-এর নিকটে গিয়ে হাযির হলো। তার ধারণা ছিলো যে, এই কর্তিত মস্তকের কারণে তাঁর নিকট তার আদরকদর হবে। তাই সে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলো। কিন্তু আলী (রা) সোজা বলে দিলেন, তাকে অনুমতি না দিয়ে বরং জাহান্নামের সংবাদ শুনিয়ে দাও।

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, আলী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, بشر قاتل ابن صفية بالنار (সাফিয়্যার পুত্রের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ দাও। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫০]

সাহাবা অন্তর্বিরোধ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সাহাবা-কিরামের এ সকল মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যা কখনো কখনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে এখানে এ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ পর্যালোচনা পেশ করা জরুরী মনে করি। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ও তার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও ইতিবাচক বিচার-বিশ্লেষণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা একথা প্রমাণিত করে যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি চিন্তা না করে, কৈফিয়ত ও সীমাবদ্ধতার বিষয় বিবেচনা না করে এবং ঘটনার দায়-দায়িত্ব যাঁরা বহন করেছেন এবং বিপদ-দুর্যোগের অগ্নি-সমুদ্র যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন তাদের নীতি ও অবস্থানের ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ মূল্যায়ন ছাড়া ত্বরিত ও চূড়ান্ত কোন রায় ঘোষণা করা এবং নমনীয়তা ও সহৃদয়তার যাবতীয় অনুভূতি জলাঞ্জলি দিয়ে একতরফা যেমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক নয়, তদ্রূপ যে জটিল ও নাযুক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এ সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং মতবিরোধ ও সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে সেগুলো উপলব্ধি না করে পক্ষ-প্রতিপক্ষ কারো সম্পর্কেই হঠাৎ করে এমন কথা বলে দেয়া উচিত নয় যে, তারা ভ্রষ্ট ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ছিলেন কিংবা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দুনিয়ামুখী ছিলেন।

কেননা অনেক সময় দেখা যায়, স্থান ও কালের দিক থেকে অতি নিকটের ঘটনাবলীর কারণ ও কার্যকারণ বুঝে ওঠাও আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে। ফলে উভয় পক্ষ সম্পর্কে কিংবা কোন এক পক্ষ সম্পর্কে আমরা ভুল সিদ্ধান্ত ও অন্যায় ফায়সালা গ্রহণ করে বসি। কেননা ঘটনার পরিবেশ-পরিস্থিতি, অনুঘটক ও কার্যকারণসমূহের স্বভাব-প্রকৃতি আমাদের জানা থাকে না। যাঁরা নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন তাদের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা, গুণ, বৈশিষ্ট্য, অতীত দীনী ও জিহাদী অবদান আমাদের বিবেচনায় থাকে না। তদ্রূপ কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাঁদের সামনে ছিলো তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকে না। ইয়াওমুল জামালের মর্মান্তিক যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে এ অবস্থাই হয়েছে। এক পক্ষ হযরত উসমান (রা)-এর কিসাসের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। অন্য পক্ষ আলোচ্য দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেও বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা কার্যকর করতে অপরাকতা প্রকাশ করছিলেন। এটা ছিলো আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর অবস্থান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন, অথচ তাঁর মন্তব্য শুনুন।

আবুল বুখতারীর সূত্রে আবূ বকর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি মুশরিক? তিনি বললেন, শিরক থেকেই তো তারা পলায়ন করে এসেছেন! জিজ্ঞেস করা হলো তাহলে কি তারা মুনাফিক? তিনি বললেন, মুনাফিকরা তো অতি অল্পই আল্লাহ্র যিকির করে থাকে! জিজ্ঞেস করা হলো তাহলে এদের পরিচয় কি? তিনি বললেন, এঁরা আমাদের ভাই; আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

তিনি আরও বললেন, আমি আশা করি, আমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ.

"আমি তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করে দেবো, তারা ভাই ভাইরূপে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে অবস্থান করবে।" [সূরা হিজর : ৪৭]

এ মহান ব্যক্তিবর্গের অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের পূর্ব মতামত থেকে রুজু করে অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। যেমন ইতিপূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে আমরা বর্ণনা করেছি। আবূ বকর ও অন্যদের সূত্রে হযরত যুবায়র (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তদ্রূপ ইমাম হাকিম (রা) হযরত সাওর ইব্ন মাজযাত (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জামাল যুদ্ধের দিন আমি তালহা (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মতো অবস্থায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ পক্ষের লোক? আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর পক্ষের লোক। তিনি বললেন, হাত বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার হাতে বায়'আত হবো। তখন আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম আর তিনি আমার (মাধ্যমে আলী (রা)-এর হাতে) বায়'আত হলেন এবং প্রাণত্যাগ করলেন। পরে আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আমি বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্যই বলেছেন। তালহা আপন স্কন্ধে আমার বায়'আত না নিয়ে জান্নাতে যাবেন, আল্লাহ্ এটা অপছন্দ করেছেন।"

[ইযালাতুল খাফা কৃত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (র), পৃষ্ঠা-২৮০]

দার্শনিক ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন (র) এ সকল অন্তর্বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-সংঘর্ষ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি ও ন্যায়ানুগতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থে লিখেছেন :

"নিজেকে ও নিজের জিহ্বাকে তাদের যে কারো সমালোচনায় অভ্যস্ত করার ব্যাপারে সতর্ক থেকো এবং তাঁদের কোন কার্যকলাপ সম্পর্কে দ্বিধাসংশয় দ্বারা আপন হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করো না, বরং তাদের পক্ষে সত্যের বিভিন্ন পথ ও পন্থা যথাসম্ভব অন্বেষণ করো। কেননা তাঁরা এ আচরণের অধিক হকদার। যুক্তি প্রমাণ ছাড়া তাঁরা মতবিরোধ করেন নি। হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে জিহাদের পথেই তাঁরা লড়েছেন এবং জীবন দিয়েছেন। সেই সাথে এ বিশ্বাসও রেখো যে, তাঁদের মতবিরোধ পরবর্তী উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ, যাতে প্রত্যেকে তাঁদের মধ্য হতে কাউকে নির্বাচন করে তাঁর অনুসরণ করতে পারে এবং ইমাম ও পথপ্রদর্শক-রূপে তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা কর এবং মানব সমাজে ও বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র হিকমত ও নিগূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করো।" [মুকাদ্দিমা, ইবন খালদূন, পৃষ্ঠা-১৭২]

তিনি আরো বলেন, উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর ফিতনার দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তবে যা কিছু ঘটে গিয়েছে সে সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কৈফিয়ত রয়েছে। দীনের বিষয়ে তাঁরা সকলেই ছিলেন অতীব যত্নবান। দীন সম্পর্কিত কোন কিছুই তাঁরা নষ্ট হতে দিতেন না। আসলে এ ঘটনার পর চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদের মাধ্যমেই তাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অন্তর্গত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত ও পরিজ্ঞাত আছেন। আমরা তাঁদের সম্পর্কে ভালো ধারণাই শুধু পোষণ করবো। কেননা তাঁদের সামগ্রিক অবস্থা ও তাঁদের সম্পর্কে সত্য নবীর সত্য বাণী সেটাই প্রমাণিত করে। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১]

তিনি আরো বলেন, যদিও হযরত আলী (রা)-এর অবস্থান ছিলো নির্ভুল কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর পদক্ষেপও বাতিল এর উদ্দেশে ছিলো না, বরং তিনি সত্যের ইচ্ছা করেছেন কিন্তু ভুলের শিকার হয়েছেন। নিজ নিজ উদ্দেশে সকলেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অতঃপর রাজত্বের স্বভাব দাবিই হলো একক গৌরব ও একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। আর আপন গোত্র ও আপন সত্তা থেকে এ স্বভাবপ্রবণতা দূর করা মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কেননা এটা ছিলো এক স্বভাবজাত বিষয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্বভাগতভাবেই টেনে এনে ছিলো এবং বনূ উমাইয়া গোত্র তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিলো ফুটন্ত পানির 'টগবগানি'র মতো, যা হঠাৎ টগবগিয়ে আবার শান্ত-স্থির হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া

(রা)-এর যুদ্ধ ছিলো দু'টি সমান্তরাল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংগ্রাম এবং দু'টি শক্তিশালী সামরিক শিবিরের সংঘাত। সে আলোচনা বড় দীর্ঘ। এখানে আমরা সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করবো।

আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর সংঘাত

৩৬ হিজরী সনের আগমন হলো। ইতিমধ্যে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন শহরে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। সিরিয়াতে তিনি মুআবিয়া (রা)-এর পরিবর্তে সাহল ইব্ন হুনাইফ (রা)-কে প্রশাসক নিয়োগ করলেন। তিনি সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে তাবূকে উপনীত হলেন এবং সেখানে মু'আবিয়া (রা)-এর অশ্ব দলের মুখোমুখি হলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? তিনি বললেন, সিরিয়ার প্রশাসক। তারা বললো, যদি উসমান তোমাকে প্রেরণ করে থাকেন তাহলে স্বাগতম। কিন্তু অন্য কেউ হলে ফিরে যাও। তিনি বললেন, যা ঘটে গেছে তা কি তোমরা শোনো নি। তারা বললো, অবশ্যই শুনেছি। তখন তিনি আলী (রা)-এর নিকট ফিরে গেলেন।

মু'আবিয়া (রা) আলী (রা)-এর নিকট দূত প্রেরণ করলেন। তিনি দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এসেছো? দূত বললেন, এমন এক কাওমের কাছ থেকে আমি এসেছি যারা নেতৃত্ব ছাড়া আর কিছু চায় না। রক্তের বদলা না পাওয়ায় তারা সবাই ক্ষিপ্ত। সত্তর হাজার বিশিষ্ট লোককে আমি উসমানের ঝুলন্ত কুর্তার নীচে বিলাপরত অবস্থায় রেখে এসেছি।

তখন আলী (রা) দামেস্কের মিম্বরে বললেন, "হে আল্লাহ্! উসমানের রক্তের ব্যাপারে তোমার কাছে আমি আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করছি।"

অতঃপর আলী (রা) সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে মানুষকে যুদ্ধযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং যুদ্ধ আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করলেন। অবশেষে কাসাম ইব্ন আব্বাসকে মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী করে তিনি যাত্রা করলেন। তাঁর পূর্ণ প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যারা আনুগত্য বর্জন করে তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে এবং অন্য সকলের সাথে তার বায়'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, অনুগত বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে তিনি সুপথে ফিরিয়ে আনবেন। তখন তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা) তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, সম্মানিত

পিতা, এটা ত্যাগ করুন। কেননা এতে করে মুসলমানদের রক্তপাত হবে এবং তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি তাঁর আবেদন না-মঞ্জুর করে লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকলেন, বাহিনী বিন্যস্ত করলেন এবং কাসাম ইব্‌ন আব্বাসকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এরপর সিরিয়া অভিমুখে মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার আর কোন প্রস্তুতি অবশিষ্ট থাকলো না। কিন্তু তখনই সেই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো যা তাঁকে এসব কিছু থেকে ফিরিয়ে দিলো।

উষ্ট্রের যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়ার পর আলী (রা) বসরায় প্রবেশ করলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে মক্কার উদ্দেশে বিদায় জানালেন। অতঃপর বসরা হতে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং ৩৬ হিজরীর ১২ রজব রোজ সোমবার কুফায় প্রবেশ করলেন। তাঁকে কাসর আবওয়াত (শ্বেত প্রাসাদ)-এ অবস্থানের অনুরোধ করা হলো। কিন্তু তিনি অসম্মতি জানিয়ে বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব সেখানে অবস্থান করা অপছন্দ করতেন, সে কারণে আমিও তা অপছন্দ করি।

তিনি 'রাহ্‌বা'-এ অবস্থান করলেন। জামে আযম মসজিদে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সমবেত লোকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তাদেরকে সৎ কর্মে উৎসাহিত করলেন এবং মন্দ কর্মে নিষেধ করলেন।

হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহকে তিনি পত্রসহ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিলোএরূপঃ

"আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর হাতে যেসব লোক বায়'আত হয়ে ছিলো এবং যে বিষয়ের ওপর বায়'আত হয়ে ছিলো তারাই আমার হাতে সেই বিষয়ের ওপর বায়'আত হয়েছে। সুতরাং এখন উপস্থিত ব্যক্তির কোন ইখতিয়ার নেই এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই। শূরা (পরামর্শ) আনসার ও মুহাজিরগণের মাঝে সীমাবদ্ধ। তারা যদি কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হন এবং তাঁকে 'ইমাম' বলে অভিহিত করেন তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সন্তুষ্টির পরিচায়ক। এরপর যদি কোন ব্যক্তি কোন অপবাদ কিংবা বিদ'আতের আশ্রয় নিয়ে তাদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় তবে তারা তাকে তাতে ফিরিয়ে আনবেন। যদি সে অস্বীকার করে তবে মুসলমানদের থেকে ভিন্ন পথ গ্রহণের অপরাধে তার বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করবেন।"

[নাহজুল বালাগা, পৃষ্ঠা-৩৬৬-৩৬৭]

সিফ্‌ফীন যুদ্ধ

সিরিয়ায় প্রবেশের উদ্দেশে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) কূফা থেকে রওয়ানা হলেন। স্বয়ং হযরত আলী (রা)-এর অভিযানে রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে মু'আবিয়া (রা) সিরিয়ার সকল বাহিনীকে তলব করে জড়ো করলেন এবং সেনানায়কদের হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। এভাবে সিরিয়াবাসী যুদ্ধযাত্রার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলো এবং ফুরাতের সিফ্‌ফীন অঞ্চলের উদ্দেশে যাত্রা করলো। কেননা এ পথ দিয়েই আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর আগমনের কথা ছিলো।

এদিকে আলী (রা) সৈন্যবাহিনীসহ সিরিয়ার উদ্দেশে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং আশতার নাখয়ীকে আমীররূপে অগ্রে প্রেরণ করলেন। তবে তাকে নির্দেশ দিলেন, লড়াইয়ের উদ্দেশে সিরীয়দের দিকে এগিয়ে যাবে না যতক্ষণ না তারা লড়াই শুরু করে। তবে তাদেরকে বারবার বায়'আত গ্রহণের আহ্বান জানাবে। যদি তারা অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাদের দিক থেকে লড়াই শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ওপর হামলা করবে না এবং তাদের এতটা নিকটবর্তী হবে না, যাতে যুদ্ধ-ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। আবার এতটা দূরেও অবস্থান করবে না যাতে যুদ্ধভীতি প্রকাশ পায়। আর আমি এসে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অবিচল থাকবে। ইনশাআল্লাহ্, আমি তোমার পেছনে দ্রুত গতিতেই আসছি।

আশতার নাখয়ী তাঁর অগ্রগামী দলসহ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে আলী (রা)-এর নির্দেশ মুতাবিক কাজ করলেন। তাঁর ও মু'আবিয়া (রা)-এর অগ্রগামী বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়ালো এবং অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে অবস্থান বজায় রাখলেন। সূর্যাস্তের সময় সিরীয়রা শিবিরে ফিরে গেলো। পরবর্তী দিনও উভয় পক্ষ একইভাবে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং অবিচল ধৈর্যের সঙ্গে অবস্থান বজায় রাখলো। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ অবশ্য হলো কিন্তু দ্বিতীয় দিনের রাত ঘনিয়ে আসায় উভয় পক্ষ যুদ্ধ এড়িয়ে গেলো। তৃতীয় দিন ভোরে আলী (রা) তাঁর বাহিনীসহ উপস্থিত হলেন, অন্যদিকে মু'আবিয়া (রা) তাঁর লশকর নিয়ে হাযির হলেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো এবং মুকাবিলা শুরু হলো। যুদ্ধ পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে তীব্র আকার ধারণ করলো। সিরীয়রা ফোরাতের পানি দখল করে ইরাকীদেরকে পানি সংগ্রহে বাধা প্রদান করছিলো। কিন্তু ইরাকীরা সিরীয়দেরকে পানির অবস্থান থেকে হটিয়ে দিতে শুরু করলো। তখন উভয় পক্ষে ফোরাতে পানি

সংগ্রহের ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হলো, কেউ কাউকে বাধা প্রদান করবে না। আলী (রা) নির্দেশ জারি করলেন, সিরীয়দের পানি সংগ্রহে যেন বাধা দেয়া না হয়। ফলে সকলে অবাধে পানি পান করতে সক্ষম হলো।

আলী (রা) তাঁর কতিপয় সাথীকে ডেকে বললেন, এই লোকটির নিকট যাও এবং তাকে আনুগত্য গ্রহণ করার ও জামাতভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাও আর দেখ সে কি বলে।

কিন্তু মু'আবিয়া (রা) হযরত উসমান (রা) মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছেন বলে তাঁর রক্তের কিসাসের দাবিতে অটল রইলেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলতে লাগলো, এমন কি দিনে দু'বার করেও যুদ্ধ হলো। যিলহজ্জ মাস শেষে যখন মুহররম শুরু হলো তখন এই আশাবাদসহ যুদ্ধ বিরতির আওয়াজ উঠলো যে, হয়তো আল্লাহ্ তাদের মাঝে এমন কোন বিষয়ে সমঝোতা করে দেবেন যাতে তাদের রক্তপাত বন্ধ হতে পারে।

যুদ্ধ বিরতি অবস্থায় হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মাঝে দূত বিনিময় হতে লাগলো। কিন্তু বর্তমান বছরের মুহররম মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মাঝে সমঝোতা হলো না। তখন মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা) ডান-বাম বিন্যস্ত করে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করলেন। অন্যদিকে আলী (রা)-ও তাঁর বাহিনী মোতায়েন করলেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন। সিরীয়রা লড়াই শুরু করার আগ পর্যন্ত কেউ যেন হামলা না করে। তদ্রূপ কোন জখমীকে যেন হত্যা না করা হয় এবং কোন পিছপা ব্যক্তির যেন পিছু না নেয়া হয় এবং কোন স্ত্রীলোককে যেন বিবস্ত্র কিংবা অপদস্থ না করা হয়, যদিও সে তাদের সৎ ও নেতৃস্থানীয় লোকদের গালমন্দ করে।

উভয় পক্ষ সেদিন ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং দিন শেষে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলো। দু'দিন যুদ্ধের পরও উভয় পক্ষের অবস্থা সমান সমান ছিলো। তৃতীয় দিন শিবির থেকে বের হয়ে তারা ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং সূর্যাস্তের সময় যথারীতি শিবিরে ফিরে গেলো। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনেও একই অবস্থা হলো। এভাবে সপ্তম দিন শুরু হলো। এসব দিনে কোন পক্ষই কোন পক্ষকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলো না। তখন সিরীয়রা মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে মৃত্যুর বায়'আত গ্রহণ করলো। অন্যদিকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অবিচল ধৈর্যের আহ্বান জানালেন। আশতার নাখয়ী এমন সফল আক্রমণ চালালেন যে, মু'আবিয়া (রা)-কে বেষ্টন

করে দাঁড়ানো পাঁচটি সারির সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো, যারা কোন অবস্থাতেই পলায়ন না করার শপথ গ্রহণ করেছিলো। ইরাকীরা পেছনে সরে পুনরায় সুশৃঙ্খল হলো এবং যুদ্ধের চাকা পুরোদমে সচল হলো আর ইরাকীরা সিরীয় বাহিনীর কাতার তছনছ করে দিতে লাগলো। এমন সময় আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) সিরীয়দের হাতে শহীদ হলেন। ইব্ন কাছীরের মতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, হযরত আলী (রা) হক ও সঠিক অবস্থানে আছেন।

শুক্রবার ভোর পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থা অপরিবর্তিত থাকলো, এমন কি লড়াই চলা অবস্থায় আলী (রা) ইশারায় ফজরের নামায পড়ালেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বিজয়ের পাল্লা সিরীয়দের প্রতিকূলে ও ইরাকীদের অনুকূলে ঝুঁকতে লাগলো, এমন কি সিরীয় বাহিনীর পরাজয় আসন্ন হয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে সিরীয়রা বর্শার অগ্রভাগে কুরআন শরীফ উত্তোলন করে আওয়াজ তুললো, এই কুরআন হলো আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফায়সালাকারী। (দেখো, উভয় পক্ষের) লোকবল ক্ষয় হয়ে চলেছে, তাহলে কারা সীমান্ত রক্ষা করবে এবং মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদই বা কারা করবে?

[আল ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৩]

কুরআন শরীফ উত্তোলন করা দেখে ইরাকীরা বলতে লাগলো, আমরা অবনত মস্তকে কিতাবুল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেব। মিসআর ইব্ন কাদাকী, তামীমী ও যায়দ ইব্ন হুসাইন তাঈ (পরবর্তীতে সাবাঈ মতবাদ গ্রহণকারী) তারা উভয়ে পরবর্তীতে খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত একদল 'ক্বারীকে' দলে ভিড়িয়ে হযরত আলী (রা)-কে এই বলে হুমকি দিলো,

"হে আলী, কিতাবুল্লাহ্‌র দিকে তোমাকে ডাকা হয়েছে। সুতরাং সে ডাকে সাড়া দাও, নইলে দলবলসহ তোমাকে শত্রুদের মুখে ঠেলে দেব, কিংবা আফ্‌ফানের পুত্র উসমানের সাথে যা করেছি তোমার সাথেও তাই করবো।"

আলী (রা) বললেন, আচ্ছা, তোমাদের প্রতি আমার নিষেধের কথা মনে রেখো, আর আমাকে তোমরা যে কথা বললে তাও স্মরণ রেখো। যদি আমাকে মান্য করতে চাও তাহলে লড়াই চালিয়ে যাও, আর যদি আমার অবাধ্যই হতে চাও তাহলে যা ইচ্ছা হয় করো।

আশতার নাখয়ীও তাদের অনেক উপদেশ দিলেন এবং যুক্তি দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা নিবৃত্ত হলো না।

ইরাকীদের অধিকাংশ ও সিরীয়দের সর্বাংশ সমঝোতা ও যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলো। ফলে দীর্ঘ পত্র-বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার পর উভয় পক্ষ সালিসী ব্যবস্থায় সম্মত হলো অর্থাৎ আলী ও মু'আবিয়া (রা) উভয়ে নিজ নিজ পক্ষে একজন করে সালিস নিযুক্ত করবেন। অতঃপর উভয় সালিস মুসলমানদের জন্য যা কল্যাণকর সে বিষয়ে একমত হবেন (এবং উভয় পক্ষ তা মেনে নেবেন)। এজন্য হযরত মু'আবিয়া (রা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে উকিল নিযুক্ত করলেন। হযরত আলী (রা)-এর অভিপ্রায় ছিলো আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে মনোনীত করার। কিন্তু সেই ক্বারীদল বাধ সেধে বললো, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ছাড়া আর কারো ব্যাপারে আমরা রাজী নই।

মীমাংসা

দূতগণ আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো। তিনি তখন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিরিবিলি জীবন যাপন করছিলেন। যখন তাঁকে বলা হলো যে, উভয় পক্ষের লোকেরা সমঝোতায় উপনীত হয়েছে, তখন তিনি আনন্দিত চিত্তে বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ্। আবার বলা হলো আপনাকে মীমাংসাকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত করলেন। উভয় পক্ষে পত্র বিনিময় হলো, সালিসদ্বয় আলী ও মু'আবিয়া (রা) এবং উভয় সেনা শিবির হতে এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সালিসদ্বয় ও তাদের পরিবার-পরিজন সর্বাবস্থায় নিরাপদ থাকবেন এবং যে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করবেন তাতে উম্মাত তাদের সাহায্যকারী হবে।

খারিজীদের দলত্যাগ

আশ'আস ইব্‌ন কায়স বনী তামীম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে সালিস-বিষয়ক পত্র পড়ে শোনালেন। তখন উরওয়া ইব্‌ন ওয়ায়না তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে মানুষকে তোমরা বিচারক সাব্যস্ত করছো?

আলী (রা)-এর ক্বারী অনুগামীদের কতিপয় জামাত উরওয়া নামক এ লোকটির উপরোক্ত মন্তব্যকে নিজেদের প্রতীক ও শ্লোগানরূপে গ্রহণ করলো এবং আওয়ায তুললো, لا حكم الا الله "আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই।"

এই ছিলো প্রথম দলত্যাগ, যার ওপর ভিত্তি করে খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং উপরোক্ত সেশ্লাগানকে তারা সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও আকীদারূপে গ্রহণ করেছে।

আলী (রা) কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন। শহরে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর বাহিনীর প্রায় বার হাজার সৈন্য দলত্যাগ করলো। এরাই হলো খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা 'হারুরা' নামক এলাকায় জমায়েত হলো। তখন হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝালেন। ফলে তাদের অধিকাংশই ভুল স্বীকার করে প্রত্যাবর্তন করলো। অবশিষ্টরা আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। তারা এই মর্মে হযরত আলী (রা)-এর কঠোর সমালোচনা করলো যে, আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে মানুষকে তিনি বিচারক সাব্যস্ত করেছেন, অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই।

ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) একদিন ভাষণ প্রদান করছিলেন, তখন খারিজী সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, হে আলী, আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে মানুষকে তুমি অংশীদার করেছ, অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই। তখন চারদিক থেকে ধ্বনি উঠলো,

لا حكم الا الله . لا حكم الا الله

"আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই।"

তখন হযরত আলী (রা) বলতে লাগলেন, هذه كلمة حق يراد بها باطل "এটা ন্যায় কথা কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্যায়।"

এরপর তারা সদলবলে কুফা থেকে বের হয়ে গেলো এবং নাহরওয়ান অঞ্চলে সংঘবদ্ধ হলো। সালিসদ্বয় আবূ মূসা ও আমর ইবনুল আ'স দাওমাতুল জান্দাল এলাকায় রমযান মাসে বৈঠকে মিলিত হলেন। মুসলমানদের কল্যাণ বিষয়ে তাঁরা যুক্তিতর্ক করলেন এবং যাবতীয় বিষয় মূল্যায়ন করলেন। অতঃপর এ মর্মে উভয়ে একমত হলেন যে, হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রা) উভয়কে তারা অপসারিত করবেন। অতঃপর বিষয়টি মুসলমানদের শুরা বা পরামর্শের ওপর ন্যস্ত করবেন, তখন তারা সর্বোত্তম কল্যাণের ওপর একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) অবশ্য মু'আবিয়া (রা)-কে এককভাবে শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখার ব্যাপারে আবূ মূসা (রা)-কে সম্মত করাতে জোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নি। অতঃপর উভয়ে হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে যুগপৎ অপসারণপূর্বক বিষয়টি মুসলমানদের পরামর্শের ওপর ন্যস্ত করার ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হলেন যাতে তারা একমত হয়ে নিজেদের শাসক নির্বাচন করে নিতে পারে।

অতঃপর তারা লোকদের সমাবেশস্থলে উপস্থিত হলেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে বললেন, হে আবূ মূসা! উঠুন এবং জনসমাবেশের সামনে আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন। তখন হযরত আবূ মূসা (রা) বক্তব্য পেশ করতে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওপর দরূদ পাঠ করলেন, অতঃপর বললেন,

"হে লোক সকল! আমরা এই উম্মতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং যে সিদ্ধান্তে আমরা উভয়ে উপনীত হয়েছি উম্মতের জন্য তার চেয়ে উপযুক্ত কোন সমাধান আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আলী ও মু'আবিয়াকে আমরা অপসারিত করছি এবং বিষয়টি শুরা ও পরামর্শের ওপর ন্যস্ত করছি। উম্মত নিজে এই বিষয়টির সুরাহা করবে এবং নিজেদের জন্য তাদের পছন্দমতো শাসক নিযুক্ত করবে। সেই মতে আমি আলী ও মু'আবিয়া উভয়কে অপসারিত করছি।"

এই বলে হযরত আবূ মূসা (রা) সরে গেলেন। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) তাঁর স্থানে এসে দাঁড়ালেন এবং হামদ-ছানার পর বললেন,

ইনি যা বললেন তা তোমরা শুনেছো। তিনি তাঁর নেতাকে অপসারণ করেছেন, তাঁর মতো আমিও তাঁকে অপসারিত করছি, তবে আমি আমার নেতা মু'আবিয়াকে বহাল রাখছি। কেননা তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর অভিভাবক, তাঁর কিসাসের দাবিদার এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি।"

কথিত আছে, হযরত আবূ মূসা (রা) হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে তখন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন এবং হযরত আমর (রা)-ও একই ভাষায় পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রা)-এর সামনে পড়ার লজ্জায় মক্কা চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে খারিজী সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করলো এবং আলী (রা)-এর সমালোচনায় সীমালংঘন করে স্পষ্ট ভাষায় তারা তাঁর কুফরির ঘোষণা দিলো। এমন কি জনৈক নেতৃস্থানীয় খারিজী তাঁকে সম্বোধন করে বলে বসলো :

"হে আলী! আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে মানুষের বিচার পরিত্যাগ না করো তাহলে অবশ্যই আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করবো এবং এর মাধ্যমে আমি আল্লাহ্‌র রহম ও সন্তুষ্টির আশা করবো।"

খারিজীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহব রাসেদীর বাড়িতে সমবেত হলো। সে তাদের উদ্দেশে এক সারগর্ভ ভাষণ দান করলো এবং তাদের দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ, আখিরাত ও জান্নাতের প্রতি অনুরক্ত হতে উৎসাহিত করলো এবং তাদেরকে আমরু বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করলো। অতঃপর উদাত্ত আহবান জানিয়ে বললো, চলো ভাই সকল, জালিমদের এই জনপদ হতে বের করে এই পাহাড়ী জনপদে কিংবা এই দিকের কোন এক শহরে আমাদেরকে নিয়ে চলো। অতঃপর তারা আদায়েন দখল করে সেখানে সুরক্ষিত আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ে একমত হলো। অতঃপর তারা মা-বাবা ও ভাই-বোনের মায়া ত্যাগ করে এবং সকল আত্মীয়তা ছিন্ন করে কুফা শহর থেকে বেরিয়ে গেলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো এই ত্যাগ আসমান যমীনের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করবে। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭]

হযরত আলী (রা)-এর সালিসী প্রস্তাব গ্রহণ ও তাঁর প্রতি খারিজীদের অবিচার

খারিজী সম্প্রদায় ও তাদের উগ্রতাবাদী আকীদা বিশ্বাস ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা ও ইতিহাসভিত্তিক বিচার সমালোচনার পূর্বে হযরত আলী (রা)-এর অবস্থান ও সমস্যা সম্পর্কে গবেষক আল আক্কাদের মন্তব্যের অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, "সালিসী প্রস্তাব গ্রহণের 'অপরাধে' যারা আলী (রা)-এর সমালোচনায় মুখর হয়েছে তাদের 'ত্বরিত সমালোচনার বহর' দেখে আমাদের মনে হয় যে, তিনি যদি দৃঢ়ভাবে সালিস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তবে সেই প্রত্যাখ্যানের অপরাধেও তারাই আগ বাড়িয়ে তাঁর সমালোচনা করতো, অথচ সেটা করারও তার যুক্তিসংগত অধিকার ছিলো, অথচ তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ পরিত্যাগের মুখে ও আপন শিবিরে সালিসী প্রস্তাবের সমর্থক ও বিরোধীদের মাঝে সংঘর্ষের আশংকার মুখে অনন্যোপায় হয়েই তা মেনে নিয়েছিলেন।"

পক্ষান্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তাঁর সালিসী প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সঠিক কিন্তু আবূ মূসা 'আশ'আরী (রা)-এর দুর্বলচিত্ততা ও সিদ্ধান্তহীনতার স্বভাব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তকে ভুল আখ্যায়িত করে থাকেন, তারা আসলে ভুলে যান যে, সালিসী প্রস্তাব ও আবূ মূসা (রা)-এর নিযুক্তি দুটোই এক সাথে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন অর্থাৎ আবূ মূসা আশ'আরী বা আশতার নাখয়ী কিংবা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) যে-ই তাঁর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করুন না কেন, আমর ইবনুল আ'স (রা) তো কোনক্রমেই মু'আবিয়া (রা)-কে অপসারণ ও আলী (রা)-কে খিলাফতের দায়িত্বে বহাল রাখতে রাজী হতেন না। বেশির চেয়ে বেশি এই হতো যে, সালিসদ্বয় নিজ নিজ পক্ষের সমর্থনে সালিসী মজলিস ত্যাগ করতো এবং পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে যেতো।

সুতরাং এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আলী (রা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সমাধান গ্রহণ করেছিলেন সেটা তিনি ভুল মনে করেই গ্রহণ করে থাকুন কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল অভিন্ন হবে মনে করেই গ্রহণ করে থাকুন, সমালোচক ঐতিহাসিকদের নিকট এর চেয়ে উত্তম কোন সমাধান কিন্তু নেই।

[আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯২৫-৬]

খারিজী ও সাবাঈ সম্প্রদায়

বস্তুত হযরত আলী (রা) এক মহাঅগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একের পর এক অতি ভয়াবহ ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মুকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছিলো। এর পেছনে যে হিকমত ও নিগূঢ় রহস্য নিহিত ছিলো তা আল্লাহ্ই অধিক জানেন। তবে যে অনন্যসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন এবং মানবীয় প্রতিভার যে অভাবনীয় প্রকাশ তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বে ঘটে ছিলো এ যেন ছিলো আল্লাহ্প্রদত্ত সেই প্রতিভা-সম্পদের অবশ্যম্ভাবী 'যাকাত'। এখানে আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে আত্মপ্রকাশকারী দু'টি ভ্রান্ত ফেরকা– খারিজী ও সাবাঈ সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা জরুরী মনে করি।

খারিজী সম্প্রদায়

এ সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতিতে স্থূলবাদিতা, পরমতঅসহিষ্ণুতা, উগ্রবাদিতা ও স্ববিরোধিতা এমন বিমূর্ত হয়ে উঠে ছিলো যা বিগত ধর্মগুলোর কোন সম্প্রদায় কিংবা ইসলামের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশকারী কোন দলের মাঝে দেখা যায়নি।

খারিজী সম্প্রদায়ের মূল উৎস হলো হযরত আলী (রা)-এর সৈন্যবাহিনীর একটি বিদ্রোহী অংশ, যাদের অধিকাংশেই ছিলো বনী তামীম গোত্রীয়। এরা আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক সাব্যস্ত করার অভিযোগ এনে দলত্যাগ করেছিলো। তারা মনে করতো যে, সালিশ নিয়োগ ছিলো ভুল ও শরীয়তবিরোধী। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুম ও বিধান ছিলো সুস্পষ্ট, অথচ সালিস নিয়োগের অর্থ ছিলো এই যে, যুদ্ধরত উভয় পক্ষ যেন সন্দিহান হয়ে পড়লো যে, কোন্ পক্ষ সত্যের ওপর রয়েছে। তাদের হৃদয়ে আলোড়িত এ সকল চিন্তা ভাবনাকেই তারা لا حكم الا الله -এর মাধ্যমে ভাষা দান করেছিলো, যা এ চিন্তায় বিশ্বাসী সকলের মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে ছিলো এবং সর্বত্র তাতে বিপুল সাড়া পড়ে ছিলো যা উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচয়-প্রতীকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলো। অবশ্য তাদেরকে الشراة (বিক্রয়কারী দল) নামে আখ্যায়িত করা হতো। এ নাম নিম্নোক্ত আয়াত হতে গ্রহণ করা হয়েছিলো:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ ـ

"মানুষের মাঝে এক সম্প্রদায় এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে স্বীয় প্রাণ বিক্রয় করে দিয়েছে।"

আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যা নাহরোয়ান যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সে যুদ্ধে তাদেরকে তিনি পরাজিত করেছিলেন এবং বহু সংখ্যককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব ও চিন্তা-দর্শনকে তিনি নির্মূল করতে পারেন নি, বরং এ পরাজয় খারিজীদের অন্তরে আলী-বিদ্বেষ আরো বদ্ধমূল করে দিয়েছিলো। ফলে তাঁকে হত্যার এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত তারা গ্রহণ করে ছিলো এবং আবদুর রহমান ইব্ন মুলজিম খারিজীর হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

যদিও কিছু সংখ্যক মাওয়ালী খারিজী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলো, তা সত্ত্বেও খারিজী মতবাদ বহুল পরিমাণে ভাল ও মন্দ উভয় দিক থেকেই বেদুঈন প্রকৃতির ধারক ছিলো। যেমন কথায় কথায় তারা নেতৃস্থানীয়দের সাথে মতবিরোধ করতো এবং দলে-উপদলে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়তো। তারা ছিলো খুবই স্থূল দৃষ্টির অধিকারী ও অদূরদর্শী। প্রতিপক্ষের মতামতের ব্যাপারে তাদের চিন্তা ছিলো খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তারা ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহস ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী। কথায় ও কাজে ছিলো অতি স্পষ্টবাদী। আকীদা ও বিশ্বাসের জন্য জীবন বিসর্জন করা ছিলো তাদের কাছে অতি সহজ বিষয়।

খেজুর গাছের নীচে পড়ে থাকা একটি খেজুর খেতে তারা মালিকের অনুমতি নেয়া হয়নি বলে ইতস্তত করতো এবং মুখ থেকে থুথু করে ফেলে দিতো, অথচ মুসলমানদের রক্তপাতের ব্যাপারে ছিলো দ্বিধাহীন। তাদের চিন্তায় বিশ্বাসী নয়, শুধু এই 'অপরাধে' যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে তারা মোটেও কুণ্ঠিত হতো না। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজিম হযরত আলী ইব্‌নে আবূ তালিব (রা)-কে হত্যা করার পর দেখা গেলো, দিনরাত সে শুধু কুরআন তিলাওয়াত করছে। যখন তার জিহ্‌বা কেটে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হলো তখন সে অস্থির হয়ে গেলো। অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো, দুনিয়াতে আমি (কুরআন তিলাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে) মরে যাওয়া অপছন্দ করি।

আবূ হামদ আল খারিজী তাদের স্বভাব চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

شباب والله مكتهلون فى شبابهم غضيضة عن الشر اعينهم ثقيلة عن الباطل ارجلهم انضاء عبادة واطلاح شهر -

"যুবক, কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! যুবক বয়সেই তারা প্রবীণ। মন্দ থেকে তাদের দৃষ্টি অবনত। বাতিলের পথে তাদের পদদ্বয় অচল। ইবাদত ও রাত্রি জাগরণে তারা ক্লান্ত, শ্রান্ত।" [আল-কামিল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬]

সাবাঈ সম্প্রদায়

গবেষক আল আক্কাদ বলেন, সাবাঈ সম্প্রদায় হলো ইব্‌ন সওদা নামে খ্যাত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা-এর অনুসারী। সে ছিলো ইয়ামান দেশে জন্মগ্রহণকারী ও ইথিওপীয় রমণীর গর্ভজাত ইহুদী। সে ধর্মমতের কারণে যে খ্যাতি লাভ করেছে সেটা হলো 'প্রত্যাবর্তনবাদী' ধর্ম। দাউদ-বংশে ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হবে, ইহূদীদের এ ধর্মবিশ্বাস, 'মানবরূপে' ভগবানের আবির্ভাব-বিষয়ক ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস, যীশুর আবির্ভাব সংক্রান্ত খ্রীস্টীয় ধর্মবিশ্বাস, রাজবংশীয় রাজপুরুষদের প্রতি পারসিকদের ধর্মীয় পবিত্রতা আরোপ ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তার সমন্বয়ে গড়ে উঠে ছিলো তার ধর্মবিশ্বাস। [আল আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৯৭১]

গবেষক আল আক্কাদ আরো বলেন, ইয়ামনে এই সাবাঈ দলের উদ্ভব হয়ে ছিলো এবং প্রাচীনকাল থেকেই সেখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আলী-প্রেম তাদের এতটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের ছিলো

যে, তা ঐশ্বরিক পবিত্রতা আরোপের সীমা স্পর্শ করেছিলো। মিসরে ও পারস্যে শিয়া ফাতেমিয়া ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের বীজ ছড়িয়ে ছিলো। দীর্ঘ যুগ সেখানকার মাটিতে উক্ত বীজ থেকে কয়েক প্রজন্ম পর তা অংকুরিত হয়েছিলো। শিয়াদের নিকট নির্ভরযোগ্য রিজালশাস্ত্রীয় গ্রন্থরূপে বিবেচিত 'রিজালকুশী' নামক গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

তিনিই সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা)-এর ইমামতের অপরিহার্যতার ধারণা প্রচার করেন, তাঁর শত্রুদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেন, তাঁর বিরোধীদের প্রতি মারমুখী মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতি কুফুরি আরোপ করেন। এ কারণেই শিয়াবিরোধীরা বলে থাকেন যে, ইহুদী ধর্মই শিয়া ও রাফেযী চিন্তাধারার উৎস। [রিজালকুশী, পৃষ্ঠা-৭১]

আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা ও তার অনুসারীরা আলী (রা)-এর ব্যাপারে চূড়ান্ত অতিরঞ্জন করে ছেড়েছে। প্রথমে তাঁরা তাঁর নবুয়তের কথা প্রচার করেছিলো, অতঃপর শেষ ধাপে গিয়ে তাঁকে উপাস্য মাবুদও দাবি করেছিলো। কুফার কিছু লোকের মাঝে এ মতবাদ প্রচারের কথা জানতে পেরে হযরত আলী (রা) তাদের একটি দলকে দু'টি গর্তে নিক্ষেপ করে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে অবশিষ্টদেরকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে তিনি আশংকা করলেন যে, হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে একদল লোক সমালোচনার ঝড় তুলবে। তাই তিনি ইব্নে সাবাকে মাদায়েন অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠালেন। হযরত আলী (রা) নিহত হওয়ার পর ইব্ন সাবা প্রচার করতে লাগলো যে, নিহত ব্যক্তি আলী নন। তিনি তো ঈসা ইব্ন মারয়াম (রা)-এর ন্যায় আকাশে আরোহণ করেছেন। কতিপয় সাবাঈর ধারণা ছিলো এই যে, হযরত আলী (রা) মেঘের আড়ালে রয়েছেন, আর বজ্রের আওয়াজ শুনে বলে উঠতো,

عليك السلام امير المؤمنين۔

"হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার প্রতি সালাম।"

ইব্নে সাবাকে একবার বলা হলো আলী তো নিহত হয়েছেন, তখন সে বলে উঠলো, কোন পাত্রে তাঁর মগজ এনে দেখালেও আমি তাঁর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করবো না। আসমান থেকে নেমে এসে গোটা দুনিয়ার রাজত্ব লাভ করার পূর্বে তাঁর মৃত্যু হতে পারে না।

ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে আমরা যদ্দূর জানি তাতে কুচক্রীদের কোন আন্দোলন ও চক্রান্ত এতটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং এতটা প্রভাব ও শিকড় রেখে যেতে পারেনি যা কুচক্রী আবদুল্লাহ ইব্ন সাবার ষড়যন্ত্র আন্দোলন পেয়েছে। তাঁর চিন্তা ও আন্দোলনের মাঝে ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও বংশীয় কয়েকটি কার্যকারণ ক্রিয়াশীল ছিলো। স্বভাবগতভাবেই সাবা সম্প্রদায় সহজতার পরিবর্তে কঠোরতাপ্রিয় ছিলো এবং স্পষ্টতা ও সরলতার পরিবর্তে অস্পষ্টতা ও বক্রতা প্রিয় ছিলো। তাদের এ স্বভাবপ্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল কুরআনে তাদের নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ

رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا .

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর।" [সূরা সাবা : ১৯]

এটা তাদের ধারাবাহিক বংশীয় স্বভাব, আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বংশগুণ রক্তপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ ছিলো তার হীনমন্যতাবোধ। কেননা সে ছিলো হাবশী রমণীর পুত্র, যাকে উপহাস করে ইব্ন সাওদা বলা হতো। আর ধর্মীয় কার্যকারণ ছিলো ইহূদী মানসিকতা যা ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে মানুষের সমাজ, সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসের পেছনে সক্রিয় ছিলো এবং চিন্তার জগতে নৈরাজ্য অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে সদাতৎপর ছিলো। বস্তুত এটাই হলো ইহূদী মস্তিষ্কের আবহমানকালীন বৈশিষ্ট্য ও এ কুখ্যাতি তাদের সর্বকালীন ও সার্বজনীন।

সে যুগে সামাজিক ও চরমপন্থী চিন্তা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের প্রচার-প্রসারের এ সব কার্যকারণ সর্বতোভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো এবং সেসব ব্যক্তিত্বের প্রতি সরল সাধারণ মানুষের অন্তরে ভক্তি ও দুর্বলতা ছিলো তাদের প্রতি ঐশ্বরিক পবিত্রতা আরোপের মতো বাড়াবাড়ি ছিলো তারই অন্যতম প্রকাশ। বলা বাহুল্য, হযরত আলী (রা) ছিলেন এই গোপন চক্রান্তমূলক তৎপরতার সহজ লক্ষ্যস্থল। কেননা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলো তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়তার বন্ধন, তদুপরি তাঁর

সুমহান ব্যক্তিত্ব ছিলো বহুমুখী গুণ-মহিমা ও প্রতিভার প্রকাশ ক্ষেত্র। ফলে স্বাভাবিক কারণেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবার আন্দোলন ও প্রচার বিরাট সংখ্যক অনুগামী ও সমর্থক পেয়ে গেলো।

বস্তুত এই দুই বিপরীতমুখী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতারই জ্বলন্ত প্রমাণ ছিলো। কেননা একাধিক মুহাদ্দিস হারিস ইব্‌ন হাসীরাহ হতে, তিনি আবূ সাদিক হতে, তিনি বারীয়া ইব্‌ন নাজিদ হতে, তিনি হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার আমাকে ডেকে বললেন, তোমার মাঝে ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের উদাহরণ রয়েছে, ইহুদীরা তাঁর প্রতি এমনই বিদ্বেষ পোষণ করে ছিলো যে, তারা তাঁর আম্মাকে পর্যন্ত অপবাদ দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে নাসারাগণ তাঁর প্রতি এমনই ভক্তি পোষণ করেছে যে, তারা তাঁকে ঐ মর্যাদায় সমাসীন করেছে যার উপযুক্ত তিনি নন।

হযরত আলী (রা) বললেন, সাবধান! দুই শ্রেণীর লোক আমাকে কেন্দ্র করে হালাক হবে। সীমাতিরিক্ত মুহব্বতকারী, যে আমার এমন প্রশংসা করবে যা আমার মাঝে নেই। দ্বিতীয়ত, এমন বিদ্বেষ পোষণকারী যে আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে। শুনে রেখো, আমি নবী নই, আমার প্রতি কোন ওহী বা প্রত্যাদেশ হয় না, তবে আমি আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নতের ওপর যথাসম্ভব আমল করি। সুতরাং আল্লাহ্র আনুগত্যের যে আদেশ আমি তোমাদের করি, পছন্দ হোক বা অপছন্দ, সে ব্যাপারে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য।

উম্মতের সম্ভাব্য দুর্যোগ মুহূর্তে হযরত আলী (রা)-এর আদর্শ

আল্লাহ্র সর্বব্যাপী জ্ঞানে একথা ছিলো যে, ইসলামী উম্মাহ যাকে বিশ্ব সভ্যতার তত্ত্বাবধান এবং জাতিবর্গের ধর্মীয়, নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব প্রদানের মহান উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়েছে, এই উম্মাহ তার দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। আনুগত্য, অবাধ্যতা, শান্তি, যুদ্ধ, শাসন, নৈরাজ্য, ঐক্য, বিদ্রোহ ইত্যাদি অনুকূল ও প্রতিকূল বিভিন্ন অবস্থার মুকাবিলা তাকে করতে হবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি অবস্থার জন্য তদুপযোগী বিধান প্রবর্তন করেছেন এবং

বাস্তব অবস্থার মুকাবিলা করার জন্য এমন সকল মহান ইমাম ও নেতৃ পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যারা উম্মাহর জীবনের প্রতিটি অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যাতে পরবর্তী ইমাম ও নেতাগণ কোন পরিস্থিতির মুখেই দিশেহারা না হয়ে পড়েন।

সুতরাং আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আহলে কিতাব ও মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে লড়াই ও ধর্মত্যাগীদের মুকাবিলায় অস্ত্র ধারণের পরিস্থিতি যেমন অনিবার্য ছিলো তেমনি যত অপ্রিয়ই হোক, এক কিবলার অনুসারীদের মাঝে বিরোধ এবং ইমামুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়াও ছিলো একান্তই স্বাভাবিক পর্যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও কল্যাণ যুগের কোন ইমামের পক্ষ হতে যারা উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় পূর্ব দৃষ্টান্ত ও বাস্তব আদর্শ বিদ্যমান হওয়া জরুরী ছিলো।

শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) হতে এতদ সংক্রান্ত বিস্তারিত মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে চারটি তরবারি দ্বারা প্রেরণ করেছেন, একটি তরবারি দ্বারা তিনি নিজে মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আরেকটি তরবারি দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা) ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

تقاتلونهم او يسلمون

(পুনঃইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।)

আরেকটি তরবারি দ্বারা হযরত উমর (রা) অগ্নিপূজক ও কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না।"

আরেকটি তরবারি দ্বারা আলী (রা) আনুগত্য বর্জনকারী, অত্যাচারী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ۔

"যারা বিদ্রোহ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র আদেশের গণ্ডিতে ফিরে আসে।"

ইমাম আবূ হানীফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যখন যারাই লড়াই করেছে, তিনি তাদের মুকাবিলায় অধিকতর হকের ওপর ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা) যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন তাহলে কেউ জানতে পারতো না যে, মুসলমানদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

খারিজী সম্প্রদায় ও সিরীয়দের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা) শাহাদাত পর্যন্ত

ইরাক ও সিরিয়া, সিরিয়া অভিমুখে অভিযান এবং ইরাকীদের যুদ্ধে অনীহা, হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত, হাদীস ও সাহাবা তাবেঈনের চোখে হযরত আলী, হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের কতিপয় দিক যার যথাযোগ্য মূল্যায়ন হয়নি, তাঁর সন্তান সন্ততি, তাঁর হিকমত প্রজ্ঞা-ভাষাজ্ঞান ও অলংকারিত্ব, তার কবিতা-অনন্য সাধারণ তিরস্কার সাহিত্য।

সপ্তম অধ্যায়

খারিজী সম্প্রদায় ও সিরীয়দের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা) শাহাদাত পর্যন্ত

ইরাক ও সিরিয়ার গুণগত পার্থক্য

হযরত আলী (রা) দু'টি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সে আগুনের তাপে তিনি ঝলসে গিয়েছিলেন। প্রথম অগ্নিপরীক্ষা এই যে, সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, অথচ তাঁর সমর্থক ও অনুগামীদের মাঝে সেই আনুগত্য ও কর্মোদ্যমের ছিটেফোঁটাও ছিলো না যা সিরীয়দের মাঝে ছিলো, বিপুল পরিমাণে অবশ্য দু'টি অঞ্চলের স্বভাবপ্রকৃতি ও দু'টি শিবিরের সমর প্রস্তুতির পার্থক্যই ছিলো এর কারণ।

উভয় অঞ্চলের অতীত ইতিহাসই তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কেননা ইসলামী শাসনের পূর্বে সিরিয়া ছিলো বাইজান্টাইন শাসনের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান ছিলো এবং সিরিয়ার সাথে বনূ উমাইয়ার সম্পর্ক ছিলো প্রাচীন। যখন নেতৃত্ব নিয়ে উমাইয়া ও হাশিমের মাঝে প্রবল প্রতিযোগিতা হয়ে ছিলো তখন উমাইয়া মক্কা ত্যাগ করে দশ বছর সিরিয়ায় বসবাস করেছিলেন। আর বিচারকগণ হাশিমের অনুকূলে ও উমাইয়ার প্রতিকূলে রায় প্রদান করেছিলেন। বনূ উমাইয়ার দায়িত্ব ছিলো মক্কা ও সিরিয়ার পথে চলাচলকারী বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা বিধান। আর এটা ছিলো একটা স্থায়ী দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড যা কাফেলার যাত্রা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতো না বরং প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তার সহকর্মীদের মাঝে এবং পথের বিভিন্ন মঞ্জিলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি স্থায়ী সম্পর্ক, যোগাযোগ ও সখ্য বিদ্যমান থাকতো। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর পিতা আবূ সুফিয়ান ছিলেন তাঁর যুগে কাফেলার নিরাপত্তা প্রধান। এ কারণেই রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন পত্র প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ানকে সহজেই সেখানে পাওয়া গিয়েছিলো।

তদুপরি সিরিয়া ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের শাসনাধীন ছিলো এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) একচ্ছত্রভাবে সুদীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত সিরিয়া শাসন

করেছেন। সেখানে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো কিংবা তাঁর অবাধ্যতা করার মতো কেউ ছিলো না, বলতে গেলে এককভাবে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চল এক স্বাধীন শাসকের শাসিত স্বাধীন রাজ্যের রূপ প্রকৃতি ধারণ করতে বসেছিলো।

এদিকে সমসাময়িকদের মাঝে হযরত মু'আবিয়া (রা) ছিলেন কর্ম-কুশলতা, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, প্রজা তোষণ, শাসনে সোহাগে মানুষের সন্তুষ্টি সাধন, বাস্তব জ্ঞান, বাস্তববাদিতা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

পক্ষান্তরে ইরাক ছিলো কয়েক শতাব্দী ধরে ইরানী কায়হানী ও সাসানী সম্রাটদের শাসনাধীন। ইরানের রাজসিংহাসনে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকজন শাসকের পালা বদল ঘটেছিলো। নওশেরাঁওয়ার (৫৩১-৫৭৯) মৃত্যুর পর তার পৌত্র পারভেজ (মৃত্যু ৬২৮) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকেই পরাজিত করেছিলেন এবং ৬২৮ সালে শেরওয়ে-এর হাতে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হয়েছিলেন। ৬২৮ সাল থেকে ৬৩২ সালে সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদাজারদ-এর ক্ষমতারোহণ পর্যন্ত সময়কালে ইরান ছিলো সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের শিকার। পারভেজের পুত্র কুবাম 'শেরওয়ে' উপাধি ধারণ করে পিতার সিংহাসন দখল করেছিলেন এবং ৬২৮ সালে তারই ইঙ্গিতে অতি অপদস্থতার সাথে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পারস্য সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়েছিলো। তখন সিংহাসন ছিলো রাজপরিবারের উচ্চাভিলাষী রাজপুরুষদের খেলনা বিশেষ। শেরওয়ে ছয় মাসের মতো বেঁচেছিলেন মাত্র। এরপর চার বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে দশজন সম্রাট সিংহাসনে ওঠানামা করেছেন। রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা তখন একেবারেই শিথিল হয়ে পড়েছিলো। অতঃপর পারস্যবাসিগণ সম্মিলিতভাবে ইয়াজদাজারদকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলো। তিনিই ছিলেন শেষ সাসানী সম্রাট। তৎকালীন সাসানী সাম্রাজ্যের শাসনদুর্বলতা ও অস্থিতিশীলতার অবস্থা এই ছিলো যে, পারভেজ কন্যা 'বউরান' সম্রাট শাহরিয়ারের পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, অথচ সে যুগের শাসক পরিবারগুলোতে কোন নারীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিলো না। তাঁর শাসনকাল ছিলো এক বছর চার মাস।

তদ্রূপ উভয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের আরেকটি কারণ ছিলো একদিকে সিরিয়া বিজয় অর্জনকারী ও সিরিয়ায় বসতি স্থাপনকারী আরব গোত্রসমূহ এবং অন্যদিকে ইরান ও ইরাক বিজয় অর্জনকারী আরব গোত্রগুলোর স্বভাবগত পার্থক্য। প্রথমোক্ত গোত্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো জাযীরাতুল আরবের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল থেকে আগত। স্বভাবগতভাবেই তারা নিয়ম-

শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনুগত, শ্রদ্ধাশীল ছিলো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গোত্রগুলো এসে ছিলো জাযীরাতুল আরবের পূর্বাঞ্চল থেকে। সেখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিলো বিক্ষোভ, গোলযোগ, অস্থিরতা, অসন্তোষ ও চিন্তাগত নৈরাজ্য, যার ফলশ্রুতি ছিলো ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের সর্বব্যাপী ফিতনা এবং যাকাত অস্বীকারের ভয়াবহ আন্দোলন। তবে এসবের পাশাপাশি তাদের শৌর্যবীর্য, যুদ্ধ নৈপুণ্য ও অন্যান্য গুণও ছিলো অনস্বীকার্য।

ড. আহমদ আমীন বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই ইরাক ছিলো বভিন্ন ধর্মের এবং উদ্ভট সকল চিন্তাধারার উৎসভূমি। মানী, মাসদাফ ও ইব্ন দীসানের চিন্তা ও দর্শন সেখানে বিস্তার লাভ করেছিলো। তাদের মাঝে ইহূদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ ছিলো যারা মানব সত্তায় ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ধরনের চিন্তাবিশ্বাসের সাথে পরিচিত ছিলো। [ফজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৩৩২]

এছাড়া আরবরা ইরাকে ইয়ামানী ও নাযারী সম্প্রদায়িকতার বীজ নিয়ে এসে ছিলো এবং রাবীয়া গোত্রের বাসভূমি হিসেবে ফোরাত অঞ্চল খ্রীস্টান সম্প্রদায় কিংবা খারিজী সম্প্রদায়ের তৎপরতা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। আর আসমাঈর মন্তব্য মতে রাবীয়া গোত্র ছিলো সকল ফিতনার মূল।

[তারীখুল আদাব আল আরাবী, পৃষ্ঠা-১০২]

হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর উভয় শিবিরের মাঝে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিলো, তা অতি সূক্ষ্মভাবে ও প্রজ্ঞার সাথে গবেষক আল আক্কাদ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মুসলিম বাহিনী তখন স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা এবং অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এ দু'টি পরস্পর বিপরীতমুখী ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। একটি অংশে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য ও সন্তুষ্টি এবং তার স্থিতি ও সংহতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার যাবতীয় উপাদান ও কার্যকারণ বিদ্যমান ছিলো, পক্ষান্তরে অপরাংশে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং তার ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন মানসিকতার যাবতীয় উপাদান ও কার্যকারণ ক্রিয়াশীল ছিলো।

তিনি আরো বলেন, সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট অংশটি এসে ছিলো মু'আবিয়া (রা)-এর ভাগে সিরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। পক্ষান্তরে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী অংশটি এসে ছিলো হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর ভাগে সমগ্র জাযীরাতুল আরব অঞ্চলে।

[আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়াত, পৃষ্ঠা-৮৬৯]

আলী (রা) সিরিয়া অভিযানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন, কিন্তু খারিজীরা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে যাত্রা করে নাখীলাহ অঞ্চলে উপনীত হলেন। সেখানে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এক জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং আসন্ন সিরিয়া অভিযানে শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে খবর এসে পৌঁছলো যে, খারিজীরা গোলযোগ, রক্তপাত, লুণ্ঠন ও অনাচারের এক তাণ্ডবলীলা শুরু করে দিয়েছে। তখন আলী (রা) খারিজীদের নিকট তাঁর পক্ষ হতে দূত প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা তাঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করে ফেললো। এ খবর পেয়ে হযরত আলী (রা) সিরিয়া অভিযানের পূর্বে খারিজীদের শায়েস্তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে তিরস্কার করলেন, উপদেশ দান করলেন এবং কঠিন পরিণতির হুঁশিয়ারি প্রদান করে বললেন, যে পদক্ষেপ তোমরা আমাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছো এখন তাই নিয়ে আমার বিরোধিতায় নেমেছো অথচ আমি তখন তোমাদের নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তোমরা মান্য করনি।

কিন্তু খারিজীরা লড়াইয়ের হঠকারিতা থেকে কোন যুক্তিতেই নিবৃত্ত হলো না, বরং যুদ্ধের উদ্দেশেই আলী (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম চলবে না, চলো জান্নাতে চলো ইত্যাদি শ্লোগান দ্বারা উন্মাদনা সৃষ্টি করলো। তখন আলী (রা)-এর পক্ষের লোকেরা তরবারি ও বর্শা উঁচিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদেরকে মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে দিলো। ফলে রণাঙ্গনে অশ্বপদতলে তাদের লাশ পিষ্ট হতে লাগলো। এটা ছিলো সাঁইত্রিশ হিজরীর ঘটনা। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৮-২৮৯]

সিরিয়া অভিযান ও ইরাকীদের যুদ্ধে অনীহা

নাহরাওয়ান থেকে ফিরে এসে আলী (রা) সমবেত লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দান করলেন। হামদ ও ছানা এবং দরূদ ও সালামের পর বললেন, অতঃপর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুসংহত বিজয় দান করেছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে তোমরা সিরিয়ায় তোমাদের শত্রুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর। কিন্তু তারা তাঁর উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমাদের তীর ফুরিয়ে গেছে; তলোয়ার ভোঁতা হয়ে গেছে এবং বর্শার ফলা বাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমাদেরকে আমাদের শহরে নিয়ে চলুন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৮]

এটাই ছিলো তাদের সব সময়ের আচরণ। ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেছেন, ইরাকীরা যখন সিরিয়া অভিযানে রওয়ানা হতে অস্বীকার করলো তখন এক ভাষণে আলী (রা) তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলেন এবং কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন। বিভিন্ন সূরা থেকে জিহাদের আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে সিরিয়া অভিযানে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু আনুগত্যের পরিবর্তে তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলো এবং তাঁর উদাত্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে দেশের পথে ফিরে চললো। এভাবে গোটা বাহিনী এদিক-সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। তখন আলী (রা) কুফায় ফিরে গেলেন।

উনচল্লিশ হিজরী শুরু হলো, তখন হযরত মু'আবিয়া (রা) বহু সংখ্যক বাহিনী তৈরি করে হযরত আলী (রা)-এর শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলেন। কেননা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, আলী (রা)-এর ইরাকী বাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর আনুগত্য করে না এবং তাঁর আদেশ প্রতিপালন করে না। সুতরাং এই সুযোগে তাঁর বিভিন্ন বাহিনী আইনাত্তাসার, আনবার, তায়মা ও তাদমুর অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করলো। ফলে আলী (রা)-এর সমর্থক ও ইরাকীদের মাঝে দুর্বলতা ও হতাশা দেখা দিলো।

ইরাকীদের দুর্বল অবস্থান তথা তাদের বিভিন্ন ওযর, অজুহাত, উদ্যোগ ও উদ্যমহীনতার মুখে আলী (রা) কেমন অস্থির ও ব্যথিত হৃদয় ছিলেন তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে ছিলো আম্বারের পতনের সংবাদ শুনে প্রদত্ত তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটিতে।

যখন খবর এলো যে, মু'আবিয়ার প্রেরিত অশ্ববাহিনী আম্বার দখল করে নিয়েছে এবং আলী (রা)-এর নিযুক্ত প্রশাসক হাসসান বিন হাসসানকে তারা হত্যা করেছে তখন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হলেন। তাঁর চাদর তখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। এভাবে তিনি নাখীলা অঞ্চলে এসে পৌঁছলেন। লোকেরাও তার পেছনে পেছনে এসে জমায়েত হলো। তিনি একটি টিলায় আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র হামদ, ছানা এবং নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালামের পর নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করলেন। বস্তুত আপন নীতি ও অবস্থানের প্রতি বিশ্বাসে অবিচল কিন্তু কাওমের অবাধ্যতায় বিক্ষত হৃদয় শাসকদের যত ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে হযরত আলী (রা)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ অধিক সারগর্ভ ও আবেদনপূর্ণ। আলী (রা)-এর সহজাত আরবীয় অলংকারিত্বের যে সমুজ্জ্বল প্রকাশ এতে ঘটেছে বড় বড় অলংকারশাস্ত্রবিশারদ ও অনলবর্ষী বক্তাদের পক্ষেও তাতে উত্তীর্ণ হওয়া খুব কমই সম্ভব হবে।

তিনি বললেন, অতঃপর জিহাদ হলো জান্নাতের অন্যতম দরজা। নিস্পৃহায় যারা তা বর্জন করবে আল্লাহ্ তাদেরকে যিল্লতির লেবাস পরাবেন, কলংকের কালিমা লেপন করবেন এবং হীনতায় অভ্যস্ত করবেন। রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আমি তোমাদেরকে এ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছি। আমি তোমাদের বলেছি, তারা হামলা করার আগে তোমরা তাদের ওপর হামলা করো, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহ্র শপথ! কোন কাওম যদি তার ঘরের ভেতরে হামলার শিকার হয় তাহলে যিল্লতি ছাড়া তার কোন পথ নেই। কিন্তু সংহতির পরিবর্তে তোমরা একে অন্যের মুখ চেয়ে বসেছিলে। আমার কথা তোমাদের অসহনীয় মনে হয়েছে, তাই অবজ্ঞা করেছো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপর লাগাতার হামলা শুরু হয়ে গেছে।

এই দেখ 'গামেদী' ভ্রাতার অশ্ববাহিনী আম্বারে এসে গেছে এবং হাসসান ইবন হাসসানসহ বহু নারী-পুরুষকে নির্দ্বিধায় তারা হত্যা করেছে। যে আল্লাহ্র হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলি, আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ এসেছে যে, কোন কোন হানাদার সেনা মুসলিম নারী ও যিম্মী নারীর ঘরে হানা দিয়েছে এবং তাদের কানের দুল ও পায়ের নূপুর খুলে ফেলেছে। এরপর সবাই নিরাপদে ফিরে গেছে। সামান্য আঁচড়ও লাগেনি কারো গায়ে। এই দুঃখে ও লজ্জায় কোন মুসলিম পুরুষ যদি মরে যায় তাহলে আমার মতে তা দোষের কিছু নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

হায় আশ্চর্য! বাতিলের পথে তাদের একতা আর হকের পথে তোমাদের ভীরুতা দেখে হতবাক হই। দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয়ে যায়, অন্তর ফেটে যায় এবং বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়। এখন তো তোমরা লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়েছো, তোমাদের বুকে তীর বেঁধে। তোমাদের তীর তাদের বুকে বেঁধে না। তোমাদের ওপর হামলা হয়। তোমরা তাদের ওপর হামলা কর না। তোমাদের সামনে আল্লাহ্র নাফরমানি হয়, অথচ তোমরা সানন্দ বোধ করছো।

যদি বলি শীতকালে অভিযানে চলো, তখন তোমরা বল, এ তো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার সময়। আর যদি বলি গ্রীষ্মকালে তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে চলো তখন তোমরা বলো, এ তো আগুন ঝরার সময়, গরম কালটা একটু যেতে দিন। শীত-গরমের ভয়েই যদি পিছপা হও তাহলে আল্লাহ্র শপথ, তলোয়ারের ভয়ে তো তোমরা উর্ধ্বশ্বাসেই পালাবে!

হে পৌরুষহীন পুরুষদল ও হে আকল-বুদ্ধিহীন চুড়িওয়ালীর দল! আল্লাহ্র শপথ, অবাধ্যতা করে তোমরা আমার বিচার-বুদ্ধি শেষ করে দিয়েছো এবং

আমার বুক ক্রোধে পূর্ণ করে দিয়েছো, এমন কি কুরায়শরা বলাবলি শুরু করেছে, আবূ তালিবের পুত্র বাহাদুর বটে, কিন্তু যুদ্ধের বিচক্ষণতা নেই তার। কী আশ্চর্য! আমার চেয়ে যুদ্ধ-পারদর্শী ও রণভিজ্ঞ কে হতে পারে!

আল্লাহ্‌র শপথ! বিশ বছরেরও কম বয়সে যুদ্ধের মাঠে নেমেছি আর আজ ষাটের ওপর হলো আমার বয়স। কিন্তু যার প্রতি আনুগত্য নেই তার বিচক্ষণতা নিষ্ফল। তিনি তিনবার একথা বললেন। [আল-কামিল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০-৩১]

হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, অবস্থা ও পরিস্থিতি হযরত আলী (রা)-এর প্রতিকূলে চলে গেলো এবং তাঁর সেনাবাহিনীও বিশৃঙ্খল হয়ে গেলো এবং ইরাকীরাও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলো। এদিকে সিরীয়দেরও প্রতাপ বেড়ে গেলো। চতুর্দিকে প্রবল দাপটের সাথে তারা বিচরণ করতে লাগলো।

সে যা-ই হোক, ইরাকীদের আমীর আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)- কিন্তু তাঁর যুগে পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন। শ্রেষ্ঠ আবিদ, শ্রেষ্ঠ সাধক, শ্রেষ্ঠ আলিম ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌ভীরু ছিলেন। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও তারা তাঁকে পরিত্যাগ করলো এবং নিঃসঙ্গ রেখে চলে গেলো, এমন কি তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলেন। তিনি যথাক্রমে দাড়ি ও মাথার প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটাকে এটা দ্বারা রঞ্জিত করা হবে (পরে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো)।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪]

ঘটনা এই যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ওরফে ইব্‌ন মুলজিম (প্রথমে হিমায়ারী ও পরবর্তীতে কিন্দী), বারক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীমী ও আমর ইব্‌ন বকর তামীমী এই তিন খারিজী একত্রে বসে তাদের নাহরাওয়ানবাসী ভ্রাতাদের (যুদ্ধে) নিহত হওয়ার ঘটনা আলোচনা করলো এবং তাদের প্রতি রহমত কামনা করে বললো, আমরা যদি নিজেদের জীবন বাজি রেখে গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার হোতাদের হত্যা করতে পারি তাহলে তাদের পাপ অস্তিত্ব থেকে দেশ মুক্তি পেতে পারে এবং আমাদের নিহত ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণও হতে পারে। তখন ইব্‌ন মুলজিম বললো, আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের জন্য যথেষ্ট। বারক বললো, আমি মু'আবিয়ার জন্য যথেষ্ট। আমর ইব্‌ন বকর বললো, আমি আমর ইব্‌ন আস-এর জন্য যথেষ্ট।

তারা এই মর্মে পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো যে, তাদের কেউ তার প্রতিপক্ষকে নিস্তার দেবে না। হয় তাকে কতল করবে কিংবা নিজে কতল হবে। অতঃপর তারা নিজ নিজ তলোয়ার বিষমিশ্রিত করলো এবং এভাবে সময় নির্ধারণ করলো যে, রমযানের সতের তারিখ রাত্রে তাদের প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষ যে শহরে বসবাস করে সেখানে রাত যাপন করবে।

ইব্‌ন মুসলিম কুফায় গেলো, কিন্তু সে এমন কি তার খারিজী সাথীদের কাছেও আপন উদ্দেশ্য গোপন রাখলো। যখন রমযানের সতের তারিখ জুমুআর রাত হলো তখন সে আলী (রা) যে দরজা দিয়ে বের হন তার মুখোমুখি বসলো। আলী (রা) বের হয়ে 'আস-সালাত' 'আস-সালাত' বলে মানুষকে ঘুম থেকে সালাতের জন্য ওঠাতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে ইব্‌ন মুলজিম তরবারি দ্বারা তাঁর মাথায় আঘাত করলো। ফলে রক্তে তাঁর দাড়ি ভেসে গেলো (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। আঘাত করে সে বলে উঠলো, বিধান প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। হে আলী, তোমারও নয়, তোমার সাথীদেরও নয়।

হযরত আলী (রা) ডাক দিয়ে বললেন, ধরো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ইব্‌ন মুলজিমকে পাকড়াও করা হলো, হযরত আলী (রা) জা'দা ইব্‌ন হোবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহবকে আগে বাড়িয়ে দিলেন, তিনি ফজরের নামায পড়ালেন। হযরত আলী (রা)-কে তাঁর ঘরে তুলে আনা হলো। তিনি বললেন, আমার মৃত্যু হলে তাকে হত্যা করো, আর যদি বেঁচে থাকি তাহলে তাকে কি করবো তা আমিই ভালো বুঝবো। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৮]

তাকে যখন হযরত আলী (রা)-এর সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, তাকে আটক করো। তবে বাঁধনটা আরামদায়ক করো। যদি বেঁচে থাকি তাহলে কিসাস গ্রহণ করবো কিংবা ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে আমি চিন্তা-ভাবনা করবো। আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ। তবে তার লাশ বিকৃত করো না।

হযরত হাসান-হুসায়ন (রা)-কে তিনি দীর্ঘ অসিয়ত করেছিলেন, অসিয়তের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, "হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আমীরুল মু'মিনীন নিহত হয়েছেন, একথা বলে মুসলমানদের রক্তে ডুব দিও না। সাবধান, আমার বিনিময়ে আমার হত্যাকারী ছাড়া আর কাউকে যেন হত্যা করা না হয়! দেখো, আমি যদি তার এই আঘাতে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তাকেও (অনুরূপ)

একটি আঘাত করবে। তবে তার লাশ বিকৃত করো না।" কেননা আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

ایاکم والمثالة ولو بالكلب العقدر.

"এমন কি পাগলা কুকুরকেও মুসলাহ্ করার ব্যাপারে সাবধান থেকো।"

হযরত জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার মৃত্যু হলে আমরা কি হাসানের হাতে বায়'আত হবো? তিনি বললেন, আমি আদেশও করবো না, নিষেধও করবো না, তোমরাই ভালো বুঝবে। যখন মৃত্যুর হালত শুরু হলো তখন হযরত আলী (রা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অধিক পরিমাণে উচ্চারণ করতে লাগলেন। এছাড়া অন্য কিছু উচ্চারণ করছিলেন না। কথিত আছে, তাঁর শেষ উচ্চারণ ছিলো এই আয়াত:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

"যে কণা পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে আর যে কণা পরিমাণ মন্দ আমল করবে সে তাও দেখতে পাবে।" [সূরা যিলযাল : ৭ - ৮]

হযরত আলী (রা) আপন পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনের ও উত্তম আমলসমূহের অসিয়ত করলেন এবং গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অসিয়তটি লিখিয়ে দিলেন।

ইব্ন মুলজিম বলেছে, আমি তাঁকে এমন আঘাত করেছিলাম যে, শহরের অধিবাসীদেরকে যদি এ আঘাত করা হতো তাহলে তারা সকলে মৃত্যুবরণ করতো। আল্লাহ্‌র শপথ! এক মাস যাবৎ আমি এ তরবারিতে বিষ মেখেছি। এক হাজার দিরহামে আমি ঐ তরবারি খরিদ করেছি এবং এক হাজার দিরহাম ব্যয় করে বিষ মিশ্রিত করেছি।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) চল্লিশ হিজরীর ১৭ রামাযান সাহরীর সময় জুমার দিন শাহাদাত বরণ করেছেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩০]

বিশুদ্ধ বর্ণনামতে তাঁর বয়স হয়ে ছিলো তখন তেষট্টি বছর এবং তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিলো চার বছর নয় মাস। তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা) তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন। খারিজীদের পক্ষ হতে তাঁর জানাযার অবমাননার আশংকায় কুফাস্থ আমীরের সরকারি বাসভবনে তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০ - ৩৩১]

হাদীস ও আছার-এর আলোকে হযরত আলী (রা)

এখানে আমরা আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আছার-এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই।

জাহিলিয়াত ও প্রতিমা পূজার চিহ্ন মুছে ফেলা

হযরত আলী (রা) হতে আবূ মুহাম্মদ আল-হুযালী-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক জানাযায় ছিলেন। সে সময় তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে মদীনায় গিয়ে সব মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে এবং সব কবর মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে এবং সব ছবি নষ্ট করে ফেলবে?

আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যাবো। তিনি বললেন, যাও, আলী (রা) গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মদীনায় কোন মূর্তি আমি না ভেঙ্গে রাখিনি এবং কোন কবর সমান না করে ছাড়িনি এবং কোন ছবি নষ্ট না করে ছাড়িনি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি পুনরায় এ ধরনের কিছু করবে সে যেন মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করলো।

[মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৭]

হযরত জারীর ইব্ন হিব্বান তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কাজে আমাকে পাঠিয়েছিলেন তোমাকে আমি সে কাজেই পাঠাচ্ছি। তিনি আমাকে সকল কবর সমান করে গুঁড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯]

আবুল হায়াজ আল-আসাদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন এক কাজে পাঠাচ্ছি যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। কোন মূর্তি তুমি আস্ত রাখবে না এবং কোন উঁচু কবর সমান না করে ছাড়বে না।

বিজ্ঞতম ফকীহ্ ও বিচারক

একাধিক সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে প্রামাণ্যরূপে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের বিজ্ঞতম বিচারক (اقضاكم على) হলেন আলী।

হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন এক কাওমের নিকট পাঠাচ্ছেন, যাদের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হবে, অথচ বিচার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জিহ্বাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার হৃদয় (সত্যের ওপর) স্থির রাখবেন। হযরত আলী (রা) বলেন, এরপর কোন দুই বাদী-বিবাদীর মাঝে বিচার করতে গিয়ে কখনো আমি সংশয়গ্রস্ত হইনি।

[মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩]

হযরত উমর (রা) এমন কোন জটিল সমস্যা সম্পর্কে আল্লাহ্র পানাহ চাইতেন যার সমাধানের জন্য আবুল হাসান [আলী (রা)] উপস্থিত নেই।

হযরত উমর (রা) হতে নিম্নোক্ত মন্তব্যও বর্ণিত হয়েছে,

لو لا على لهلك عمر "আলী না হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।"

[ইযালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৮]

তাছাড়া হযরত উমর (রা) যখনই কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন আফসোস করে বলতেন, قضية ولا ابا حسن لها "এ এমন সমস্যা যার সমাধানের জন্য কোন আবুল হাসান নেই।"

[আল আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৯৬৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সূত্রে আবূ আমর বর্ণনা করেছেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা এমন আলোচনা করতাম যে, মদীনাবাসীদের মাঝে আলী বিন আবূ তালিব (রা) হলেন বিজ্ঞতম বিচারক।

হযরত আলী (রা)-এর অতি সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচারের একটি নমুনা হলো মুসনাদে আহমদে নিজস্ব সনদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস:

হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামান পাঠালেন। আমি এক কাওমের নিকট উপনীত হলাম যারা সিংহ শিকারের জন্য একটি গর্ত তৈরি করেছিলো। গর্তের তীরে লোকেরা যখন ঠেলাঠেলি করছিলো তখন একজন লোক হঠাৎ পড়ে গেলো কিন্তু সে একজন লোককে ধরে ঝুলে গেলো। অতঃপর আরেকজন অন্য একজনকে ধরে ঝুলে পড়লো। এভাবে গর্তে চারজন হলো। আর গর্তে আটকা পড়া সিংহ তাদেরকে জখম করে ফেললো। তখন একজন বর্শাঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললো। কিন্তু জখমের কারণে চার জনের সকলেই মারা গেলো। তখন প্রথম জনের

অভিভাবকরা অপরজনের অভিভাবকদের মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালো এবং উভয় পক্ষ অস্ত্র হাতে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে গেলো। আলী (রা) তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখনো জীবিত আছেন, আর তোমরা নিজেদের মাঝে লড়াই করতে চাচ্ছো! আমি তোমাদের মাঝে বিচার করে দিচ্ছি। যদি তোমরা সন্তুষ্ট হও তাহলে তো সেটাই হলো বিচার। আর যদি সন্তুষ্ট না হও তাহলে তোমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরকে পরস্পর হতে দূরে রাখা হবে। এরপর যে সীমালংঘন করবে তার কোন অধিকার থাকবে না। যে সকল গোত্র গর্ত খুঁড়েছে তাদের নিকট হতে দিয়তের চতুর্থাংশ, দিয়তের তৃতীয়াংশ, দিয়তের অর্ধেক এবং পূর্ণ দিয়ত সংগ্রহ করো। প্রথম ব্যক্তি দিয়তের চতুর্থাংশ পাবে। কেননা সে তার ওপর থেকে নিহত হয়েছে এবং দ্বিতীয় জন দিয়তের তৃতীয়াংশ ও তৃতীয়জন অর্ধেক দিয়ত পাবে।

কিন্তু তারা এ ফায়সালা মানতে অস্বীকার করে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তখন মাকামে ইবরাহীমে অবস্থান করছিলেন। তারা তাঁর খিদমতে ঘটনা আরয করলো। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করবো। অতঃপর তিনি দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসলেন। তখন দলের একজন বললো, আলী আমাদের মাঝে ফায়সালা করেছেন। তখন তারা পুরা ঘটনা তাঁর খিদমতে আরয করলো আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত ফায়সালা বহাল রাখলেন।

হযরত হানাশ (র) হতে বর্ণিত। আলী (রা) বলেছেন, চতুর্থজন পুরো দিয়ত পাবে। [মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭]

কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশেষজ্ঞ

আবূ তোফায়ল-এর সূত্রে আবূ উমর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) ভাষণ দানকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমাকে কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারো। কেননা আল্লাহ্র শপথ! যে কোন আয়াত সম্পর্কে আমিই অধিক অবগত যে, তা রাতে নাযিল হয়েছে নাকি দিনে, উপত্যকায় নাযিল হয়েছে নাকি পাহাড়ে। [ইযালাতুল খাফা, পৃষ্ঠা-২৬৮]

শুরায়হ ইব্ন হানি (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার ওপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আলীকে জিজ্ঞেস করো। কেননা তিনি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সফর করতেন। শুরায়হ বলেন, অতঃপর আমি আলী (রা)-কে

জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসাফিরের জন্য (মাসেহ এর মেয়াদ হলো) তিন দিন তিন রাত আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত। [মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৬]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে তাঁর সূত্রে পাঁচশ ছিয়াশিটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
[তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-১৬৭]

কোমলপ্রাণ মানুষটি

অসাধারণ শৌর্যবীর্য, বিরল যুদ্ধ প্রতিভা ও ভাবগাম্ভীর্য সত্ত্বেও হযরত আলী (রা) ছিলেন অতি কোমলপ্রাণ মানুষ। কোমল মানবিক অনুভূতি তথা দয়া, মায়া ও সংবেদনশীলতার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটে ছিলো তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে, আপন হত্যাকারীর সাথে তিনি যে মহৎ আচরণ করেছিলেন সেটাই এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে। কেননা বর্ণিত আছে, ইবন মুলজিম যখন তাঁকে বিষমাখা তরবারি দ্বারা আঘাত করেছিলেন তখন তিনি পুত্র হাসানকে এ অসিয়ত করেছিলেন,

"দেখ হে হাসান, যদি আমি তার এই আঘাতে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তাকেও তুমি একটি আঘাতের পরিবর্তে একটি আঘাতই শুধু করবে। তবে তার লাশ বিকৃত করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতে শুনেছি,

اياكم والمثلة ولو بالكلب العقدر.

"মুসলাহ করার ব্যাপারে সাবধান থেকো যদিও তা পাগলা কুকুর হয়।"

ঘাতককে যখন তার সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, তাকে আটক করে রাখো, তবে আরামদায়কভাবে তাকে বাঁধবে। যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে কিসাস গ্রহণ কিংবা ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখবো। আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ।"

হযরত তালহা (রা)-এর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রবলভাবে কেঁদেছিলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল হতে ধুলোবালি মুছে দিতে দিতে বলেছিলেন,

"হে আবূ মুহাম্মদ! খোলা আসমানের নীচে এভাবে ধূলিলুণ্ঠিত অবস্থায় তোমাকে পড়ে থাকতে দেখা আমার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। অতঃপর তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ যদি তাঁকে আজ থেকে বিশ বছর আগেই দুনিয়া থেকে তুলে নিতেন তাহলে উত্তম হতো!"

[আল আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যা, পৃষ্ঠা-৯৫৯]

ছোটদের প্রতি স্নেহমায়া ও বড়দের প্রতি ভালোবাসা ও দয়া ছিলো তাঁর সুপরিচিত গুণ বৈশিষ্ট্য। ছোটদেরকে নিজে আদর-সোহাগ করতে কিংবা অন্য কাউকে আদর সোহাগ করছে দেখতে তিনি অত্যধিক আনন্দবোধ করতেন। তিনি বলতেন, সন্তানের ওপর পিতার হক রয়েছে; আবার পিতার ওপরও সন্তানের হক রয়েছে। সন্তানের উপর পিতার হক হলো আল্লাহ্‌র নাফরমানি ছাড়া সকল বিষয়ে তার আনুগত্য করা। পক্ষান্তরে পিতার ওপর সন্তানের হক হলো সুন্দর দেখে তার নাম রাখা এবং তাকে উত্তম আদব শিক্ষা দান করা এবং কুরআন শিক্ষা দান করা। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮২]

আবূ কাসেম বাগাবী নিজস্ব সনদে তার দাদীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখেছি এক দিরহামের খেজুর খরিদ করে নিজেই চাদরে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার হয়ে আমরা বয়ে নিয়ে যাই। তিনি বললেন, সন্তান-সন্ততির জন্য পিতারই দায়িত্ব বহন করে নিয়ে যাওয়া।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫]

এক ব্যক্তি তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন ও প্রার্থনা আছে। তিনি বললেন, তোমার প্রার্থনা ও প্রয়োজনের কথা মাটিতে লিখে দাও। কেননা তোমার চেহারায় আমি প্রার্থনার দীনতা দেখতে চাই না। তখন সে লিখে দিলো আর তিনি তার প্রয়োজন পুরো করে দিলেন এবং বিপুল পরিমাণ অতিরিক্তও দান করলেন।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯]

নবী চরিত্র এবং নবুওয়তি বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান

নবী ﷺ-এর সাথে বংশীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক ও দীর্ঘ দিনের নিবিড় সান্নিধ্য, নবী ﷺ-কে আল্লাহ্ শানে নবুয়তের উপযুক্ত যে মন-মানস, মহত্তম চরিত্র, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা বিশেষভাবে দান করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এই সকল বিষয় নবী চরিত্রের ও নবুয়তি বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে নবী জীবন ও নবী চরিত্রের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিকের সঠিক মূল্যায়ন ও বিবরণ উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা)-এর জন্য বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। নবী ﷺ-এর গুণ, চরিত্র, আচার-আচরণ ও অবয়ব সম্পর্কে হযরত আলী (রা) হতে

যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তাতে তা অতি পরিষ্কারভাবে বিধৃত হয়েছে। নমুনাস্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করাই যথেষ্ট মনে করি:

اجود الناس صدرًا واصدقهم لهجة والينهم عريكمة واكرمهم عشيرة من راه بديهة هابة ـ ومن خالصه معرفة احبه يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ـ

"হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে সবার চেয়ে দানশীল, মুখের উচ্চারণে সবার চেয়ে সত্যভাষী, স্বভাবের গণ্ডীতে সবার চেয়ে স্নিগ্ধ কোমল। সমাজে সবার চেয়ে সম্মানী। হঠাৎ যে দেখে সে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু যে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশে সে ভালোবেসে ফেলে। তাঁর বিবরণ দানকারী বলেন, তাঁর আগে ও পরে তাঁর তুলনা দেখিনি।

অপরাধীদের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ এবং সহনশীলতা ও মহানুভবতার প্রতি স্বভাব অনুরাগ সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর সূক্ষ্ম জ্ঞান নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়:

আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচাত ভাই। সে তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়ে ছিলো এবং নিন্দা করেছিলো। মক্কাভিমুখী পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো। পেছনের নিন্দা ও নিগ্রহের কথা মনে পড়ায় তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবূ সুফিয়ান তখন আলী (রা)-এর নিকট এ বিষয়ে অনুযোগ করলেন। আলী (রা) তাঁকে বললেন, সম্মুখ দিক হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হও এবং ইউসুফ ভ্রাতৃগণ ইউসুফ (আ)-কে যা বলেছিলেন তাই তুমি তাঁকে বলো,

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ ـ

"আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের ওপর অগ্রাধিকার দান করেছেন। আর নিঃসন্দেহে আমরা ভুলের ওপর ছিলাম।"

কেননা তিনি কিছুতেই পছন্দ করবেন না, কেউ তার চেয়ে উত্তম কথা বলে যাবে। আবূ সুফিয়ান খিদমতে রিসালতে উপস্থিত হয়ে তাই বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

"তোমাদের প্রতি আজ কোন তিরস্কার নেই, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।"

এরপর আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ অতি উত্তম হয়েছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর হতে লজ্জায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে মাথা তুলে তাকাতেন না। [যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২১]

অগ্র-কীর্তিসমূহ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর বেশ কিছু অমর কীর্তি রয়েছে। যেখানে তিনি অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। কোন কোন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে, বিশেষত আরবী ভাষা ও তার ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এমন অনন্য অবদান রেখে গেছেন যা কোন দিন বিস্মৃত হবার নয়। আবুল আসওয়াদ দু'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে হাযির হলাম এবং তাঁকে চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, কি চিন্তা করছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের এ শহরে আরবী ভাষার ব্যাকরণগত ত্রুটি শুনতে পেলাম। তাই আরবী ভাষার মৌলিক নিয়মাবলী সম্পর্কে একটি 'পত্র' রচনা করতে মনস্থ করেছি। আমি বললাম, যদি আপনি তা করেন তাহলে যেন আপনি আমাদের নব জীবন দান করলেন! ফলে আরবী ভাষাও আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে।

তিনদিন পর আমি পুনরায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের মৌলিক নিয়মাবলীসম্বলিত একটি 'পত্র' আমার হাতে অর্পণ করলেন। [তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-১৮১]

গবেষক আল আক্কাদ বলেন, আরবী ভাষা সম্পর্কে একথা বলাই যথার্থ যে, উক্ত শাস্ত্রের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক অবদান আর কারো ছিলো না। বহু সূত্রে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, আবুল আসওয়াদ দুয়ালী একবার তাঁর নিকট আরবী ভাষার ব্যাপক ব্যাকরণ বিচ্যুতির অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যা বলি তা লিখে নাও। অতঃপর ব্যাকরণের কতিপয় মূল নিয়ম লিখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আবুল আসওয়াদকে বললেন,

أُنْحُ هذا النحو يا ابا الاسود ـ

"হে আসওয়াদ! এই নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করো।" সেই থেকে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের নাম হয়ে গেলো "নাহ্" (النحو)।

তাছাড়া এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরত থেকে ইসলামী বর্ষ গণনার পরামর্শ ও প্রস্তাব পেশ

করেছিলেন, যা হযরত উমর (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম পছন্দ করেছিলেন। হযরত উমর (রা) হিজরতের দিন থেকে তারিখ ও বর্ষ গণনার আদেশ জারি করেছিলেন। ফলে ইসলামী বর্ষপঞ্জি অস্তিত্ব লাভ করে ছিলো যা আল্লাহ্ চাহে তো পৃথিবীতে যতদিন মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন সগৌরবে বিদ্যমান থাকবে। বলা বাহুল্য, এই হিজরী বর্ষপঞ্জীর মাঝে ইসলামী, ইনসানী ও দাওয়াতী বহু কল্যাণ ও হিকমত নিহিত ছিলো এবং লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ যুগে যুগে তাতে চিন্তার নতুন নতুন খোরাক ও দিগন্তপ্রসারী আলোর নতুন নতুন ইঙ্গিত পেয়ে এসেছেন। সর্বোপরি মানবতার জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণময় ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিত। কেননা হিজরত ছিলো মানুষের জীবন ও সভ্যতার ইতিহাসে নূর ও হিদায়াতের এবং কল্যাণ ও মুক্তির এক নতুন যুগের শুভ উদ্বোধন।

হযরত আলী (রা)-এর ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যাধিক্যের কারণ

একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত আলী (রা)-এর গুণাবলী ফাযায়েল সম্পর্কে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা অপর কোন সাহাবী সম্পর্কে ও রিসালত যুগের সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি। অবশ্য এটা ছিলো বাস্তব অবস্থারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। কেননা কুদরতের ফায়সালা অনুযায়ী তাঁকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহ মারাত্মকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে ছিলো এবং তুমুল মতবিরোধ ও বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়েছিলো। খিলাফত আমলে এবং খিলাফত-পরবর্তীকালে তিনি প্রবল সমালোচনা ও নিন্দা-অপবাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। এমন অনন্যসাধারণ প্রতিভা, যোগ্যতা, অতুলনীয় কীর্তি ও কর্মের অধিকারী ছিলেন যা মানুষকে সহজেই নিন্দা-প্রশংসা ও আলোচনা-সমালোচনার পাত্রে পরিণত করে। তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিবাদবিতর্কের এমন ঝড় ওঠে যে, অবমূল্যায়নের তলে চাপা পড়ে যায় তাঁর আসল ব্যক্তিত্ব। একদল হয়ে ওঠে অন্ধ সমালোচক, আরেকদল হয়ে ওঠে অন্ধ স্তাবক।

বহু মুহাদ্দিস, সীরাত লেখক ও ঐতিহাসিক হযরত আলী (রা)-এর ফাযায়েল, মানাকিব, গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ হলো ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শো'আইব নাসাঈ (র)-এর সংকলন। 'কিতাবুল খাসাইস ফী মানাকিবি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)' নামক গ্রন্থটি ইমাম নাসাঈ (র) ছিলেন সিহাহ সিত্তার অন্যতম সংকলন নাসাঈ শরীফের প্রণেতা। তাঁর মৃত্যু ৩০৩ হিজরী।

আলোচ্য গ্রন্থটি সংকলনের অনুপ্রেরনা ছিলো। সিরিয়ায় দামেস্কে অবস্থানকালে তিনি দেখতে পেলেন যে, বহু সিরীয় হযরত আলী (রা)-এর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তাঁর প্রতি বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে থাকে। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থ সংকলনের কারণে তাঁকে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষীদের পক্ষ হতে তীব্র হামলার (এমন কি প্রাণ নাশের হুমকির) সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কিন্তু সত্য প্রকাশের এবং জ্ঞান ও গুণীর পক্ষে সাক্ষ্য দানের পথ থেকে কোন কিছুই তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি।

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক ফাযায়েল বর্ণিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আল্লামা হাফেয ইব্‌নে হাজার আসকালানী (র) তাঁর বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বিশ্লেষণধর্মী বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখানে তাঁর শেষ বক্তব্য ছিলো:

আলী (রা) সম্পর্কে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রথম শ্রেণী হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের শ্রেণী। দ্বিতীয় হলো বিদ'আতপন্থী খারিজী সম্প্রদায় আর তৃতীয় হলো হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী বনূ উমাইয়া ও তাদের সমর্থকশ্রেণী। ফলে আহলে সুন্নাতের অনুসারিগণ তাঁর ফাযায়েল ও গুণ বৈশিষ্ট্য প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এভাবে তা ফাযায়েল ও মানাকিব অস্বীকারকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সেগুলো বর্ণনাকারীদেরও সংখ্যাধিক্য ঘটেছিলো। অন্যথায় প্রকৃত সত্য এই যে, চার ইমামের প্রত্যেকেরই এমন গুণ ও ফাযায়েল রয়েছে যা ইনসাফের মানদণ্ডে লেখা হলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতামতের বাইরে মোটেই যাবে না।

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের কয়েকটি দিক, যার যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি

বহু ইতিহাস গবেষক যারা হযরত আলী (রা)-এর জীবনচরিত ও তাঁর খিলাফতকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে থাকেন তারা মনে করেন, হযরত আলী (রা)-এর যাবতীয় যুদ্ধ তৎপরতা শুধু যে ইরাকী ও শামীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো তা নয়, বরং আহলে কিবলা তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে যেমন দেশ ও অঞ্চল বিজিত হয়ে ছিলো সেখানে ইসলামের শাসন বন্ধন সুসংহত করা, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধর্মত্যাগীদের শায়েস্তা করা এবং ফিতনা সৃষ্টিকারীদের দমন করার ব্যাপারে তার কোন তৎপরতা ছিলো না। নতুন

নতুন এলাকা জয় করা এবং ইসলামী ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ চিন্তা তো কোন প্রশ্নই ছিলো না।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে হযরত আলী (রা)-এর চরিত্রের এ দিকটির প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারেও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ফলে ইরাক ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে খবরাখবরের স্থলে অনেকটা চাপা পড়া অবস্থায় রয়ে গেছে। এখানে আমরা কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর সীরাত ও ঘটনাবলীর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রসঙ্গত এতদসংক্রান্ত যে সকল তথ্য বর্ণিত হয়েছে তার যৎসামান্য উল্লেখ করছি।

তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো পারস্য ও কিরমানের অধিবাসীদেরকে ইমামের নিকট খারাজ আদায়ে বাধ্য করা এবং খারাজ পরিশোধে ইমাম ও খিলাফতের আনুগত্য অস্বীকার ও বিদ্রোহের ফিতনা পূর্ণরূপে দমন করা। ৩৯ হিজরীর ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ইবনে জাবীর তাবারী রচিত 'তারীখুল উমাম ও মুলূক' নামক ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে।

ইবনুল খাযরামী যখন নিহত হলেন এবং আলী (রা)-এর ব্যাপারে মানুষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লো, তখন পারস্য ও কিরমানের অধিবাসীরা খারাজের বিধান লংঘনে প্রলুব্ধ হলো এবং সকল এলাকার লোকেরা সন্নিহিত এলাকার ওপর দখল কায়েম করে নিয়োগকৃত প্রশাসকদের বের করে দিলো।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, পারস্যবাসী যখন খারাজ প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো তখন আলী (রা) পারস্যের প্রশাসনে একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করার ব্যাপারে লোকদের পরামর্শ চাইলেন। তখন জারিয়া ইবনে কুদামা তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কি আপনাকে এমন লোকের সন্ধান, দেব না, যিনি মনোভাবে কঠোর ও শাসনকার্যে বিজ্ঞ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে একাই যথেষ্ট?

তিনি বললেন, কে তিনি? জারিয়া ইবনে কুদামা বললেন, তিনি হলেন যিয়াদ। আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, তিনি এ কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি। তখন তিনি তাঁকে পারস্য ও কিরমানের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন এবং চার হাজার সৈন্যের বাহিনীসহ তাঁকে পারস্য ও কিরমান অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যিয়াদ সমগ্র অঞ্চল পদানত করলেন। ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা সোজা পথে ফিরে এলো।

শা'বী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা যখন আনুগত্য বর্জন করলো এবং খারাজ আদায়কারীরা খারাজের বিধান লংঘনে প্রলুব্ধ হলো এবং হযরত আলী (রা) নিযুক্ত প্রশাসক সাহাল ইবনে হানীফ (রা)-কে পারস্য থেকে বের করে দিলো তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-কে বললেন, পারস্যের ব্যাপারে আমি আপনার জন্য যথেষ্ট হবো। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় এসে যিয়াদকে বিরাট বাহিনীসহ পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করলেন। আর তিনি তাঁর বাহিনীর সাহায্যে পারস্যবাসীকে পদানত করলেন। ফলে তারা খারাজ আদায়ে পুনঃস্বীকৃত হলো।

[তারীখুল উমাম ওয়াল মূলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৯]

এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা)-এর আরেকটি অবদান এই যে, সিন্ধু অঞ্চলে তিনি খিলাফতেরে সময় কতিপয় বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং সিন্ধুর এমন কিছু এলাকা জয় করেছিলেন যা ইতিপূর্বে ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফুতুহুল বুলদান গ্রন্থে বালাযুরী (র) বলেন, আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর খিলাফত কালে ৩৮ হিজরীর শেষ ভাগ এবং ৩৯ হিজরীর প্রথম ভাগে আলী (রা)-এর অনুমতি প্রাপ্ত হলে হারিস ইবনে মুররা আল-আবাদী ঐ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করলেন এবং প্রচুর গনীমতের মাল ও যুদ্ধবন্দী লাভ করলেন, এমন কি একদিনে এক হাজার যুদ্ধবন্দী (দাসরূপে) বণ্টন করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর প্রায় সকল অনুগামীসহ বীকান অঞ্চলে নিহত হলেন। এটা ছিলো ৪২ হিজরীর ঘটনা। বীকান হলো সিন্ধুর খোরাসান সংলগ্ন এলাকা।

[ফুতহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-৩৮]

এ পর্যায়ে তাঁর তৃতীয় কীর্তি হলো খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের একটি দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা যারা ইসলাম গ্রহণের পর আবার ধর্মত্যাগ করেছিলো।

আম্মার ইবনে আবূ মু'আবিয়ার সূত্রে ও তিনি আবূ তোফায়েলের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক দল লোক ধর্মত্যাগ করেছিলো। তারা মূলত খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লোক ছিলো। তাদেরকে দমনের জন্য আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) মা'আকাল ইবনে ফয়েজ তায়মীকে প্রেরণ করলেন। তিনি যুদ্ধের উপযুক্ত লোকদের হত্যা করলেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দী করলেন।

[তাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩]

সন্তান-সন্ততি

ফাতিমা (রা)-এর গর্ভে হযরত আলী (রা)-এর যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন হাসান ও হুসায়ন। কথিত আছে, মুহসিন নামেও তাঁর

একটি পুত্র সন্তান ছিলো যিনি শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এছাড়া হলেন যায়নাতুল কুবরা ও উম্মে কুলসুম। পূর্বেও বলা হয়েছে, এই হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর (রা) বিয়ে করেছিলেন।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর ওফাতের পর যাঁদেরকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের গর্ভজাত হযরত আলী (রা)-এর সন্তানগণ হলেন : আব্বাস, জাফর, আবদুল্লাহ্ ও উসমান। এঁরা সকলে আপন ভ্রাতা হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গে কারবালায় শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর ঔরসজাত আরও দু'জন পুত্র সন্তান হলেন উবায়দুল্লাহ্ ও আবূ বকর। হিশাম ইবনে কালবী বলেন, কারবালায় ইয়াহয়া, মুহাম্মদ আল আসগর, উমর, রোকাইয়া ও মুহাম্মদ আল আওছাতও শাহাদাত বরণ করেছেন।

তাঁর আরেক পুত্র মুহাম্মদ আল-আকবার ইব্‌নুল হানাফিয়া নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি মুসলিম জগতের নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহসী, দানশীল, বিশুদ্ধভাষী। কুরআন-হাদীসের প্রাজ্ঞ আলিম। আবূ বকর ও উমর (রা)-কে অগ্রাধিকার দান করতেন এবং উসমান (রা)-এর প্রশংসা করতেন। ৮১ হিজরীতে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবনে খাল্লিকান (র) বলেন, মুহাম্মদ (র) অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাছাড়া প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। জামাল যুদ্ধের দিন তাঁর পিতার ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিলো। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত অবসানের দু'বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮১ হিজরীর ১ মুহররম ইন্তিকাল করেন। এ সম্পর্কে ভিন্নমতও পাওয়া যায়। বাকীতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। [ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩২]

তাঁর বংশধরের মধ্যে বড় বড় আলিম, মহান সাধক ও সংস্কারক জন্ম লাভ করেছেন। তাঁদের অনেকের পরিচিতি ও জীবনবৃত্তান্ত তাবাকাত ও তারাজিম (শ্রেণী ও পরিচিতি) বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে স্থান লাভ করেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু শহরে এ বংশধারা ছড়িয়ে আছে। সাধারণত এঁরা আলাবী নামে পরিচিত।

ইবনে জাবীর (র) বলেন, হযরত আলী (র)-এর সন্তানদের মধ্যে ১৪ জন পুত্র ও ১৭ জন কন্যা।

ওয়াকিদী বলেন, তবে তাঁর বংশধারা রক্ষা পেয়েছে পাঁচজন দ্বারা। তাঁরা হলেন হাসান, হুসায়ন, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া, আব্বাস ও উমর (রা)।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ভাষা-প্রজ্ঞা

এখানে আমরা হযরত আলী (রা)-এর অসাধারণ প্রজ্ঞা, অতি উচ্চ অলংকার-সমৃদ্ধ ও সাহিত্যরসপূর্ণ ভাষা ও নীতিকথার কিছু নমুনা পেশ করবো যার উদাহরণ অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে তার পূর্বে ওস্তাদ আহমদ হাসান যাইয়াত রচিত 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস'-এর অংশ বিশেষ ধারণ করে এখানে তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে হযরত আলী (রা)-এর চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী ও বক্তৃতা পারদর্শী আর কারো কথা আমাদের জানা নেই। তিনি ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান যাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ থেকে প্রজ্ঞা উৎসারিত হতো এবং আদর্শ বক্তা যাঁর জিহ্বা থেকে ভাষা অলংকারের যেন ফুলকি ঝরতো! তিনি সফল উপদেশদাতা যাঁর উপদেশ কর্ণপথে হৃদয়ের গভীরে গিয়ে রেখাপাত করতো এবং অসাধারণ পত্র-লেখক যাঁর প্রতিটি ছত্রে অতলান্ত যুক্তির প্রকাশ থাকতো। আদর্শ আলোচক যিনি যে কোন বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কথা বলতে পারতেন। সর্বসম্মতভাবেই তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ বক্তা ও সৃজনশীলদের শিরোমণি। [তারীখুল আদাব আল-আরাবী, পৃষ্ঠা-১৭৪]

গবেষক আল-আক্কাদ-এর মন্তব্যও এখানে আমরা যোগ করতে চাই। তিনি বলেন, ইমামের পক্ষ হতে যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ 'বাণী' বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এমন অপূর্ব রীতি ও শৈলীমণ্ডিত যে, প্রচলিত প্রবাদ ও সুপ্রকাশিত ভাষা অনুসরণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম কোন রীতি ও শৈলী আর হতে পারে না। তাই হতবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, ইমামের বাণীসমূহের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি অধিকতর উৎকৃষ্ট ও সুষম। ভাবনিষ্ঠা নাকি প্রকাশ অলংকার নাকি শিল্পকুশলতা!

এই নীতিকথা, উপদেশ বাণী ও প্রবাদ বাক্যসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো নির্ভুল চিন্তা, বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং জীবন ও মানব স্বভাবের সুগভীর অধ্যায়ের কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যেন তা সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা ও নিবিষ্ট অধ্যয়নের সারনির্যাসরূপে পেশ করা হয়েছে। যা হৃদয়ের গভীরে ও জীবনের অতলান্তে প্রবেশের মাধ্যমেই করা সম্ভব।

এখানে আমরা পাঠকবর্গের সামনে বিশাল ভাণ্ডারের সামান্য নমুনা হিসাবে মাত্র বিশটি নীতিবাক্য ও প্রজ্ঞা তুলে ধরছি।

১. قيمة كل امرئ ما يحسنه প্রতিটি মানুষের মূল্য তার যোগ্যতায়।

২. كلموا النسا على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধি পরিমাণ কথা বলো। তোমরা কি চাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মিথ্যা সাব্যস্ত হোন?

৩. احذر صولة الكريم اذا جاء ، وصولة اللئيم اذا شبع অভিজাত লোকের হামলা সম্পর্কে সতর্ক হও যখন সে ক্ষুধার্ত হয়। আর ইতর লোকের হামলা হতে সতর্ক হও যখন সে পূর্ণ উদর হয়।

৪. اجمعوا هذه القلوب والتمسوا لها طرف الحكمة، فانها تمل كما تمل الابدان. হৃদয়সমূহ একত্র করো এবং তা ধরে রাখতে হেকমতের আশ্রয় গ্রহণ করো। কেননা শরীরের ন্যায় হৃদয়ও ক্লান্তি ও একঘেয়েমি বোধ করে।

৫. النفس موثرة للهوى، تخذة بالهوينى ، جامحة الى اللهو ، امارة بالسوء مستوطنة للفجور ، طالبة للراحة، نافرة عن العمل، فان اكرهتها انضيتها، وان اهملتها اردیته নফস হলো প্রবৃত্তির পূজারী। সহজগামী আমোদ-প্রমোদের অভিলাসী, কু-প্ররোচনায় অভ্যস্ত, পাপাচারে আসক্ত, আরামপ্রিয় ও কর্মবিমুখ। যদি তাকে বাধ্য করো তাহলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে ধ্বংসে হয়ে যাবে।

৬. الا لايرجون احدكم الا ربه ، ولايخافن الا ذنبه، ولا يستحى احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم، واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم তোমাদের কেউ যেন আপন প্রতিপালক ছাড়া অন্য কারো আশা না করে এবং তার 'শাস্তি' ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় না করে। তোমাদের কেউ যেন যা জানে না তা শিখতে এবং না জানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে 'জানি না' বলতে সংকোচ বোধ না করে।

৭. الفقر يخرس الفطن عن حجته ، والمقل غريب فى يدته অভাব বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও যুক্তিক্ষেত্রে নির্বাক করে দেয়। অভাবী নিজ দেশেই যেন প্রবাসী!

৮. العجزافة، والصبر شجاعة، والزهد ثروه، والورع جنة অক্ষমতা একটি বিপদ, ধৈর্যের অর্থ সাহসিকতা, ভোগ-বিলাসিতার নির্মোহ অমূল্য সম্পদ এবং ধর্মানুরাগ জান্নাত লাভের মাধ্যম।

৯. الاداب حلل مجددة، والفكر راه صافية শিষ্টাচার হলো চিরনতুন পোশাক এবং চিন্তা হলো স্বচ্ছ আয়না।

১০. اذا قبلت الدنيا على لله اعارته محاسن غيره ، واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه দুনিয়া যখন কারো প্রতি প্রসন্ন হয় তখন অন্যের গুণাবলীও তাকে ধার দেয়, কিন্তু যখন অপ্রসন্ন হয় তখন তার নিজস্ব গুণাবলীও ছিনিয়ে নেয়।

১১. ما اضمر احد شيئا الا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجه (অন্তরে) যে যা-ই গোপন করে তা তার জিহ্বার ফাঁকে বের হয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে।

১২. لا تكن عبد غيرك ، وقد جعلك الله حرًا আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বাধীন বানিয়েছেন তখন তুমি অন্যের গোলাম হয়ো না।

১৩. اياك والاتكال على المنى فانها بضائع النوكى স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার ওপর ভরসা করে বসে থেকো না। কেননা এটা হলো মূর্খ মানুষের পুঁজি।

১৪. الا انبئكم بالعالم كل العلم/ من لم يزين لعباد الله معاص الله، ولم يؤمنهم، ولم يؤيس من روحه তোমাদের কে কি আদর্শ আলিমের পরিচয় বলবো না? যিনি আল্লাহ্র বান্দাদের সামনে আল্লাহ্র নাফরমানিকে মনোহররূপে তুলে ধরেন না এবং তাঁর 'পাকড়াও' সম্পর্কে তাদেরকে নিরুদ্বিগ্ন করে দেন না, এবং তাঁর রহমত সম্পর্কে হতাশ করে দেন না।

১৫. الناس نيام ، اذا ماتوا انتبهوا মানুষ সব বুঝে বেঘোর, মৃত্যু আসা মাত্র তারা জেগে উঠবে।

১৬. الناس اعداء ما جهلوا মানুষ যা জানে না তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে।

১৭. الناس بزمانهم اشبه منهم بابائهم যুগের (স্বভাব প্রকৃতির) সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য পিতৃ সাদৃশ্যের চেয়ে অধিক।

১৮. المرأ مخبوء تحت لسانه মানুষ তার জিহ্বার নীচে লুক্কায়িত থাকে।

১৯. ما هلك امرؤ عرف قدره যে মানুষ আপন মর্যাদার সীমা বোঝে তার কোন ধ্বংস নেই।

২০. ربه كلمة سلبت نعمة কখনো কখনো একটি মাত্র শব্দ বিরাট বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কাব্য চর্চা

হযরত আলী (রা)-এর নামে একটি দীওয়ান বা কাব্য সঙ্কয়নও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বহু লেখক, সাহিত্যিক ও আলিম বুদ্ধিজীবী তাঁর কবিতা উদাহরণ ও দৃষ্টান্তরূপে আবৃত্তি করে থাকেন। তবে সমালোচকগণ দীওয়ানভুক্ত বহু কবিতারই মৌলিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে আসছেন। কোন কোন কবিতা আবার হযরত আলী (রা)-এর সাহিত্যমান থেকেও নিচে।

মুজামুল উদাবা গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবূ মানসূর মুহম্মদ ইব্ন আহমদ আযহারীর স্বহস্তে সংকলিত 'কিতাবুত তাহ্বীর'-এ এ মন্তব্য আমি নিজে পড়েছি।

"আবূ উসমান আল আম্মিনী বলেন, দু'টি কবিতা পংক্তি ছাড়া হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর নামে সম্পৃক্ত কোন কবিতা পংক্তি আমাদের মতে বিশুদ্ধ প্রমাণিত নয়।"

ইব্ন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে কয়েকটি স্থানে হযরত আলী (রা)-এর কবিতা উদ্ধৃত করেছেন এবং সেগুলোর মৌলিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

তিরস্কারমূলক সাহিত্যের অনন্য উদাহরণ

হযরত আলী (রা)-এর জীবন চরিতের এ মর্মান্তিক ও গুরুতর অধ্যায়টির সমাপ্তি টানার পূর্বে তাঁর নিন্দা ও তিরস্কার কাব্যের কতিপয় অনবদ্য উদাহরণ পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি। বস্তুত নিন্দা ও তিরস্কার বিষয়ক বিশ্ব সাহিত্যে হযরত আলী (রা)-এর সাহিত্য অবশ্যই শীর্ষ স্থান লাভের যোগ্য দাবিদার। হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ সমর্থনের প্রবল দাবিদার ইরাকীদের অদ্ভুত স্বভাব-প্রকৃতি ও শুধু সমকালীন নয়, বরং সর্বকালীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে হযরত আলী (রা) যে বিরল আরবীয় অলংকার ও বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন– এ উভয় উপাদান আলোচ্য সাহিত্যের রূপ কাঠামো গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলো।

দেখুন, অবাধ্য সঙ্গী সমর্থক ও উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীর উদ্দেশে কঠোর তিরস্কার বাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন,

كم أداريكم كما تدارى الكار العمرة والثياب المتراعية كلما حيصت من جانب تهتكت من اخر كلما اطل عليكم متسر من متاسر اهل الشام اغلق كل رجل منكم يابه واجحر انجحا الضبة فى حجرها والضبع فى وجارها .

"শীর্ণ উট ও জীর্ণ বস্ত্রের যেরূপ যত্ন নেয়া হয়, তেমন করে আর কত যত্ন নিতে হবে তোমাদের আমার! জীর্ণ বস্ত্র এক দিকে সেলাই করলে অন্য দিক যেমন ছিঁড়ে যায় তেমনি হয়েছে তোমাদের দশা।"

যখনই সিরিয়ার কোন ক্ষুদ্র বাহিনী উঁকি দেয় তখনই তোমাদের প্রত্যেকে তার ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দেয় এবং গুঁইসাপের মতো গর্তে ঢুকে পড়ে এবং হায়েনার মতো বাসগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

আরেকবার তিনি বলেছেন,

الذليل والله من نصر تموه، ومن ربى بكم فقد رمى بافوق ناصل انكم والله لكثير فى الباحات تحت الرايات وانى لعالم بما يصلحكم ويقيم اودكم وكلنى والله لاأرى اصلاحكم بافساد نفسى اضرع الله خدو دكم واتعس جدو دكم لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ولا تبطلون الباطل كابطالكم الحق.

"আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যার সাহায্যকারী হবে সে অপদস্থ হবে। আর যে তোমাদেরকে তীররূপে ব্যবহার করবে সে ফলাহীন ও ভাংগা তীর নিক্ষেপ করবে।

অল্লাহ্‌র শপথ! খোলা মাঠে তোমরা সংখ্যায় বিপুল কিন্তু যুদ্ধের ঝাণ্ডাতলে তোমাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।"

অবশ্য আমি জানি তোমাদের সংশোধনের ও সোজা পথে আনয়নের উপায় কি? কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নিজেকে নষ্ট করে তোমাদের সংশোধন চাই না।

আল্লাহ্ তোমাদের অপদস্থ করুন ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের দুর্ভাগা করুন। বাতিলের সাথে তোমাদের যত নিবিড় পরিচয় সত্যের সাথে তত নয় এবং সত্যকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেন, বাতিলকে তেমন নয়।

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

اما بعد، يا اهل العراق فانما اتتم كالمرأة الحامل حملت فلما اتمت املصت ومات قيمها وطال تأيمها وورثها ابعدها.

اما والذى نفسى بيده ليظهرن هؤلاء القوم، ليس لا منهم اوحى بالحق منكم، ولكن لا سراعهم الى باطلهم وابطائكم عن حقى ولقد اصبحت الاسم تخاف ظلم رعاتها واصبحت اخاف ظلم رعيتى.

استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا واسمعتكم فلم تسمعوا ودعوتكم سرًا وجهرًا فلم تستجيبوا ونصحت لكم فلم تقبلوا.

অতঃপর হে ইরাকবাসিগণ, তোমরা হলে সেই গর্ভবতী নারীর মতো, প্রসবাসন্ন অবস্থায় যার গর্ভপাত হয়ে গেলো, এমন কি তার রক্ষাকর্তা স্বামীরও মৃত্যু হলো এবং তার বৈধব্যকাল দীর্ঘ হলো এবং তাঁর দূরতম সম্পর্কের লোক তার (সম্পত্তির) উত্তরাধিকার লাভ করলো।

যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি শোনো, অবশ্যই এরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে। তবে এজন্য নয় যে, তারা তোমাদের চেয়ে অধিক হকপন্থী, বরং এজন্য যে, তাদের বাতিলের প্রতি তারা ধাবমান, অথচ আমার হকের প্রতি তোমরা অতি ধীরগামী, বিভিন্ন জাতি তো তাদের শাসকদের জুলুমের ভয়ে শংকিত কিন্তু আমি আমার প্রজা সাধারণের জুলুমের ভয়ে শংকিত!

আমি তোমাদেরকে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু তোমরা জিহাদে বের হওনি এবং আমি তোমাদেরকে তোমাদের কল্যাণের কথা শুনিয়েছি কিন্তু তোমরা তাতে কর্ণপাত করনি। তোমাদেরকে আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে সত্যের পথে ডেকেছি, কিন্তু তোমরা সাড়া দাওনি। আমি তোমাদের উপদেশ দিয়েছি কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করনি।

شهود كغياب وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها واغظكم بالوعظة البالغة فتتفرقون عنها واحثكم على جهاد اهلى البغى فما اتى على اخر قولى حتى اراكم متفرقين ايادى سبأ ترجعون الى بجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم اقومكم غدوة وترجعون الى عشية كظهر الحنية، عجز المقدم واعضل المقوم.

"তোমরা উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিতের মতো এবং শাসিত হয়েও শাসকের মতো। আমি তোমাদেরকে 'হিকমত' তিলাওয়াত করে শোনাই, অথচ তোমরা তা থেকে পলায়ন কর, আর আমি তোমাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ দান করি কিন্তু তোমরা তা উপেক্ষা করে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাও। আর আমি তোমাদেরকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই দেখি তোমরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছো। নিজ নিজ মজলিসে তোমরা ফিরে যাও

এবং যাবতীয় উপদেশ ভুলে যাও। সকালে তোমাদেরকে আমি সোজা করি কিন্তু সন্ধ্যায় দেখি ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেছো। ফলে সংশোধক হতাশ হয়ে পড়েছে আর সংশোধিতরা আরো কঠিন হয়ে পড়েছে।"

অন্য প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "হে আমার জাতি! যাদের শরীর হাযির কিন্তু বুদ্ধি গায়েব ও আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন এবং যাদের নেতাগণ তাদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত! তোমাদের নেতা তো আল্লাহ্র আনুগত্য করেন কিন্তু তোমরা তাঁর অবাধ্যতা কর। ওদিকে সিরিয়াবাসীদের নেতা আল্লাহ্র নাফরমানি করে, অথচ তারা তার আনুগত্য করে। আল্লাহ্র শপথ! আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, মু'আবিয়া যদি 'দিনারের বিনিময়ে দিরহাম' এই ভিত্তিতে আমার সাথে তোমাদেরকে বিনিময় করতেন এবং তাদের থেকে একজনকে দিয়ে আমার কাছ থেকে তোমাদের দশজন নিতেন তাহলে আমি সানন্দে তাতে রাজী হতাম।

সত্যের ব্যাপারে বহুধাবিভক্ত যুদ্ধের প্রতি নিস্পৃহ, দেহগুলো একত্র সমবেত কিন্তু হৃদয়গুলো বিচ্ছিন্ন। আল্লাহ্র বিধানগুলো লংঘিত হতে দেখেও তারা ক্রুদ্ধ হয় না। এরা আরবের অভিজাত শ্রেণী এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু মনের অমিল অবস্থায় সংখ্যাধিক্যে কোন লাভ নেই। আমি তোমাদেরকে দিয়ে চিকিৎসা লাভ করতে চাই, অথচ তোমরাই হলে আমার ব্যাধি।

আমি যেন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা গুঁইসাপের মতো অর্থহীন শব্দ করছো। কিন্তু নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট নও এবং জুলুম প্রতিরোধেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নও। যুদ্ধের মাঠে যেমন তোমরা সাহসী পুরুষ নও তেমনি একান্ত মুহূর্তে নও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি তোমাদের সঙ্গ প্রত্যাশী কিন্তু তোমরা আমার লোকবল নও।

অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হে লোক সকল, যাদের দেহ একত্র কিন্তু হৃদয় বিভক্ত, তোমাদের কথা জন্ম বধিরকেও দুর্বল করে আর তোমাদের আচরণ শত্রুকে তোমাদের প্রতি প্রলুব্ধ করে। তোমাদের যিনি আহ্বান জানাবেন তার আহ্বানের কোন মর্যাদা নেই এবং তোমাদেরকে নিয়ে যিনি দুর্ভোগ পোহাবেন তার অন্তরে স্বস্তি নেই। মিথ্যা অজুহাতে তোমরা গোমরাহির পথে ধাবমান। তোমাদের বাসভূমি হাত ছাড়া হওয়ার পর আর কোন্ বাসভূমি রক্ষা করবে এবং আমার পরে আর কোন্ ইমামের পক্ষ হয়ে তোমরা লড়াই করবে। তোমরা যাকে প্রবঞ্চিত করেছ আল্লাহ্র শপথ, সেই হলো প্রবঞ্চিত আর তোমাদের সাহায্যে যে জয় লাভ করবে সে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর দ্বারা জয় লাভ করবে।

[নাহজুল বালাগা]

অষ্টম অধ্যায়

খিলাফতের পর হযরত আলী (রা)

তাঁর খিলাফতকালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, ভোগ-বিলাসীতায় নির্মোহতা- প্রশাসক, সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি তার আচরণ, শিক্ষা ও দীক্ষা দানকারী এবং সংশোধনকারী, ইমাম রূপে তাঁর শাসননীতি এবং তার ন্যায়পূর্ণ বিশ্লেষণ হযরত আলী (রা)-এর শাসননীতিই তাঁর জন্য উপযোগী এবং বিকল্পহীন হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত, তদানীন্তন ইসলামী সমাজ অবলোকন।

অষ্টম অধ্যায়

খিলাফতের পর হযরত আলী (রা)

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

নবী ﷺ -এর পর ইসলামের ইতিহাসে যেসব মহান ব্যক্তিত্ব বিগত হয়েছেন তাঁদের এমন কোন 'চরিত্র-বিবরণ' খুব কমই বর্ণিত হয়েছে যাতে তাঁদের চিন্তা ও অনুভূতি, মনোভাব ও প্রবণতা এবং স্বভাব-প্রকৃতি ও যোগ্যতার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে, যেমনটি আমরা পাই হযরত আলী (রা)-এর সাথী যিরার ইব্‌ন যামুরাহপ্রদত্ত বিবরণে। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর প্রস্তাবনায় তারই সম্মুখের এ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছিলো। ফলে তাতে প্রেম ও ভক্তির ভাবাবেগ, পরিস্থিতির নাযুকতা ও দায়দায়িত্বের পূর্ণ অনুভূতি এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দানের নির্ভীকতার এক অপূর্ব 'সম্মিলন' ঘটেছে। ফলে তা হয়েছে অত্যন্ত সারগর্ভ ও অলংকারসমৃদ্ধ এক বিবরণ এবং সত্য প্রকাশ ও সত্য সাক্ষ্যের এক নির্ভীক উদাহরণ, বিবরণ এই–

"হযরত আবূ সালেহ বলেন, মু'আবিয়া (রা) একবার যিরার ইব্‌ন যামুরাহ (রা)-কে বললেন, আমাকে আলীর বিবরণ শোনাও। তিনি বললেন, আমাকে কি এ বিষয়ে অব্যাহতি দিতে পারেন? মু'আবিয়া (রা) বললেন, না, বরং তার বিবরণ শোনাও। তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে কি এ বিষয়ে অব্যাহতি দিতে পারেন? মু'আবিয়া (রা) বললেন, না, তোমার অব্যাহতি নেই। তখন তিনি বললেন, তাই যদি হয় তাহলে শুনুন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি ছিলেন বহুমুখী শক্তির বিশাল ব্যক্তিত্বের এক মানুষ। অকাট্য কথা বলতেন, ন্যায়ানুগ বিচার করতেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যেন তাঁর থেকে শতধারায় উৎসারিত হতো! দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের প্রতি অপরিচয়-ভীতি বোধ করতেন এবং অন্ধকার রাতের নির্জনতার প্রতি অন্তরঙ্গতা বোধ করতেন। আল্লাহ্‌র শপথ! সদা অশ্রু বর্ষণ ও চিন্তামগ্নতা ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। হাত নেড়ে অনুতাপ করতেন এবং আত্মতিরস্কার করতেন। মোটা কাপড় ও মোটা খাবার ছিলো তাঁর প্রিয়।

আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাদেরই মতো সাধারণ একজন ছিলেন। প্রশ্ন করলে (অম্লানভাবে) তার জবাব দিতেন। তাঁর কাছে গেলে নিজে থেকে আমাদের সাথে কথা বলতেন। আমরা দাওয়াত দিলে আমাদের কাছে যেতেন।

আল্লাহ্র শপথ। যদিও তিনি আমাদেরকে সান্নিধ্য দান করতেন এবং আমাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন তবুও সমীহের কারণে আমরা আগে বেড়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। কখনো মুচকি হাসলে পরিপাটি মুক্তা যেন প্রকাশ পেতো! দীনদারদের ইজ্জত করতেন এবং মিসকীনদের ভালোবাসতেন। সবলকে তার অন্যায় কর্মে প্রশ্রয় দিতেন না এবং দুর্বলকে ন্যায়বিচার থেকে হতাশ করতেন না।

আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, কোন কোন অবস্থায় তাঁকে আমি দেখেছি, রাত তখন অন্ধকারের পর্দা টেনে দিয়ে ছিলো এবং তারার প্রদীপ নিভে গিয়েছিলো। তখন তিনি মেহরাবে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন আর মুমূর্ষু আহত ব্যক্তির মতো ছটফট করছেন এবং দুঃখী মানুষের মতো অঝোরে কেঁদে চলেছেন। এখনো যেন আমি শুনতে পাই তাঁর সেই ব্যাকুল রোনাযারি! তিনি বলছিলেন, হায়রে দুনিয়া, আমার পিছু নিয়েছো তুমি। আমাকে ভোলাতে এমন সাজ সেজেছো তুমি! দূর হও। দূর হও, ধোঁকা দিতে হলে অন্যত্র যাও। আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি। সুতরাং তোমাকে আর ঘরে তুলছি না। কেননা তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আরাম-আয়েশ তুচ্ছ, অথচ বিপদ ভয়ংকর। হায়, সফর তো বহু দূরের, পথও অচেনা, অথচ পাথেয় কত সামান্য।"

বর্ণনাকারী আবূ সালেহ্ বলেন, তখন মু'আবিয়া (রা)-এর চোখে যেন অশ্রুর বাঁধভাঙ্গা ঢল নামলো এবং দাড়ি ভেসে গেলো। উপস্থিত লোকেরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। মু'আবিয়া (রা) তখন বললেন, আবুল হাসানকে আল্লাহ্ রহম করুন। আল্লাহ্র শপথ এমনই ছিলেন তিনি। আচ্ছা যিরার, তাঁর মৃত্যুতে তোমার শোক কেমন? তিনি বললেন, কোলের সন্তানকে কোলে জবাই করা হয়েছে যে মায়ের তার মতো শোক। তার দুঃখের আহাজারি কি থামতে পারে? তার চোখের পানি কি শুকাতে পারে? [সাফওয়াতুস সাফওয়া, পৃষ্ঠা ১২১-১২২]

দুনিয়াবিমুখিতা ও মোহহীনতা

তাঁর জীবনের সর্বাধিক সমুজ্জ্বল গুণ-বৈশিষ্ট্য ছিলো অতি উচ্চ পর্যায়ের যুহদপূর্ণ জীবন, অথচ সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের উপায়-উপকরণ ছিলো অতি সুলভ, ক্ষমতা ছিলো একচ্ছত্র, আর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো এমন যে, কোন রকম সমালোচনা ও কৈফিয়তের উর্ধ্বে ছিলো তাঁর অবস্থান।

ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন আলী ইব্ন জা'আদ হতে এবং তিনি হাসান ইব্ন সালিহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা)-এর

মজলিসে একবার যাহিদগণের আলোচনা হলো। তখন তিনি বললেন, দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ যাহিদ হলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫]

দুনিয়ার প্রতি তাঁর যুহদ ও নির্মোহতার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে, বস্তুত এগুলো হলো অসংখ্য থেকে নগণ্য।

আবূ ওবায়দ হযরত আনতারাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'খোরনক' অঞ্চলে অবস্থানরত হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে আমি হাযির হলাম। তিনি একটি মাত্র কম্বল গায়ে জড়িয়ে শীতে কাঁপছিলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তো এই সরকারি কোষাগারে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য হিসসা রেখেছেন, অথচ গরম বস্ত্রের অভাবে আপনি শীতে কাঁপছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ। আমি তোমাদের মাল থেকে কিছুই নেই না। আর মদীনা থেকে এ কম্বলটাই শুধু সঙ্গে করে এনেছিলাম।

হুলইয়াতুল আউলিয়া কিতাবে আবূ নাঈম যামীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) 'আকবরা' অঞ্চলে তাঁকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) আমাকে বললেন, যোহরের সময় আমার কাছে চলে এসো। আমি যথাসময়ে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। পথ রোধ করবে এমন কোন দারোয়ান সেখানে আমি দেখলাম না। তিনি বসে ছিলেন, তাঁর সামনে একটি পেয়ালা এবং পানির একটি মশক ছিলো। তিনি একটি 'থলে' আনালেন। আমি মনে মনে বললাম, কোন হিরা-জহরত দান করার জন্যই আমাকে তিনি কষ্ট দিয়েছেন। আমি জানতাম না তাতে কী ছিলো। দেখি যে, থলের মুখ মোহর আঁটা। তিনি মোহর ভাঙ্গলেন। দেখা গেলো যে, তাতে ছাতু রয়েছে। তিনি ছাতু বের করে পেয়ালায় ঢাললেন এবং তাতে পানি মিশিয়ে শরবতের মতো করে নিজেও পান করলেন। আমাকেও পান করালেন। আমার আর ধৈর্যে মানলো না। তাই বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, ইরাকে আপনি এমন করছেন, অথচ ইরাকে তো প্রচুর খাদ্য! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কৃপণতাবশত আমি তাতে মোহর এঁটে রাখিনি। তবে আমি আমার প্রয়োজন পরিমাণ খরিদ করে থাকি। এখন আমার আশংকা হয় যে, এটা শেষ হয়ে গেলে অন্য কিছু দিয়ে আমার খাবার তৈরি হবে। এজন্যই আমার এ সাবধানতা। কেননা হালাল ছাড়া অন্য কোন খাদ্য আমার উদরে প্রবেশ করবে, এটা আমার অপছন্দ।

[১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮২]

তাঁর সামনে একবার ফালুদা নামের হালুয়া পেশ করা হলো। তখন তিনি বলেন, স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে তুমি অতি উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু আমার নফস যাতে অভ্যস্ত নয় তাতে তাকে অভ্যস্ত করে আমি বিপদে পড়তে চাই না।

[প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১]

যায়দ ইব্‌ন ওয়াহব (র) বলেন, একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় হযরত আলী (রা) আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন। তাতেও তালি ছিলো। তাঁকে যখন এ বিষয়ে বলা হলো তখন তিনি বললেন, এ কাপড় দু'টি আমি এজন্য পরিধান করি যে, তা যেন আমাকে অহংকার হতে অধিক দূরে রাখে ও আমার নামাযের জন্য অধিক উত্তম হয় এবং মু'মিনদের জন্য আদর্শ হয়। [আল মুন্তাখাব, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮]

মুজাম্মা ইব্‌ন সাম'আন তায়মী (র) বলেন, হযরত আলী (রা) তাঁর তলোয়ারখানা বাজারে নিয়ে গেলেন এবং এই বলে আওয়াজ দিলেন, আমার এ তলোয়ারখানা কে খরিদ করবে? লুঙ্গি কেনার জন্য চারটি দিরহাম আমার কাছে থাকলে এটা আমি বিক্রি করতাম না [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাযীন (র) বলেন, একবার আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি আপ্যায়নের জন্য আমাদের সামনে 'খাযবারা' পেশ করলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনার 'শুভ' করুন। যদি এই হাঁসটা জবাই করতেন তাহলে ভালো হতো। কেননা আল্লাহ্ তো প্রাচুর্য দান করেছেন! তিনি বললেন, হে ইব্‌ন রাযীন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

لا يحل للخليفة من مال الله الا قصعتان، فصعة يأكلها هو واهله وقصعة يضعها بين ايدى الناس.

"খলীফার জন্য বায়তুলমাল হতে দু'টি পেয়ালার অধিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। একটিতে তিনি ও তাঁর পরিবার খাবেন আর অন্যটি আপ্যায়নের জন্য মানুষের সামনে পেশ করবেন।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩]

হযরত আবূ ওবায়দ বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) এক বছর তিনবার ভাতা প্রদান করলেন, সে বছর ইস্পাহান হতে কিছু সম্পদ এসেছিলো। তখন তিনি বললেন, এসো, চতুর্থ ভাতা গ্রহণ কর, আমি তোমাদের কোষাধ্যক্ষ নই। তখন একদল লোক তা গ্রহণ করলো, আরেক দল ফিরিয়ে দিলো।

একবার তিনি লোকদের মাঝে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল! সেই আল্লাহ্র শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমাদের

(বায়তুল) মাল থেকে কম বা বেশি কিছু গ্রহণ করি না, তবে এইটে ছাড়া। একথা বলে তিনি তাঁর জামার হাতা থেকে আতরের একটা শিশি বের করলেন, আর বললেন, এক দিহ্‌কান (প্রধান) এটা আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বায়তুলমালে গিয়ে বললেন, নাও, এটা রেখে দাও। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন!

افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم تمرة.

"সফলকাম ঐ ব্যক্তি যার রয়েছে এক ঝুড়ি খেজুর আর প্রতিদিন তা থেকে একটি খেজুর খেয়ে সে জীবন ধারণ করে।"

হুরায়রা ইব্‌ন ইয়ারীম বলেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে আমি মানুষের মাঝে ভাষণ দানকালে একথা বলতে শুনেছি :

হে লোক সকল, এমন এক ব্যক্তি গতকাল তোমাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন যিনি সাদা বা হলদে (অর্থাৎ রৌপ্য বা স্বর্ণ) কোন সম্পদই রেখে যাননি। তবে তাঁর ভাতা থেকে উদ্বৃত্ত সাত'শত দিরহাম ছিলো যা দ্বারা তিনি একটি খাদিম খরিদ করতে চেয়েছিলেন।

[মুসান্নাফে আবূ শায়বা, কিতাবুল ফাদাইল, ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪]

সম্পদে ও পানাহারে কৃচ্ছ্র অবলম্বনের চেয়ে কঠিন কাজ হলো শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ক্ষমতার বিন্দুমাত্র প্রদর্শন না করে একজন সাধারণ অমুসলমান বাদীর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিচারকের বিচার ও শরীয়তের ফায়সালা অম্লান বদনে মেনে নেয়া। নিম্নোক্ত ঘটনায় হযরত আলী (রা)-এর আলোচ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠেঃ

ইমাম হাকিম হযরত শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন, জামাল যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রা)-এর একটি 'লৌহবর্ম' হারিয়ে গেল এবং একজন লোক তা পেয়ে বিক্রি করে ফেললো। পরে সেটা পাওয়া গেলো জনৈক ইহূদীর নিকট। হযরত আলী (রা) বিচারক শোরায়হের বরাবরে তার বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করলেন। হযরত আলী (রা)-র পক্ষে হযরত হাসান ও তাঁর আযাদকৃত দাস কম্বর সাক্ষ্য দান করলেন কিন্তু কাযী শোরায়হ বললেন, হাসানের স্থলে অন্য কোন সাক্ষী পেশ করুন। হযরত আলী (রা) বললেন, আপনি 'হাসান'-এর সাক্ষ্য রদ করতে চান? তিনি বললেন, না, তবে আপনার নিকট হতেই আমি হাদীস শুনে স্মরণ রেখেছি যে, পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অতঃপর তিনি ইহূদীকে বললেন, লৌহবর্ম নিয়ে যাও। তখন

বিস্ময়াভিভূত ইহূদী বলে উঠলো, আমীরুল মু'মিনীন! আমার সাথে আপনি মুসলমানদের কাযীর দরবারে হাযির হলেন। আর তিনি আপনার বিপক্ষে রায় দিলেন এবং সে রায় আমীরল মু'মিনীন অম্লান বদনে মেনে নিলেন! আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সত্য বলেছেন, অবশ্যই এটা আপনার লৌহবর্ম।

আপনার এক উটের পিঠ থেকে তা পড়ে গিয়ে ছিলো আর আমি তা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল।

তখন হযরত আলী (রা) লৌহবর্মটি তাঁকে দান করলেন এবং অতিরিক্ত সাত 'শ দিরহাম প্রদান করলেন। এই নও মুসলিম হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গেই ছিলেন এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

[কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬]

এই অসাধারণ যুহদ ও কৃচ্ছ্র, এবং পরহেযগারি ও দীনী কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে রূঢ়তা, রুক্ষতা, অপ্রসন্নতা ও নিরসতার কোন স্থান ছিলো না, বরং তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র ও সুপ্রসন্নচিত্ত মানুষ, যথেষ্ট পরিমাণ রসপ্রিয়তাও ছিলো তাঁর মাঝে। তাঁর বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে!

"তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সুস্মিত এবং কোমল পদক্ষেপে মাটিতে বিচরণকারী।" [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৩]

প্রশাসক, কর্মচারী ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আলী (রা)-এর আচরণ

প্রশাসক ও সরকারী কাজে নিযুক্ত অন্যদের সঙ্গে এটাই ছিলো তাঁর আচরণ নীতি আর সম্ভবত একজন শাসক ও খলীফার জন্য কার্যত এটা আত্মকৃচ্ছ্র ও আত্মকঠোরতার চেয়ে কঠিন বিষয় ছিলো। প্রশাসকদের প্রতি তাঁর বারংবার প্রদত্ত উপদেশ বাণী ছিলো এই–

"নিজেদের ব্যাপারে মানুষের প্রতি তোমরা ন্যায়পূর্ণ আচরণ করবে এবং তাদের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন নিরসনে ধৈর্যের পরিচয় দেবে। কেননা এরা হলো প্রাপ্তির অধিকারী প্রজা সাধারণ। কাউকে তার প্রয়োজন হতে সরিয়ে রাখবে না, আটকে রাখবে না এবং খিরাজ (ও রাজস্ব) আদায় করতে গিয়ে মানুষের শীত-গরমের বস্ত্র, সওয়ারির পশু ও দাস বিক্রি করে ফেলবে না। আর দু'একটি দিরহামের জন্য কাউকে চাবুক মারবে না।

খিরাজ ও সাদকা আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর জারিকৃত একটি ফরমান ছিলো এই

"ভাবগম্ভীর ও প্রশান্তভাবে তাদের নিকট গমন করবে। যখন তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবে তখন তাদেরকে সালাম করবে এবং তাদের প্রতি সম্ভাষণে কোন ক্রটি করবে না। অতঃপর তুমি বলবে, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিযুক্ত অভিভাবক ও খলীফা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের সম্পদে নির্ধারিত আল্লাহ্র হক গ্রহণ করি। সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিযুক্ত অভিভাবকের নিকট পরিশোধ করার কোন হক কি তোমাদের সম্পদে রয়েছে? কেউ যদি 'না' বলে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবে না।

পক্ষান্তরে যদি কোন দানকারী তোমাকে দান করতে চায় তাহলে তার সঙ্গে গমন করবে কিন্তু তাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে না। হয়রানি ও নাজেহাল করবে না এবং যে পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য দান করে তা গ্রহণ করবে। যদি তার নিকট গবাদি পশু ও উট থেকে থাকে তবে তার অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করবে না। কেননা এর অধিকাংশই তার। যখন তুমি পশুপালের নিকট হাযির হবে তখন দখলকারী রুক্ষ ও কর্কশ ব্যক্তির ন্যায় সেখানে প্রবেশ করবে না এবং প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে না। পশুপাল নিয়ে মালিকের সঙ্গে অসদাচরণে লিপ্ত হবে না। পুরো পালকে দু'ভাগে ভাগ করে তাকে ইখতিয়ার দেবে। সে যেভাবে পছন্দ করবে তাতে আর হাত দিতে যাবে না। অতঃপর অবশিষ্ট মালকে আবার দু'ভাগ করবে এবং মালিককে (বাছাইয়ের) ইখতিয়ার প্রদান করবে। অতঃপর যে ভাগ সে নিজে পছন্দ করবে তাতে হাত দেবে না। এরূপ করতে থাকবে যতক্ষণ না পালে এই পরিমাণ পশু থেকে যায় যা তার সম্পদের ধার্যকৃত আল্লাহ্র হকের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তখন তার কাছ থেকে আল্লাহ্র হক গ্রহণ করবে। যদি সে অব্যাহতি প্রার্থনা করে তাহলে তাকে অব্যাহতি দান করবে। [নাহজুল বালাগা, পৃষ্ঠা-৩৮১]

শিক্ষা ও দীক্ষা দানকারী সংশোধক ইমাম

হযরত আলী (রা) নিছক একজন প্রশাসনিক প্রধান কিংবা সাধারণ অর্থে মুসলমানদের খলীফা মাত্র ছিলেন না, যেমনটি হয়েছিলো উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের ক্ষেত্রে, বরং তিনি ছিলেন প্রথম দুই খলীফার নীতি ও আদর্শের অনুসারী। ফলে একদিকে তিনি যেমন ছিলেন মুসলমানদের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক তেমনি অন্যদিকে ছিলেন মুসলমানদের শিক্ষা ও দীক্ষা দানকারী

একজন আধ্যাত্মিক মুরুব্বী। উম্মাহর সামনে নববী জীবন চরিতের এক উত্তম নমুনা। মুসলমানদের দীন, ঈমান, আমল-আখলাক ও জীবনযাত্রায় তাঁর প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি ছিলো, যেন ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুমহান আদর্শ থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুতি না ঘটে ইসলামী উম্মাহর। বিজিত দেশ ও জাতিসমূহের স্বভাব-প্রকৃতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি যেন তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তিনি মুসলমানদের ইমামতি করতেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও ধর্ম শিক্ষা দান করতেন। দুনিয়ার জীবনে মুসলমানদের কাছ থেকে আল্লাহ্ কি চান এবং কি অপছন্দ করেন সে সম্পর্কে তিনি তাদের জ্ঞান দান করতেন। মসজিদে বসে তিনি তাদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের দীন ও দুনিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন এবং সমস্যার সমাধান পেশ করতেন। বাজারে ঘুরে ঘুরে তিনি তাদের বেচাকেনা ও লেনদেন প্রত্যক্ষ করতেন এবং উপদেশ দিয়ে বলতেন : আল্লাহ্কে ভয় করো এবং মাপ ও পরিমাপ পূর্ণ করো। মানুষকে তাদের প্রাপ্য জিনিসে ঠকিও না। নিজের ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং রক্ত ও বংশকৌলিন্যের বিন্দুমাত্র 'সুবিধা' তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রয়োজনীয় কিছু ক্রয় করতে হলে তিনি অপরিচিত কোন বিক্রেতা তালাশ করে তার কাছ থেকে কিনতেন। এটা তাঁর খুবই পছন্দ ছিলো যে, আমীরুল মু'মিনীন পরিচয়ে কোন বিক্রেতা তার সঙ্গে কিছুমাত্র রেয়ায়েতমূলক আচরণ করবে। কথায় ও কাজে এবং ভাগ-বাটোয়ারা ও সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সঙ্গে সমতা রক্ষার ব্যাপারে তিনি নিজে যেমন অতি যত্নবান ছিলেন, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত প্রশাসকদের থেকেও তিনি অনুরূপ আচরণ ও নীতির অনুসরণ প্রত্যাশা করতেন। তাই তাদের প্রতি তিনি কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। মাঝে মধ্যে প্রশাসকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব ও মতামত জানার জন্য গোপন পর্যবেক্ষক দল পাঠাতেন। তারা সরেজমিনে সব খোঁজ-খবর জেনে আমীরুল মু'মিনীনের নিকট রিপোর্ট পেশ করতেন। এ কারণে তাঁর অধীনস্থরা তাঁকে খুব ভয় করতো। প্রয়োজন হলে তাদের প্রতি তিনি কঠোর তিরস্কার ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন। প্রশাসকদের নামে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

প্রশাসকদের প্রতি তাঁর এ সতর্ক দৃষ্টি শাসনকার্য ও ইসলামী আইনের বিধি-বিধান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তাদের ব্যক্তিজীবন ও দৈনন্দিন আচার-আচরণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আল্লাহ্কে ভয়কারী, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণকারী প্রশাসকদের মান উপযোগী নয় এমন কোন আচরণে তিনি তাদেরকে কঠোর কৈফিয়তের সম্মুখীন করতেন।

উদাহরণস্বরূপ তাঁর কাছে সংবাদ এলো যে, বসরায় তাঁর নিযুক্ত প্রশাসক উসমান ইব্ন হানীফ আল আনসারীকে এক ভোজসভায় দাওয়াত করা হয়েছিলো, কিন্তু দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামী সাম্যনীতি অনুসরণ করা হয়নি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভও এর উদ্দেশ্য ছিলো না। হযরত উসমান ইব্ন হানীফ সে দাওয়াতে শরীক হয়েছিলেন। তাই হযরত আলী (রা) তাঁর নামে এই মর্মে এক উপদেশ পত্র পাঠালেন:

"অতঃপর, হে ইব্ন হানীফ! আমি সংবাদ পেয়েছি, বসরার কোন এক যুবক তোমাকে দস্তরখানে দাওয়াত দিয়েছিলো, আর তুমি বড় বড় থালা ও রকমফের মজাদার খাবারের লোভে সেদিকে দৌড় দিয়েছো। আমার কিন্তু ধারণা ছিলো না, তুমি এমন লোকদের দস্তরখানে শরীক হতে পারো, যাদের দরিদ্ররা সেখানে অনাদৃত আর ধনীরা সাদরে আমন্ত্রিত।

শোন, এ ধরনের খাবার মুখে দেয়ার আগে চিন্তা করে নিও, যদি সন্দেহযুক্ত মনে হয় তাহলে ফেলে দিও। আর যদি উত্তম বলে নিশ্চিত হতে পারো তাহলে গ্রহণ করো। [নাহজুল বালাগা, পৃষ্ঠা ৪১৬-৪১৭]

হযরত আলী (রা)-এর রাজনীতি ও তাঁর সুবিচার বিশ্লেষণ

হযরত আলী (রা)-এর রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা যে কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত হতো, তা ছিলো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থের ওপর নীতি ও আদর্শ এবং ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। আম্বিয়া কিরামের খিলাফতের মূল প্রাণ রক্ষা করা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা। তিনি মনে করতেন, খলীফা হলেন প্রথমত দীনের প্রধান দাঈ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তারপর তিনি একজন শাসক ও মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রশাসনিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে এই সুমহান নীতি ও আদর্শ সমুন্নত রাখার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন ও মাশুল আদায়ের জন্য তিনি পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং হাসিমুখে অতি সন্তুষ্ট চিত্তে এর চড়া মাশুল তিনি আদায়ও করেছেন।

আলী-মু'আবিয়া বিরোধের মূল ভিত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষক আল-আক্কাদ বড় চমৎকার বলেছেন যে, এটা দু'জন ব্যক্তি মাত্রের বিরোধ ছিলো না, বরং এ বিরোধ ছিলো দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির শাসন ব্যবস্থার কিংবা আধুনিক পরিভাষায় বলা যায় দু'টি ভিন্ন চিন্তাধারার। গবেষক আল আক্কাদ বলেন, বিষয়টি ছিলো দীনী খিলাফত ও দুনিয়াবী সালতানাতের মাঝে বিদ্যমান এক সংগ্রাম। প্রথমটির ধারক ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং দ্বিতীয়টির ধারক ছিলেন হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)। [আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৮৯২]

উভয় সাহাবী ব্যক্তিত্ব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে ভিন্নমুখী নীতি ও পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তার স্বাভাবিক ফলাফলই প্রকাশ পেয়েছিলো, যার মূল কারণ ছিলো যুগের পরিবর্তন। দেশ বিজয়ের বিস্তৃতি, সম্পদের অব্যাহত ঢল ও মুসলিম উম্মাহ যে সকল নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেগুলোর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব, তদুপরি নববী যুগ থেকে কিঞ্চিত দূরত্ব এবং সর্বোপরি প্রথম কাতারের লোকদের বিদায় গ্রহণ যাঁরা মদীনার নববী মাদরাসায় যুহদ ও দুনিয়াবিমুখ পরিবেশে পূর্ণ নববী তরবিয়ত লাভ করেছিলেন। অতি সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ গবেষক আল আক্কাদ সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর সময়কালটি ছিলো তাঁর পূর্বাপর সময়ের মধ্যবর্তী এক বিস্ময়কর সময়কাল কিংবা বলা যায়, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিলো না। কেননা তাতে যেভাবে চলা উচিত ছিলো সেভাবেই চলেছিলো, কিন্তু তা পূর্ণরূপে স্থির ও অবিচল হতে পারেনি। আবার পূর্ণরূপে বিপর্যস্তও হয়ে পড়েনি। কেননা তা ছিলো প্রায় পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত একটি নতুন ভবন। জরাজীর্ণ ভবন ছিলো না যা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে কিংবা ছিলো না এমন সুসম্পূর্ণ ভবন যা আগাগোড়া মজবুত বুনিয়াদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

দুই নীতি ও ব্যবস্থার মাঝে এ বিরোধ ছিলো যুগ বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল, যা মানব স্বভাবের ও জগত প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে তৎকালীন ইসলামী সমাজে দেখা দিয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এ ভিন্নতা হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর অনুকূলে ছিলো। কেননা তাঁর সেনাবাহিনীতে ও শাসনাধীন অঞ্চলে বিরাজমান ছিলো পূর্ণ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও আমীরের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের জযবা। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা)-এর শিবিরে ও শাসন পরিমণ্ডলে বিদ্যমান ছিলো এক ধরনের অস্থিরতা, অনৈক্য ও প্রতিপক্ষ শিবির বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে যে শৈথিল্য ও অবাধ্য স্বাধীনতা ভোগ করে আস ছিলো তার প্রতি ছিলো তাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি। গবেষক আল-আক্কাদ বলেন,

সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট অংশটি হলো হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনাধীন সিরিয়া ও তার সন্নিহিত এলাকা। পক্ষান্তরে সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ অংশটি হলো আলী (রা)-এর শাসনাধীন সমগ্র জাযীরাতুল আরব এলাকা ও তার জনগোষ্ঠী। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬৯]

সুতরাং আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মাঝে বিরোধ একটি বিষয়ের দখল লাভের বিরোধ ছিলো না যা কোন এক পক্ষের জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে, বরং এ বিরোধ ছিলো দু'টি বিপরীতমুখী ব্যবস্থার ও প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি জগতের বিরোধ। একটি ছিলো স্বভাবতই দুর্বিনীত ও অস্থিতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে অন্যটি শাসন ব্যবস্থার বশ্যতা গ্রহণকারী এবং স্থায়িত্ব ও স্থিতিকামী।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯৫]

আলী (রা)-এর শাসননীতিই তাঁর উপযোগী ও বিকল্পহীন

আলোচ্য বিরোধের ফলস্বরূপ যতই অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং বশ্যতা ও আনুগত্যহীনতা প্রকাশ পেয়ে থাকুক এবং আলী (রা) যতই বিভিন্ন অগ্নি-পরীক্ষা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকুন না কেন, তদ্রূপ হযরত মু'আবিয়া (রা) যতই অনুকূল পরিস্থিতি, চিত্ত প্রশান্তি এও নিরংকুশ আনুগত্য ও বশ্যতা লাভ করে থাকুন না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, আলী (রা)-এর শাসননীতিই ছিলো তাঁর উপযোগী এবং এর কোন বিকল্প ছিলো না। গবেষক আল-আক্কাদ তাঁর ইতিহাস-নিষ্ঠা ও নৈতিক সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গে অতি সূক্ষ্ম ও ইনসাফপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে খিলাফত পরিচালনার প্রথম দিন থেকেই হযরত আলী (রা) সেই সর্বোত্তম শাসননীতিই গ্রহণ করেছিলেন যা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে যথার্থ ছিলো। কেননা আমাদের জানা নেই যে, তাঁর কোন সমালোচক কিংবা জীবনচরিতকার যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আর কোন শাসননীতি পেশ করতে পেরেছেন কিনা যা নির্ভুল চিন্তা ও নিরাপদ পরিণতির ক্ষেত্রে তাঁর শাসননীতির চেয়ে উত্তম হতে পারে কিংবা ঘটনা প্রবাহ যে সকল সংকট ও দুর্যোগের মুখে তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলো, সেগুলো রোধ করার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

যে সকল ঐতিহাসিক ও সমালোচক বিভিন্ন যুগ ও যুগের মানুষকে ও (জাতি ও সমাজের) কর্ণধারগণ যে সকল আকীদা, বিশ্বাস, নীতি, মূল্যবোধ ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব সযত্নে লালন করে থাকেন, সেগুলোকে একই মাপকাঠিতে

মেপে থাকেন তারা অতীতে যেমন তেমনি বর্তমানেও হযরত আলী (রা)-এর শাসননীতি ও বিভিন্ন পদক্ষেপের ভুল ধরে থাকেন। তাদের বক্তব্য হলো, হযরত আলী (রা) যদি সিরিয়াতে হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে ও কায়স ইব্ন সা'দকে মিসরের প্রশাসকের পদ হতে অপসারণ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করতেন, উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অর্পণ করতে রাজী হতেন এবং সালিসী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তাহলে যেসব ভয়াবহ যুদ্ধ তিনি পরিপূর্ণ ঈমান ও অসাধারণ সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করেছেন এবং পূর্ণ খিলাফতকালে যেসব সংকট ও দুর্যোগের মুকাবিলা তিনি করেছেন সেগুলো অতি সহজই এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঘটনা ও পরিণতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর গবেষক আল-আক্কাদ এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, বরং ভিন্নমত পোষণ করে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তিনি বলেছেন,

বিভিন্ন দিক থেকে সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তা করে আমাদের যা মনে হয় তা এই যে, যে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছেন তা থেকে ভিন্ন কোন চিন্তা ও পদক্ষেপ বিজয় ও সফলতার এবং বিপদ ও বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তার জামানত দিতে পারতো না। সম্ভবত সফলতার সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে আরো দুর্বল ও বিপদাশংকা আরো প্রবল হতো, যদি তিনি উপদেশ ও পরামর্শের গণ্ডি থেকে বের হয়ে বিকল্প কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি প্রশ্ন রেখেছেনঃ

তাঁর সমকালের কিংবা পরবর্তী কালের কোন সমালোচক কি কখনো নিজেকে এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, হযরত আলী (রা) যা করেছেন তা থেকে ভিন্ন কিছু করা কি তার পক্ষে সম্ভব ছিলো?

কারো মনে কি এ জিজ্ঞাসা কখনো জেগেছে যে, ধরুন, সেই 'অন্য কিছুটা' তিনি করতে পারতেন, কিন্তু ফলাফল কি হতো? এটা কি সুনিশ্চিত যে, যে পরিণতির সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন বিকল্প পদক্ষেপ দ্বারা তার চেয়ে ভাল কিছু তিনি লাভ করতে পারতেন?

আল-আক্কাদ আরো বলেন, তারপর আমরা আবারো বলতে চাই যে, (রাজনৈতিক কৌশল ও সামরিক) চাতুর্য পরিত্যাগ করে হযরত আলী (রা) খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। সকল কৌশল ও চাতুর্য যদি তিনি প্রয়োগ করতেন তাহলেও খুব বেশি লাভবান হতে পারতেন না। কেননা রাজতন্ত্র কিংবা খিলাফত তো অনিবার্য ছিলো!

তাছাড়া তাঁর দায়িত্ব লাভের পূর্বেই যেসব বিরুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, যা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন খলীফা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি সেগুলোর সব দায়ভাগ তাঁর কাঁধে একত্র চেপে বসেছিলো।

হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রা) যে ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তার স্বাভাবিক হিসেবে উত্তরাধিকার ও খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছিলো। আলী (রা) তো তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা) কে খলিফা মনোনীত করার পরিবর্তে বিষয়টি শুরা ও পরামর্শের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অতি আদরের দৌহিত্র, যাঁর সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছিলেন, ان ابنى هذا سيد (আমার এ পুত্র যোগ্য নেতা)।

শাহাদাতের পূর্বে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি খলীফা মনোনীত করবেন না? তিনি বললেন, না, বরং বিষয়টি আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে যাবো যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছেড়ে গিয়েছিলেন। আরয করা হলো, আমাদেরকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ছেড়ে গিয়ে আপন প্রতিপালকের সামনে কি বলে দাঁড়াবেন? তিনি বললেন, আমি বলবো, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে তাদের মাঝে খলীফা বানিয়েছিলেন যখন আপনার ইচ্ছা হয়েছিলো। অতঃপর আপনি আমাকে 'তলব' করেছেন তখন তাদের মাঝে আমি আপনাকে রেখে এসেছি। আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে অকল্যাণও করতে পারেন।

পক্ষান্তরে মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) পুত্র ইয়াযীদের অনুকূলে খিলাফাতের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর পিতা মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তিনিই শাসনভার লাভ করেছিলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬]

হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইতিহাস পর্যালোচনার পর ও উসমান (রা)-এর শাহাদাত-পরবর্তী যে ভয়াবহ ও সংকটপূর্ণ সময়কাল দেখা দিয়েছিলো, ইসলামী সমাজ যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আত্মনীতি ও বহির্গত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়ে ছিলো তা বিশ্লেষণ করার পর আমার মনে হয় যে, হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর মানব স্বভাব সম্পর্কিত সুগভীর জ্ঞান, শাসন পরিচালনার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা অধ্যয়নের আলোকে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন, পূর্ববর্তী তিন খলীফার সযত্ন অনুসৃত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত খিলাফত ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমে বর্তমান আরব ইসলামী সমাজকে নেতৃত্ব দান করা ও বহু জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত এবং সমস্যাবহুল বিশাল বিস্তৃত ইসলামী সালতানাতের শাসনভার পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। সুতরাং তিনি এ ধারণা গ্রহণ করলেন যে, যেসব পরিস্থিতি দেশের নিরাপত্তা ও সমাজের শান্তি-শৃংখলার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামী অভিযান ও বিজয় যাত্রা অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে অনিশ্চিত করে তুলেছে, বর্তমান নাযুক সময়ে সেসব পরিস্থিতির সফল মুকাবিলার জন্য ইনসাফপূর্ণ একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

উক্ত শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসক ব্যক্তিটি আদর্শিকভাবে ইসলামের আকীদা ও শরীয়তের বিধানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামী হদ্দ ও শাস্তিসমূহ, আহকাম ও বিধানসমূহ এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানসমূহ রক্ষা করবেন। তবে শাসন ব্যবস্থায়, প্রশাসন পরিচালনায় ও জনকল্যাণের বেলায় প্রয়োজনবোধে কিছুটা উদারতা অবলম্বন করবেন।

মোটকথা, দেশ ও সরকার ইসলামের সীমানা থেকে তো বের হবে না কিন্তু বিশাল একটি সাম্রাজ্যের প্রাণরূপ ধারণকারী সুবিস্তৃত ইসলামী সালতানাতের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সুকৌশল ও দক্ষতা দ্বারা পরিস্থিতির মুকাবিলা করা, বাস্তব কর্মকৌশল ও বৃহত্তর স্বার্থের আলোকে দেশ-কালের পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সমস্যার মুকাবিলায় উদ্যোগী হওয়া যাবে। সুতরাং উক্ত ইজতিহাদের আলোকে তিনি একজন সামরিক ও প্রশাসনিক শাসকরূপে শাসন পরিচালনা শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يعطى الملك او ملكه من يشاء۔

নবুয়তের ধারা অব্যাহত থাকবে ত্রিশ বৎসর। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করবেন। [আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ্, বাবুস সুলাকা]

নিঃসন্দেহে এটা ছিলো তাঁর এমন এক ইজতিহাদ যা ইসলামের স্বীকৃত ও বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত খিলাফত ধারণার বিপরীত বিষয়। কেননা খিলাফত আলা মিনহাজিন্-নবুয়ত প্রতিষ্ঠার জোর তাকিদ রয়েছে বিভিন্ন হাদীসে এবং সর্বযুগের মুসলিম উম্মাহ্ এ বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত।

ইসলাম গ্রহণে যাঁরা ছিলেন অগ্রগামী, জ্ঞান ও ইলমের ক্ষেত্রে ছিলেন পারদর্শী, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিকতর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ বাস্তবায়নে যাঁরা ছিলেন অধিক যত্নবান। সাহাবায়ে কিরাম তথা হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, আশারা মুবাশারা ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী নেতৃস্থানীয় ফকীহ ও সাহাবা খিলাফতের যে ইসলামী ধারা উপলব্ধি ও গ্রহণ করেছেন এবং দেশ-কালনির্বিশেষে সকল মুসলমানের চিরকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ আদর্শরূপে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা চালিয়ে যাওয়া উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর এ ইজতিহাদ ছিলো খিলাফতের এই সর্বস্বীকৃত ধারণার পরিপন্থী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এ বিষয়ে হযরত আলী (রা)-ই ছিলেন নির্ভুল সিদ্ধান্তের ওপর সমাসীন। [ইযালাতুল খাফা]

একথা নিঃসন্দেহ যে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ তাঁর দ্বারা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। কেননা মুসলিম বাহিনীর অব্যাহত বিজয়, ইসলামের প্রচার, প্রসার, ইসলামী সালতানাতের ক্রমবিস্তার ও সুশৃংখল প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিলো অতুলনীয়। স্বীয় শাসনকালে তিনি এমন সকল দেশে নৌ ও স্থল অভিযান পরিচালনা করেছেন যেখানে ইতিপূর্বে বিজেতা মুসলিম বাহিনীর পদধূলি পড়েনি। একদিকে তাঁর বিজয়াভিযান আটলান্টিক মহাসাগরের জলরাশি গিয়ে স্পর্শ করেছিলো, অন্যদিকে মিসরে নিযুক্ত তাঁর সুযোগ্য প্রশাসক সূদান দখল করে নিয়েছিলেন। নৌবহরকে তিনি এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, তাঁর সময়ে নৌযুদ্ধের পূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা এক হাজার সাত শতে পৌঁছে গিয়েছিলো। এসব যুদ্ধজাহাজ তিনি সমুদ্রপথে অভিযানে প্রেরণ করতেন আর তা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসতো। বেশ কিছু ভূখণ্ড তিনি নৌ অভিযানের মাধ্যমে জয় করেছেন। তন্মধ্যে সাইপ্রাস দ্বীপ ও কতিপয় গ্রীক দ্বীপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে স্থলযুদ্ধের জন্য তিনি শীতকালীন বাহিনী ও গ্রীষ্মকালীন বাহিনী তৈরি করেছিলেন। ফলে সারা বছরই তাঁর যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হতো এবং বিশাল বিস্তৃত ইসলামী সালতানাতের সীমান্ত জুড়ে ছিলো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

৪৮ হিজরীতে তিনি কন্সটান্টিনোপল জয়ের উদ্দেশে স্থল ও নৌপথে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সুরক্ষিত প্রাচীর, নিরাপদ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ও মুসলিম নৌবহরে গ্রীকদের আগুনে তীর বর্ষণের কারণে কন্সটান্টিনোপল জয় করা তখন সম্ভব হয়নি। ঐ বাহিনীতে হযরত ইবনে

আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে যুবায়র, আবূ আইউব (রা) ও ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া শরীক ছিলেন। শহর অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেযবান হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) ইন্তিকাল করেছিলেন। (অছিয়ত মুতাবিক) তাঁকে শহরের বাইরে প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে দাফন করা হয়েছিলো। তাঁর শাসনামলেই সেনাপতি ওকবা ইবনে নাফে আফ্রিকায় প্রবেশ করেছিলেন এবং বারবারীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে ছিলো তারা তাঁর সাথে এসে শামিল হয়েছিলো। কায়রোয়ানকে (তিউনিসিয়াতে) তিনি সেনাছাউনি ও সামরিক কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বহু সংখ্যক বারবারী তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। ফলে ইসলামী সালতানাত আরো বিস্তার লাভ করেছিলো।

[তারীখুল উমাম আল-ইসলামিয়্যা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫]

ড. ফিলিপ হিট্টি বলেন, প্রশাসন পরিচালনায় হযরত মু'আবিয়া (রা) অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সীমাহীন নৈরাজ্যের ভেতর থেকেও তিনি সুশৃংখল একটি ইসলামী সমাজ কায়েম করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং ইসলামী সালতানাতের সর্বপ্রথম রেজিস্ট্রার বিভাগ চালু করেছিলেন। ডাক বিভাগ চালুর প্রচেষ্টাও তিনি শুরু করেছিলেন যা পরবর্তী সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিলো। ফলে সালতানাতের প্রত্যন্ত অঞ্চলও পরস্পর যুক্ত হয়ে পড়েছিলো।

তিনি ছিলেন ক্রোধ-সংযমী, আত্মসম্বরণকারী ও মধুর স্বভাবের মানুষ। তাঁর আচরণ ও স্বভাবের পরিচায়ক একটি বাণী হলো এই:

لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا اضع سوطي حيث يكفيني لساني ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت اذا حدوها خليتها واذا خلوها مددتها.

যেখানে চাতুর্য কাজ চলে সেখানে আমি তলোয়ার চালাই না, তদ্রূপ যেখানে আমার জিহ্বার কাজ চলে সেখানে আমি চাবুক তুলি না, আমার ও মানুষের মাঝে চুল পরিমাণ বন্ধনও যদি থাকে তাহলে আমি তা কর্তন করি না। তারা সুতায় টান দিলে আমি তাতে ঢিল দিই। আর তারা ঢিল দিলে আমি টেনে ধরি।

হযরত মু'আবিয়া (রা) বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও দীনের সুরক্ষার জন্য অতুলনীয় জযবার পরিচয় বহন করে। তদুপরি ছিলো বিস্ময়কর দূরদর্শিতা, প্রশাসনিক

কুশলতা, দীনী আত্মসম্মানবোধ এবং প্রয়োজনে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ ও কল্যাণ অন্য সকল স্বার্থ ও কল্যাণের ওপর অগ্রাধিকার প্রদানের মনোভাব।

এ প্রসঙ্গে তাঁর দীনী আত্মসম্মানবোধের প্রমাণরূপে একটি অমর কীর্তির কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করি। ইবনে কাছীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক তাঁর ও রোম সম্রাটের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবন কাছীর (র) বলেন, রোম সম্রাট ও তার বাহিনী হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ার পরও একবার তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি প্রলুব্ধ হলেন অর্থাৎ রোম সম্রাট হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে আলী (রা)-এর সাথে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত দেখে কোন এক সীমান্তে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটালেন এবং তাঁর ওপর চড়াও হতে প্রলুব্ধ হলেন। তখন হযরত মু'আবিয়া (রা) রোম সম্রাটের নামে এই মর্মে এক হুঁশিয়ারি পত্র পাঠালেন, হে অভিশপ্ত মালাউন! তুমি যদি নিবৃত্ত হয়ে সোজা দেশে প্রত্যাবর্তন না করো তাহলে নির্দ্বিধায় আমি আমার পিতৃব্য আলীর সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হবো এবং তোমার শাসনাধীন সমগ্র এলাকা থেকে তোমাকে আমি বিতাড়িত করবো এবং এই প্রশস্ত পৃথিবী তোমার জন্য সংকীর্ণ করে ছাড়বো।

এই একটিমাত্র ধমকে ভীত-সন্ত্রস্ত রোম সম্রাট হাত গুটিয়ে নিলেন এবং সন্ধি প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করলেন।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯]

এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, হযরত মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) সাহাবা জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁর ফযীলত ও গুণ নিয়ে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর নিন্দা-সমালোচনায় সীমাতিক্রম করার ব্যাপারে খুব সংযত ও সতর্ক হওয়া উচিত। এমন কোন ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা উচিত নয় যা তাঁর সাহাবী শানের উপযুক্ত নয়। কেননা ইমাম আবূ দাঊদ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تسبو اصحابى والذى نفسى بيده لو اسفق لحدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه.

"আমার সাহাবাগণকে গাল-মন্দ করো না। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে

ব্যয় করে তবুও তাদের কোন একজনের 'এক মুদ্দ' বা তার অর্ধেক দানেরও সমান হবে না।"

তাছাড়া আবূ দাউদ হযরত আবূ বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে বলেছেন,

ان ابنى هذا سيد وانى ارجد ان يصلح الله به بين فئتين من امتى وفى رواية لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين.

"আমার এ পুত্র একজন নেতা। আমি আশা করি যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ আমার উম্মতের দু'টি দলের মাঝে সমঝোতা দান করবেন।"

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, হয়তো আল্লাহ্ তার মাধ্যমে বিরাট দু'টি দলের মাঝে সমঝোতা দান করবেন।

দায়লামী হাসান ইব্ন আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি:

لا تذهب الايام والليالى حتى يملك معاوية.

"মু'আবিয়া রাজত্ব লাভ না করা পর্যন্ত দিন-রাতের বিলুপ্তি হবে না।"

কিতাবুশ-শারিয়াহ্ গ্রন্থে আল-আজুররী আবদুল মালিক ইব্ন উমর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) বলেছেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী– يا معاوية! ان ملكت فاحسن

"হে মু'আবিয়া! যদি তুমি রাজত্ব লাভ করো তবে উত্তম আচরণ করবে।"

এ বাণী শোনার পর হতে আমি খিলাফত লাভের আশা পোষণ করে আসছিলাম।

তাছাড়া উম্মে হারাম (রা) হতে বিশুদ্ধ সনদে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন–اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا

"আমার উম্মতের যে প্রথম বাহিনী সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করবে তারা (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে।"

আর মু'আবিয়া (রা)-ই সর্বপ্রথম উসমান (রা)-এর শাসনামলে সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করেছেন। স্বয়ং উম্মে হারাম উক্ত বাহিনীতে শরীক ছিলেন। সমুদ্র থেকে স্থলে নেমে আসার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাছাড়া বহু বর্ণনায় এসেছে যে, নবী ﷺ তাঁকে 'কাতিব' (অহী লেখক)-রূপে কাছে রেখেছিলেন, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছাড়া কাউকে তিনি কাতিব নিযুক্ত করতেন না।

মু'আবিয়া (রা) নিজেও বলেছেন, "আমি খলীফা নই। তবে ইসলামী যুগের প্রথম বাদশাহ। অবশ্য আমার পরে তোমরা বাদশাহদের স্বরূপ বুঝতে পারবে।"

তাঁর নিকট নবী ﷺ-এর কয়েক গাছি পবিত্র চুল ছিলো। মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়ত করেছিলেন যেন এই সংরক্ষিত চুলগুলো তার নাসারন্ধ্রে দিয়ে দেয়া হয়।

খিলাফতের কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তিনি বুঝতেন কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন ও আমল তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। [ইযালাতুল খাফা, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭]

কেননা সময় ও মানুষের যে পরিবর্তন ঘটে ছিলো পূর্ববর্তীদের তুলনায় তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা, অবয়ব ও প্রকৃতি এবং শাসন দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সমস্যা ও সংকট খুব একটা কম ছিলো না। অবস্থার দিকে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তাকালে তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

এক নযরে তৎকালীন ইসলামী সমাজ

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত জরুরী। তা এই যে, প্রিয় পাঠক! একান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে মত বিরোধের যেসব ঘটনা আপনারা পাঠ করেছেন যা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে ছিলো তা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব এবং শাসকবর্গ ও তাদের সেনাবাহিনীর পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিলো। পক্ষান্তরে অহী ও রিসালাতের পুণ্যভূমি জাযীরাতুল আরব থেকে ইসলামী বিজয়াভিযানের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত গোটা ইসলামী সমাজ দীনের ওপর পূর্ণ অবিচল ছিলো। শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধানের প্রতি ছিলো তাদের নিরংকুশ আনুগত্য। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং সুন্নাতের ওপর অতি গভীর অনুরাগ ছিলো তাদের অন্তরে। দীন ও ঈমান এবং ইলম ও আমলের ধারক-বাহক, হাদীস-বিশারদ ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো অটুট।

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক আহকাম সমাজের বুকে একই রকম সমুন্নত ছিলো। জুমুআ ও জামা'আত পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আদায় করা হতো। সময় ও স্থানসহ হজ্জের যাবতীয় আরকান-আহকামে সামান্যতম পরিবর্তনও অনুপ্রবেশ করেনি। সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি তথা খলীফার পক্ষ হতে নিযুক্ত আমীরের নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হতো। জিহাদও জারি ছিলো পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে। কুরআনের হিফজ ও তিলাওয়াত একই ধারায় অব্যাহত ছিলো। তার উত্তাপে হৃদয় একই রকম বিগলিত হতো, চোখ থেকে একই ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতো। দীন ও শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি তখন দেখা দেয়নি।

মোটকথা, কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এই ইসলামী সমাজ সমকালীন খ্রীস্টীয় সমাজ কিংবা অগ্নিপূজক সমাজ কিংবা হিন্দু সমাজ থেকে সর্বতোভাবেই উত্তম ছিলো। আল্লাহর ভয়, মৃত্যুচিন্তা, আখিরাত ও পরকাল ভাবনা, যাবতীয় পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে সংযম, বস্তু পূজা ও বিষয়-সম্পদের প্রতি অতি আসক্তি পরিহার এবং সকল কিছুকে স্থূল লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে বিচারের প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি, এক কথায় সার্বিক আত্মোৎকর্ষের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজই ছিলো একক আদর্শ ও অনন্য দৃষ্টান্ত।

আর এসব কিছু সম্ভব হয়ে ছিলো সেই মহান আসমানী কিতাবের কল্যাণে যা কোন প্রকার পরিবর্তন কিংবা সংস্কার দোষে দুষ্ট হয়নি এবং নবী ﷺ -এর সীরাত ও জীবনাদর্শের কল্যাণে যা সমাজের সর্বস্তরে প্রতিনিয়ত আলোচিত হয়ে আসছিলো। তাছাড়া সাহাবা কিরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও কর্ম এবং মুজাহিদীন ও শহীদানের আত্মত্যাগ ও কুরবানী তাদের চোখের সামনে ছিলো। দুনিয়ার প্রতি নিরাশ ও পরহেযগার লোকদের প্রবল উপস্থিতি এবং আল্লাহ্র পথে আহ্বান তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর মুবারক আমলও সমাজকে পূত-পবিত্র করে রেখেছিলো।

মোটকথা, মানুষের হৃদয়ে ও চিন্তায় যেমন দীনের সর্বোচ্চ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিলো তেমনি কর্মজীবনে ও দৈনন্দিন আচরণে দীনের একচ্ছত্র প্রভাব ও আত্মিক নিয়ন্ত্রণ অটুট ছিলো।

এসব কিছু এজন্যই ছিলো যে, এই দীনের হিফাযতের ও আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনকারী এই উম্মাহ্‌র কেয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষার যিম্মা আল্লাহ্‌ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"নিঃসন্দেহে আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই তার হিফাযত করবো।"

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

"তদ্রূপ তোমাদেরকে আমি মধ্যপন্থী উম্মতরূপে মনোনীত করেছি যেন তোমরা অপরাপর উম্মতের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হতে পারো। আর রাসূল তোমাদের সাক্ষী হতে পারেন।"

আসলে বিশ্বজগতের অস্তিত্বের স্বার্থেই এই দীন ও এই উম্মতের হিফাযত জরুরী। কেননা এ দু'টির কোন বিকল্প নেই।

যেহেতু মুসলিম উম্মাহ তখনো দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌'র ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণ করে চলেছিলো, যেহেতু আকীদা ও বিশ্বাস এবং আমল ও কর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বের মাঝে তারাই ছিলো শ্রেষ্ঠ সেহেতু আল্লাহ্‌ তাদের ওঁৎ পেতে থাকা শত্রু তথা খ্রীস্টান শক্তিকে যাদের কেন্দ্র ছিলো কনস্টান্টিনোপল ও খ্রীস্ট ধর্ম অধ্যুষিত ইউরোপীয় মহাদেশ, তাদেরকে আল্লাহ্‌ বিভক্ত মুসলিম উম্মাহর গৃহবিবাদ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণের কোন অবকাশ দেন নি। অন্যথায় এই সুযোগে তারা বহু শতাব্দী ধরে তাদের শাসনাধীন সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার কতিপয় দেশ পুনর্দখল করার এবং নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাতে পারতো।

৩৫ হিজরীর ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) বলেন, এই বছর হিরাক্লিয়াস-পুত্র কনস্টান্টিই এক হাজার যুদ্ধজাহাজ নিয়ে মুসলিম এলাকাগুলোর উদ্দেশে অভিযানে বের হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌ তাদের ওপর ভীষণ ঝড় পাঠিয়ে দিলেন এবং আপন কুদরত দ্বারা

সৈন্যসহ তাকে ডুবিয়ে দিলেন। সম্রাট ও তার অল্প ক'জন সহচর ছাড়া কেউ ঝড়ের তাণ্ডব থেকে রেহাই পেলো না। সে যখন প্রাণ হাতে করে সিসিলিতে এসে পৌঁছলো তখন এই বলে সুকৌশলে তাকে হত্যা করা হলো, তুমিই আমাদের লোকদের ধ্বংসের মূল।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯]

নবম অধ্যায়

জান্নাতী যুবকগণের নেতা হাসান ও হুসায়ন (রা)

হাসান ইব্‌ন আলী (রা), হযরত হাসান (রা) সম্পর্কিত নববী বাণীর গুরুত্ব ও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, হাসান (রা)-এর খিলাফত লাভ এবং মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে তাঁর সমঝোতা, শাহাদাত লাভ- হাসান ইব্‌ন আলী (রা) ইয়াযীদের জীবন ও চরিত্র- কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা- হুসায়ন (রা)-এর প্রতি ইরাকীদের আহ্বান এবং তাঁর পক্ষ হতে মুসলিম ইব্‌ন আক্কীলকে ইরাকে প্রেরণ- মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে ইরাকীদের পরিত্যাগ, হুসায়ন (রা)-এর নামে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের পত্র এবং তাঁর প্রতি সকলের পরামর্শ- কুফার পথে হুসায়ন ইব্‌ন আলী- কারবালায় ইয়াযীদের দরবারের হাররার ঘটনা এবং ইয়াযীদের মৃত্যু, হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত এবং কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা সম্পর্কে আহলে সুন্নাহর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মতামত ও প্রতিক্রিয়া, সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং অবস্থার পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা ও তার মূল্যায়ন।

জান্নাতী যুবকগণের নেতা হাসান ও হুসায়ন (রা)

হাসান ইবন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)

হাসান (রা) হলেন হযরত আলী (রা) ও নবী-কন্যা ফাতিমাতুল-যাহরা (রা)-এর পুত্র। নবী ﷺ -এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে তৃতীয় হিজরীর মধ্যশা'বানে, মতান্তরে রমযান মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, এমন কি শৈশবে তাঁর ঠোঁটে চুমু খেতেন। কখনো বা জিহ্বা চুষতেন। বুকে নিতেন। আদর-সোহাগ করতেন। কখনো শিশু হাসান এসে দেখতেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে সিজদায় আছেন। তখন তিনি তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পিঠেই বসে থাকতে দিতেন এবং তাঁর কারণে সিজদা লম্বা করতেন। কখনো বা তাঁকে মিম্বরে উঠিয়ে বসাতেন। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩]

হযরত আনাস (রা) হতে ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সকলের মাঝে হযরত হাসান (রা)-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যের অধিকারী।

হযরত হানী (র) আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত হাসান হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যের অধিকারী। আর এর নীচের অংশে হুসায়ন (রা) হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যের অধিকারী, (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)। পিতা আলী (রা) পুত্র হাসান (রা)-কে বেশ সম্মান করতেন এবং যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। একদিন তিনি পুত্র হাসান (রা)-কে বললেন, হে বৎস! একটা ভাষণ দাও না, আমি শুনি। তিনি বললেন, আপনার সামনে ভাষণ দিতে আমার সংকোচবোধ হয়। তখন হযরত আলী (রা) অন্যত্র গিয়ে এমনভাবে বসলেন যাতে হাসান (রা) তাঁকে দেখতে না পান। তখন হযরত হাসান (রা) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন আর হযরত আলী অন্তরাল থেকে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি সেদিন অতি সারগর্ভ এক ভাষণ দিয়েছিলেন। যখন তিনি প্রস্থান করলেন, তখন হযরত আলী (রা) বলতে লাগলেন, ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم তারা একে অন্যের সন্তান আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭]

অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকতেন কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন সকল বক্তাকে ছাড়িয়ে যেতেন। কোন দাওয়াতে তিনি শরীক হতেন না এবং কোন বিবাদ-বিতর্কে জড়াতেন না। কোন বিচারকের সম্মুখে ছাড়া যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন না। তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সম্পদ তিনবার ভাগাভাগি করেছেন এবং দু'বার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করেছেন। পায়ে হেঁটে পঁচিশবার হজ্জ করেছেন, অথচ উট ও ঘোড়া তাঁর সম্মুখে চলছিলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯]

হাসান ও হুসায়ন (রা) যখন বাহনে আরোহণ করতেন তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) সৌভাগ্য মনে করে তাঁদের পাদানি ধরতেন। যখন তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেন তখন সালাম করার জন্য মানুষ এমন প্রচণ্ড ভিড় করতো যে, তারা পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হতেন।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯]

হযরত হোযায়ফা (রা) হতে মারফু' সনদে বর্ণিত হয়েছে,

الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ـ

"হাসান ও হুসায়ন হলো জান্নাতী যুবকগণের নেতা।"

আলোচ্য হাদীসটির অন্যান্য সূত্রও রয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আলী, জাবির, বুরায়দা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ বাকরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে আমি মিম্বরে দেখেছি। হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার উপস্থিত লোকদের দিকে, আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর বলছিলেন,

ان ابنى هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين ـ

"আমার সন্তান হলো সাইয়েদ ও নেতা। সম্ভবত আল্লাহ্ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে সমঝোতা করাবেন।"

ইমাম আহমদ তাঁর নিজস্ব সনদে হযরত আবূ বাকরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায পড়াচ্ছিলেন আর হাসান ইব্‌ন আলী সিজদার সময় তাঁর পিঠে চড়ে বসেছিলেন। তিনি একাধিকবার এরূপ করলেন। সাহাবা কিরাম আরয করলেন, আপনি তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেন যা অন্য কারো সঙ্গে করতে দেখি না! তিনি বললেন, আমার এ সন্তান হলো সাইয়েদ ও নেতা।

অদূর ভবিষ্যতে তার মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান (রা) সম্পর্কে বলেছেন,

ان ابنى هذا سيد وسيصلح الله على يده بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔

"আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ ও নেতা, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তার হাতে মুসলমানদের দু'টি বিরাট দলের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।"

অন্য বর্ণনায় আছে,

وعسى الله ان يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواه جماعة من الصحابة۔

"সম্ভবত আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বিরাট দলের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।" সাহাবা-কিরামের একটি জামাত এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান ইব্ন আলী (রা) কে তার কাঁধে চড়িয়ে রেখেছিলেন। তা দেখে জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে বালক! কেমন সুন্দর সওয়ারিতে তুমি আরোহণ করেছ!

নবী ﷺ বললেন, আরোহীটাও কত না উত্তম!

হাসান ও হুসায়ন (রা) ইসলামের যুগে প্রধান শ্রেষ্ঠ দানবীর ছিলেন।

হযরত নাঈম (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বলেছেন, যখনই হাসানকে দেখেছি আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। কারণ একদিন তিনি দৌড়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোলে বসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ি নিয়ে এভাবে খেলা করতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পবিত্র মুখ হা করলেন এবং তাঁর মুখে নিজের পবিত্র জিহ্বা পুরে দিলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো। একথা তিনি তিনবার বললেন।

[হুলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫]

ইব্ন আসাকির (র) বলেন, হাসান (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি মদীনার একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক

হাবশী দাস এক হাতে রুটি নিয়ে এক গ্রাস নিজে খাচ্ছে, অন্য গ্রাস কুকুরের মুখে তুলে দিচ্ছে। এভাবে পুরো রুটি কুকুরের সাথে ভাগ করে সে খেয়ে নিলো। তখন হযরত হাসান (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, একটুও বেশকম না করে কুকুরের সাথে এভাবে রুটি ভাগাভাগি করে নিতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলো? হাবশী দাস বললো, তাকে ফাঁকি দেয়ার ব্যাপারে তার চোখের দৃষ্টিকে আমার চোখের দৃষ্টি সংকোচ বোধ করেছে।

হযরত হাসান (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কার গোলাম তুমি? সে বললো, আবান ইব্‌ন উসমানের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর বাগান? সে বলল, এটাও আবানের। হাসান (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে বসে থেকো। তিনি গিয়ে গোলাম ও বাগান খরিদ করলেন এবং ফিরে এসে গোলামকে বললেন, আমি তোমাকে খরিদ করেছি। তখন গোলাম আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললো, হে মনিব! আনুগত্য আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের জন্য, অতঃপর আপনার জন্য।

অতঃপর হযরত হাসান (রা) বললেন, এ বাগানও আমি খরিদ করেছি। তুমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ, আর এ বাগান আমার পক্ষ হতে তোমাকে উপহার দিলাম। [তারীখে দিমাশ্‌ক, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮]

হযরত হাসান (রা) সম্পর্কে নববী ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

হযরত হাসান (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে, আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি যুদ্ধরত দলের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এটা নিছক একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো না, যা হযরত হাসান ও অন্যান্য সাহাবা কিরাম শুনেছেন এবং অন্যান্য নববী ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় এটাকেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন। এরপর ঘটনা শেষ হয়ে গেছে, বরং এ ভবিষ্যদ্বাণীর আলাদা তাৎপর্য এই যে, এটা ছিলো হযরত হাসান (রা)-এর উদ্দেশে উচ্চারিত এক দিকনির্দেশনামূলক বাণী যা তাঁর ভবিষ্যত জীবনের চিন্তা, কর্ম, নীতি ও আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত হাসান (রা)-এর অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করে ছিলো এবং তাঁর অনুভূতিকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ছিলো এবং তার রক্তমাংসে মিশে গিয়েছিলো। ফলে এটাকে তিনি তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি অসিয়তরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর প্রিয়নবী ও প্রিয় নানাজানের মুখে যখন তিনি এ শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন এবং এটাকে তিনি তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার কারণরূপে উল্লেখ করছিলেন তখন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে অপার্থিব আনন্দের ছাপ ও তাঁর দু'চোখে নূরের একটা ঝিলিক অবশ্যই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যা তাঁর হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করেছিলো। ফলে এটাকে তিনি জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে এবং ভবিষ্যতের সর্বোচ্চ আদর্শরূপে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

বস্তুত হযরত হাসান (রা)-এর পরবর্তী জীবনের প্রতিটি আচার-আচরণে ও প্রতিটি বক্তব্যের উচ্চারণে এই মহান নববী ভবিষ্যদ্বাণীর ছাপ প্রকাশ পেয়েছিলো, এমন কি তাঁর মহান পিতা যাঁকে আল্লাহ্ এমন কিছু গুণ ও প্রতিভা দান করেছিলেন যাতে এই উম্মতের খুব কম সদস্যই তাঁর অংশীদার হতে পেরেছিলো। আর পুত্রত্ব ও নিকট সান্নিধ্যের সুবাদে সে বিষয়ে হযরত হাসান (রা)-ই সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তাই মহান পিতাকে তিনি মহান পুত্রের মতোই ভালোবাসতেন এবং গুণমুগ্ধ ও অভিভূত হৃদয়েই তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, অথচ এমন মহান পিতার সাথে কথোপকথনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বর্ণিত আছে, হযরত উসমান (রা)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা)-কে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তিনি লোক সমাজের সংস্পর্শ ত্যাগ করে যে কোন নির্জন স্থানে ইচ্ছা চলে যান যতক্ষণ না আরবদের বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরে আসে। তিনি তাঁকে বললেন,

لو كنت فى حجرصنب لا ستخرجول منه فبايعوك دون ان تعرض نفسك لهم -

"তবে গুঁই সাপের গর্তেও যদি আপনি আত্মগোপন করেন মানুষ আপনাকে বের করে এনে আপনার হাতে বায়'আত হবে, নিজেকে তাদের সামনে তুলে ধরা ছাড়া।"

তদ্রূপ হযরত আলী (রা) যখন সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাহিনী প্রস্তুত করার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলেন এবং অনুগত ও নিবেদিতপ্রাণ লোকদের নিয়ে অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন তখন হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন,

يا ابت دع هذا. فان فيه سغل دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم -

"হে পিতা! এ বর্জন করুন। কেননা এতে মুসলমানদের রক্তপাত হবে এবং তাদের মাঝে অনৈক্য দেখা দেবে।"

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০]

কিন্তু হযরত আলী (রা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। কেননা আমর বিন মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধান পালন না করে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার এবং প্রাপককে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা না চালিয়ে মানুষকে ফিতনার মুখে ছেড়ে দেয়া সঠিক মনে করেন নি। আর প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তি।

হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফত ও মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে তাঁর সন্ধি

ইব্‌ন মুলজিম যখন হযরত আলী (রা)-কে হামলা করলো, তখন সকলে তাঁর খিদমতে আরয করলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! স্থলবর্তী নিয়োগ করুন। তিনি বললেন, না, বরং আমি তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে যাবো, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খলীফা নিযুক্ত না করে ছেড়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ যদি তোমাদের কল্যাণ চান তাহলে তোমাদেরকে তিনি তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তির পাশে একত্র করবেন যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পাশে একত্র করেছিলেন। [প্রাগুক্ত ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪]

কিন্তু মানুষ হযরত আলী (রা)-এর আহত হওয়ার দিন, ৪০ হিজরীর ১৭ রমযান রোয শুক্রবার হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত হলো। [প্রাগুক্ত]

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর হযরত হাসান (রা)-এর বায়'আত যখন সম্পন্ন হলো তখন কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা হযরত হাসান (রা)-কে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার জন্য চাপ দিলেন, অথচ হযরত হাসান (রা)-এর কারো বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মনোভাব ছিলো না কিন্তু তারা তাঁকে মত পরিবর্তনে বাধ্য করে ফেললো। তখন তারা এমন বিরাট সৈন্য সমাবেশ ঘটালো যার নযীর ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তখন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) কায়স ইবন সা'আদকে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে বার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। আর তিনি মূল বাহিনী নিয়ে মু'আবিয়া (রা) ও তাঁর অনুগামী সিরীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশে অগ্রবর্তী বাহিনীর পেছনে রওয়ানা হলেন। মাদায়েন অতিক্রমের সময় তিনি সেখানে যাত্রা বিরতি করলেন। আর অগ্রগামী বাহিনী আগে বেড়ে গেলো।

মাদায়েনের উপকণ্ঠে যখন তিনি ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন তখন হঠাৎ অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বাহিনীর মাঝে চিৎকার জুড়ে দিয়ে বললো, সাবধান হও! কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ওবাদা নিহত হয়েছেন। এ ঘোষণার ফলে চরম নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা দেখা দিলো। সৈন্যবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের মাঝেই লুটতরাজ শুরু করে দিলো, এমন কি হযরত হাসান (রা)-এর শামিয়ানাও লুট করে নিলো এবং যে চাদর বিছিয়ে তিনি বসা ছিলেন সেটা নিয়েও টানাটানি শুরু করে দিলো। তিনি যখন আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন একজন তাঁকে খঞ্জরাঘাতে জখম করে ফেললো। এতে হযরত হাসান (রা) তাঁর বাহিনীর প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং আহত অবস্থায় মাদায়েনের কাছরে আবয়ামে প্রবেশ করলেন।

বাহিনী কাছরে আবিয়াতে স্থির হওয়ার পর মুখতার ইব্‌ন আবূ ওবায়দ, আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করুন– তার চাচা সা'দ ইব্‌ন মাসউদকে যিনি মাদায়েনের প্রশাসক ছিলেন, বললো, আপনি কী মর্যাদা ও সম্পদ প্রাচুর্য কামনা করেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী সেটা? সে বললো, হাসান ইব্‌ন আলীকে কয়েদ করে মু'আবিয়ার কাছে পৌঁছে দিন। সা'আদ ইব্‌ন মাসউদ বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ও তোমার এই কুমতলবকে ধ্বংস করুন! নবী-কন্যার পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করবো? [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪]

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, ইরাকবাসীরা সিরীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশে হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে দাঁড় করিয়েছিলো। কিন্তু তাদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা পূর্ণ হলো না, বরং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই তারা সঙ্গ বর্জন শুরু করলো এবং নেতৃস্থানী গণের সাথে মতবিরোধ শুরু হলো। তাদের যদি অনুমতি থাকতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রিয় দৌহিত্রের হাতে বায়'আত গ্রহণের যে সৌভাগ্য আল্লাহ্ তাদের দান করেছিলেন, তারা তার কদর করতো। কেননা তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুসলিমীন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ,সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার অধিকারী বিশিষ্ট সাহাবা কিরামের অন্যতম।

বাহিনীর শৃঙ্খলাহীনতা ও অবাধ্যতা দেখে তাদের প্রতি হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর মন বিষিয়ে উঠলো এবং তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন। মুআবিয়া (রা) তখন সন্ধি ও সমঝোতার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত হাসান (রা) কতিপয় শর্ত আরোপ করে জানালেন যে, মু'আবিয়া এগুলো মেনে নিলে মুসলমানদের মাঝে রক্তপাত বন্ধের স্বার্থে মু'আবিয়ার অনুকূলে তিনি খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াবেন। এই শর্তে

উভয় পক্ষ সন্ধিতে উপনীত হলো এবং মু'আবিয়া (রা)-এর বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬]

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "আমার পরে খিলাফাত ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে। অতঃপর রাজত্ব শুরু হবে। আর হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর খিলাফতের মাধ্যমে ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। কেননা তিনি ৪১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে মু'আবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর উক্ত সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত থেকে শুরু করে পূর্ণ ত্রিশ বছর হয়।

খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর মু'আবিয়া (রা)-এর অনুরোধে হযরত হাসান (রা) একটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি হামদ-ছানার পর বলেছিলেন,

اما بعد! ايها الناس ان الله هداكم باولنا وحقن دماءكم باخرنا وان
لهذا الامر مرة والدينا دول وان ادرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين.

"অতঃপর হে লোক সকল! আল্লাহ্ আমাদের প্রথমজন দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন আর আমাদের শেষ জন দ্বারা তোমাদের রক্তপাত বন্ধ করেছেন। এ রাজত্ব হলো নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর দুনিয়ার ধর্মই হলো উত্থান-পতন। আর আমি জানি না, হয়তো তোমাদের জন্য এটা পরীক্ষার বিষয় হবে এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য ভোগের বিষয় হবে।"

এ ভাষণ মু'আবিয়া (রা)-এর পছন্দ হয়নি এবং তাঁর মনে সব সময় তা লেগেছিলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮]

আবূ আমির নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁকে একবার এভাবে সম্বোধন করেছিলেন, হে মু'মিনদেরকে অপদস্থকারী, আপনাকে সালাম, তখন তিনি বললেন, হে আবূ আমির! একথা বলো না, আমি মু'মিনদেরকে অপদস্থকারী নই, বরং আমি রাজত্বের জন্য তাদের রক্তপাত পছন্দ করিনি। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯]

ইবনে কাছীর (র) বলেন, সে বছর মু'আবিয়া (রা)-এর বায়'আতের বিষয়ে যখন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন হযরত হাসান ইবন আলী (রা) তাঁর ভাই হোসাইন ইবন আলী (রা), অন্যান্য ভাই ও চাচাত ভাই হযরত আমদুল্লাহ ইবন জাফরকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক ভূমি থেকে মদীনার পুণ্যভূমির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মদীনায় মহান বাসিন্দার প্রতি সর্বোত্তম দরূদ ও সালাম।

পথে যখনই তারা তাদের ভক্ত, অনুরক্ত ও সমর্থকদের কোন বস্তি অতিক্রম করছিলেন তারা তাঁকে মুআবিয়ার অনুকূলে খিলাফত ত্যাগের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁকে তিরস্কার করছিলো, অথচ এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিলো অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। এ বিষয়ে তাঁর অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো না, আফসোস বা অনুতাপ ছিলো না। বরং তিনি পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত ছিলেন, যদিও তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-প্রেমিকদের বিরাট অংশের নিকট যুগ যুগ ধরে আজ পর্যন্ত বিষয়টি লজ্জাজনক ও গ্লানিকর মনে হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক পথ হলো সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং তাঁর উসিলায় উম্মতের রক্তপাত বন্ধ হওয়ার কারণে তাঁর প্রশংসা করা যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশংসা করেছিলেন।

হযরত হাসান (রা)-এর ক্ষুব্ধ অনুগামীরা এই বলে তাঁকে সম্বোধন করতো, হে মু'মিনদের কলঙ্ক! উত্তরে তিনি তাদের বলতেন, العار خير من النار "কলঙ্ক বহন অগ্নি-দহন হতে উত্তম।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১]

আবূ দাউদ তায়ালসী (র) যোহায়র ইবন নাফীর হতে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি তাঁর পিতা নাফীর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান ইবন আলী (রা)-কে একদিন আমি বললাম, মানুষ মনে করে, আপনি খিলাফতের প্রত্যাশী। তিনি বললেন, আরবের সমস্ত মাথা আমার মুঠোয় ছিলো। আমি যার সাথে সন্ধি করি তারাও সন্ধি করে। আমি যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি তারাও অস্ত্র ধারণ করে। সে অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমি তা পরিত্যাগ করেছি। এখন দ্বিতীয়বার হিজায ভূমি হতে আমি কি সে দাবি তুলতে পারি?

আরেকবার তিনি বলেছেন, আমার ভয় হয়ে ছিলো যে, কিয়ামতের দিন সত্তর হাজার কিংবা আশি হাজার কিংবা কমবেশী মানুষ আমার বিরুদ্ধে হাযির হবে যাদের গলা থেকে রক্ত ঝরছে আর তারা সকলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে, কি প্রয়োজনে আমাদের রক্তপাত করা হয়েছে? [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২]

শাহাদাত

হযরত হাসান (রা)-কে বিষ প্রয়োগ করা হয়ে ছিলো আর সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো। ওমায়র ইব্ন ইসহাক (রা) বলেন, আমি ও অন্য একজন কুরায়শী হযরত হাসান (রা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি বললেন, কয়েক দফা আমাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু এবারের মতো এমন ভয়ঙ্কর বিষ আর কখনো প্রয়োগ করা হয়নি।

যখন মৃত্যুর পূর্বে গড়গড়া শব্দ শুরু হলো তখন হযরত হুসায়ন (রা) তাঁর মাথার কাছে বসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয় ভাই! বলুন কে সে? তিনি বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও ? হুসায়ন (রা) বললেন, হ্যাঁ, তিনি বললেন, আমি যাকে সন্দেহ করছি যদি সে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণে অধিক কঠোর। আর যদি সে না হয়ে থাকে তাহলে আমার নামে এক নিরপরাধকে হত্যা করা আমার পছন্দ নয়। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২]

তাঁর জানাযায় এমন বিরাট সমাবেশ হয়ে ছিলো যে, জান্নাতুল বাকীতে আর একজনও মানুষ ধারণের স্থান ছিলো না। সালাবা ইবন আবূ মালিক হতে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন। সালাবা বলেন, হাসান (রা) যেদিন শহীদ হলেন এবং বাকীতে দাফন হলো সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। বাকীর অবস্থা এমন দেখলাম যে, সেখানে যদি একটি সুঁই ফেলা হতো তাহলে তা কোন-না-কোন মানুষের মাথায় পড়তো। [আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩১]

বিশুদ্ধতম মতে হযরত হাসান (রা) ৫০ হিজরীর ৫ রবিউল ৪৭ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আবূ জাফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষ একাধারে সাত দিন হযরত হাসান (রা)-এর শোকে কেঁদেছে। বাজার ও দোকানপাট কিছুই খোলা হয়নি।

হযরত আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর ৪০ হিজরীর রমযান মাসের ২৩ তারিখে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একচল্লিশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধিতে উপনীত হন। সন্ধির বছরকে عام الجماعة বা ঐক্যের বছর নামে অভিহিত করা হয়। এই হিসেবে তাঁর খিলাফতকাল ছিলো ৬ মাস যাতে খিলাফতের ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়।

[জাওহারা, পৃষ্ঠা-২০৪]

হযরত হাসান (রা)-এর নির্ভুল সিদ্ধান্ত

মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধির প্রতিষ্ঠা ও তাঁর অনুকূলে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর যে সিদ্ধান্ত হযরত হাসান (রা) গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো অত্যন্ত সময়োপযোগী ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত। তদ্রূপ পরবর্তীতে ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া (রা)-এর বিপক্ষে হযরত হুসায়ন (রা) যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যার আলোচনা সামনে আসছে, সেটাও সময়োপযোগী ও সঠিক সিদ্ধান্ত ছিলো। বস্তুত যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ও যে স্থানকালে ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয় এবং

কঠিন সিদ্ধান্ত ও অবস্থান গৃহীত হয় সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্থান-কালের তাপমাত্রা স্বভাবতই ওঠানামা করে থাকে। আর সেই ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই পরিবর্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর একথা তো অনস্বীকার্য যে, জীবন, চরিত্র, দীন, ধর্ম, নবী সান্নিধ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া ও তার পুত্রের মাঝে কোন তুলনাই করা চলে না।

তাছাড়া মু'আবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ বজায় রাখার পরিণাম মুসলিম উম্মাহর রক্তস্রোত প্রবাহিত করা এবং নবীন ইসলামী সমাজে অতি প্রয়োজনীয় শান্তি-শৃঙ্খলা, আস্থা ও স্থিতিশীলতার পরিবর্তে যুদ্ধাবস্থার চরম উন্মাদনা ও ভয়াবহ নৈরাজ্য বজায় রাখা ছাড়া আর কিছুই হতো না, অথচ তাঁর সেনাবাহিনী ছিলো অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ্য। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারণে বিদ্রোহ কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাদের কোন দ্বিধাবোধ ছিলো না।

হযরত হাসান (রা) তাঁর ও তাঁর পিতার সমর্থনের দাবিদার এই ইরাকী বাহিনীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। এই বাহিনীর অবিশ্বস্ততা এবং চরম মুহূর্তে অবিচলতা ও দৃঢ়তার পরিবর্তে পক্ষত্যাগ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনের কারণে তাঁর মহান পিতা যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও খেয়াল-খুশির যে কঠিন মাশুল তাঁকে দিতে হয়েছে তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানবে? ইরাকীদের প্রতি যে তীব্র ক্ষোভ ও মনোবেদনা, অভিযোগ ও সমালোচনা তিনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে প্রকাশ করেছেন সেগুলো তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন একজন দূরদর্শী ও উম্মতের প্রতি দরদী নেতার পক্ষে তা থেকে অপর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলো না।

হুসায়ন ইবন আলী (রা)

৪ হিজরীর ৫ শাবান হুসায়ন ইবন আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খেজুর চিবিয়ে দিয়েছিলেন এবং আপন পবিত্র থু থু তাঁর মুখে দান করেছিলেন। তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন এবং হুসায়ন নাম রেখেছিলেন।

ইতিপূর্বেও আমরা বলেছি, হযরত হাসানের মুখমণ্ডল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। পক্ষান্তরে হযরত হুসায়ন (রা)-এর দেহ নবী ﷺ-এর পবিত্র দেহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো।

হুসায়ন (রা) নবী ﷺ-এর জীবদ্দশার ৬ বছর ৬ মাসের মত সময় পেয়েছিলেন।

নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছিলো ১১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম, তখন হাসান ও হুসায়ন (রা) তাঁর বুকের ওপর বসে খেলা করছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে ভালোবাসেন? তিনি বললেন, কেমনে ভালো না বেসে পারি? তারা তো হলো দুনিয়াতে আমার (আল্লাহপ্রদত্ত) সম্পদ। [তাবারানী]

হযরত হারিস (র) হযরত আলী (রা) হতে মারফু সনদে বর্ণনা করেন,

الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة .

"হাসান ও হুসায়ন হলেন জান্নাতী যুবকগণের সরদার।"

তাবারানী বর্ণিত অন্য একটি 'মুরসাল' হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ একবার হযরত হুসায়ন (রা)-কে কাঁদতে শুনে তাঁর আম্মা ফাতিমাকে বললেন, তুমি কি জান না যে, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? মু'আবিয়া-পুত্র ইয়াযীদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল অভিযানে প্রেরিত বাহিনীতে তিনি শরীক ছিলেন, এটা ছিলো ৫১ হিজরীর ঘটনা।

নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত তিনি প্রচুর পরিমানে করতেন। তিনি পায়ে হেঁটে বিশবার হজ্জ করেছেন।

হুসায়ন (রা) ছিলেন স্বভাব বিনয়ী। একদল দরিদ্র লোকের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। সওয়ারির ওপর থেকে তাদেরকে তিনি সালাম করলেন। তারা মাটিতে দস্তরখান পেতে রুটির টুকরো খাচ্ছিলো, তারা তাঁকে দস্তরখানে শরীক হওয়ার দাওয়াত দিয়ে বললো, আসুন, হে আল্লাহর রাসূলের দৌহিত্র! তিনি সওয়ারি থেকে নেমে এসে বললেন, আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। অতঃপর তিনি তাদের সাথে বসে খানায় শরীক হলেন। সবাই যখন আহার শেষ করলো তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছো, আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। এখন আমি তোমাদেরকে আমার ঘরে দাওয়াত করছি। তারা দাওয়াত কবুল করে তাঁর বাড়িতে হাযির হলে হযরত হুসায়ন (রা) তখন দাসীকে ডেকে বললেন, হে রাবার, ঘরে কি রেখেছো, দাও।

হযরত ইব্ন উয়ায়না (রহ) আবদুল্লাহ ইবন আবূ যায়দ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-কে আমি দেখেছি, দাড়ির সামনের দিকে কয়েকটি চুল ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণকেশী ছিলেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার শাসন

মু'আবিয়া (রা) তাঁর মৃত্যুর পর হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে শাসন ক্ষমতা প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন। তাঁর কোন কোন প্রশাসক পুত্র ইয়াযীদকে স্থলবর্তী নিয়োগের পরামর্শ দিলেন। তবে হযরত মু'আবিয়া (রা) সে বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু হযরত হাসান (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর অন্তরে ইয়াযীদের বিষয়টি প্রবল হলো, সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহের প্রাবল্যবশত ইয়াযীদকে তিনি শাসন ক্ষমতার উপযুক্তও মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন, আমার আশংকা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর প্রজা সাধারণকে হয়ত রাখালবিহীন বৃষ্টিভেজা বকরী পালের ন্যায় আমাকে রেখে যেতে হবে। বায়'আত গ্রহণের সময় ইয়াযীদের বয়স ছিলো ৩৪ বছর।

৪৯ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত গ্রহণের জন্য লোকদের আহ্বান জানালেন। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি হলো। কেননা ইয়াযীদের জীবনযাত্রা ও খেলাধুলায় আত্মনিমগ্নতা ও শিকারপ্রিয়তার কথা তাদের অজানা ছিলো না। কেউ কেউ ইয়াযীদকে খিলাফতের প্রার্থী না হওয়ার পরামর্শ দিলো এবং তাকে বোঝালো যে, এর পেছনে চেষ্টা করার চেয়ে তা পরিত্যাগ করা তার জন্য কল্যাণকর হবে। ফলে ইয়াযীদ তার ইচ্ছা থেকে সরে দাঁড়ালো এবং পিতার সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হলো, তখন উভয়ে বিষয়টি প্রত্যাহার করে নিতে একমত হলেন।

৫৬ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা) পুনরায় ইয়াযীদের খিলাফতের প্রস্তাব করলেন এবং বিষয়টি সুসংগঠিত রূপ দিতে শুরু করলো, এমন কি পুত্র ইয়াযীদের অনুকূলে তিনি বায়'আত অনুষ্ঠিত করলেন এবং সকল অঞ্চলে এ মর্মে লিখিত ফরমান পাঠিয়ে দিলেন। ফলে লোকেরা তার হাতে বায়'আত হলো। কিন্তু আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যোবায়র, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর, হুসায়ন ইব্‌ন আলী ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বায়'আত হতে বিরত থাকলেন।

এদিকে হযরত মু'আবিয়া (রা) উমরার জন্য মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মদীনায় তিনি উপরোক্তদের উপস্থিতিতে ভাষণ দিলেন, আর মানুষ ইয়াযীদের অনুকূলে বায়'আত হলো। কিন্তু তাঁরা সমর্থন না জানিয়ে বসেছিলেন তবে তাঁর ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে কোন রকমের প্রতিবাদেরও প্রকাশ ঘটান নি। ফলে

সকল অঞ্চলে ইয়াযীদের বায়'আত সম্পন্ন হয়ে গেলো এবং সকল অঞ্চল থেকে ইয়াযীদের সাক্ষাতে প্রতিনিধি দলের আগমন হতে লাগলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০]

ইয়াযীদের জীবন ও চরিত্র

ইমাম তাবারানী বলেন, অল্প বয়সে ইয়াযীদ 'পানীয়' ধরেছিলেন, যেমন শখের বশে অল্প বয়স্করা ধরে থাকে।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, ইয়াযীদের চরিত্রে বদান্যতা, সহনশীলতা-বিশুদ্ধভাষিতা, কাব্যরুচি, সাহসিকতা, প্রশাসনিক দক্ষতা ইত্যাদি কতিপয় গুণ ছিলো। তদুপরি সে ছিলো সুদর্শন এবং আচার-আচরণে মার্জিত। তবে কিছু প্রবৃত্তিপরায়ণতা ছিলো, কখনো কখনো সালাত ছেড়ে দিতো। আর অধিকাংশ সময় সালাতে অবহেলা করতো। তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে, গুরুতর অভিযোগ ছিলো, মদ পান ও আনুষঙ্গিক কোন কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ততা, তবে তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার কোন অভিযোগ ছিলো না। ফাসিক ও পাপাচারী ছিলো অবশ্যই।

বর্ণিত আছে, গান বাজনা, মদ পান, সুন্দরী দাস-দাসীর সঙ্গ, কুকুর পোষা, বানর, ভালুক ও ভেড়ার লড়াই এগুলোতে ইয়াযীদের আসক্তি ছিলো বহুল আলোচিত। ২৫ কিংবা ২৬ কিংবা ২৭ হিজরীতে সে জন্মগ্রহণ করেছিলো। পিতার জীবদ্দশায় এ শর্তে তার অনুকূলে বায়'আত গ্রহণ করা হয়ে ছিলো যে, পিতার মৃত্যুর পর তিনি হবেন পরবর্তী খলীফা। অতঃপর পিতা হযরত মু'আ'বিয়া (রা)-এর ইন্তিকালের পর ৬০ হিজরীর মধ্যরজবে পুনঃবায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, "কাবার রবের শপথ! আমি জানি, আরবগণ কখন ধ্বংস হবে। যখন তাদের শাসক হবে এমন কোন ব্যক্তি যে জাহিলিয়াতের যমানা দেখেনি এবং ইসলামেও সে প্রবীণ নয়।"

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩২]

ইয়াযীদের জীবন ও চরিত্রের পূর্ববর্ণিত রূপ থেকেই এটা পরিষ্কার যে, ইয়াযীদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ এমন সাধারণ কোন ঘটনা ছিলো না, যা খিলাফতে রাশেদার সংলগ্ন পরবর্তী যুগে বরদাশত করা যেতে পারে। বিশিষ্ট সাহাবা কিরামের ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী তাবেঈনের এক বিরাট জামাআত তখনো জীবদ্দশায় ছিলেন। তাঁদের মাঝে এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা খিলাফতের দায়িত্ব পালন, মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণ এবং যেসব মহান

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইসলামের আবির্ভাব, কুরআনের অবতরণ ও খিলাফাত ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়ে ছিলো সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইয়াযীদের চেয়ে বহু গুণে যোগ্য ছিলেন, সেজন্য এ ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতররূপে গ্রহণ করাই ছিলো স্বাভাবিক। পরবর্তী কোন কালে হয়তো বিষয়টি এতটা গুরুতর বিবেচিত হতো না, যেমন ইতিহাসের বাস্তবতায় দেখা গেছে।

কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা

কারবালার যে মর্মন্তুদ ঘটনায় প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও লজ্জাবনত, সম্ভব হলে কলমের কালিতে এ ঘটনা আমরা কিছুতেই লিপিবদ্ধ করতাম না, বরং অপরাধীর ন্যায় তা এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু ইতিহাস তো সব ঘটনার সাক্ষী! যত বিচিত্রই হোক তার গতি-প্রকৃতি এবং মানুষের হৃদয়ে তা যত রক্তক্ষরণই করুক না কেন, সেই ইতিহাসের দাবি রক্ষার জন্যই আমাদেরকে আজ কারবালার কথা বলতে হবে যাতে আলোচনা সর্বাঙ্গ পূর্ণ হয় এবং ইতিহাসের পাতায় বাস্তব ঘটনা সংরক্ষিত হয়। সর্বোপরি হৃদয় ও বিবেকের নিকট যাতে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ত পেশ করা যায় এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ পাঠকবর্গের অন্তরে সামান্য সান্ত্বনার সঞ্চার হয়, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আহলে বায়তের সম্মান ও মর্যাদা জানেন এবং উম্মতের প্রতি তাঁদের ইহসান ও অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) ইয়াযীদের হাতে বায়'আত গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং স্বীয় নীতি ও অবস্থানে অটল থেকে প্রাণপ্রিয় নানাজানের শহর মদীনায় অবস্থান করতে লাগলেন। ইয়াযীদ ও ক্ষমতাসীন মহল বায়'আত গ্রহণ থেকে হযরত হুসায়ন (রা)-এর বিরত থাকার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিলো, অথচ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) প্রমুখের বেলায় তারা ততটা গুরুত্ব দেয়নি। এর কারণ এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর নিকটতম সম্পর্কের কারণে মুসলিম উম্মাহর অন্তরে তাঁর প্রতি অখণ্ড ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রেম-ভালোবাসা। অন্যদিকে মু'আবিয়া (রা)-এর শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাঁর মহান পিতার সংগ্রাম-ঐতিহ্যের কারণে মুসলিম সমাজের অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি। কিন্তু হযরত হুসায়ন (রা) বিন্দুমাত্র নমনীয়তা ও বশ্যতা স্বীকার করলেন না এবং পূর্ণ উপলব্ধি ও সচেতনতার সাথে যে নীতি ও অবস্থান তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হলেন না।

ইরাকীদের প্রতি আহ্বান ও মুসলিম ইব্ন আকীলকে ইরাকে প্রেরণ

ইয়াযীদ ও তার প্রশাসকদের পক্ষ থেকে যখন বায়'আতে চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন হুসায়ন (রা) মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক 'পত্র' আসতে লাগলো, এমন কি ইরাকীরা এক প্রতিনিধি দলের হাতে হুসায়ন (রা)-এর নামে একশত পঞ্চাশটি পত্র প্রেরণ করলো এবং এই বার্তা প্রদান করলো, আপনার পেছনে এক লাখ যোদ্ধা রয়েছে। এক পত্রে তারা অবিলম্বে ইরাক আগমনের আহ্বান জানালো যাতে তারা ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার পরিবর্তে তার হাতে বায়'আত হতে পারে। তখন হযরত হুসায়ন (রা) প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য আপন পিতৃব্য পুত্র মুসলিম ইব্ন আকীলকে ইরাকে পাঠালেন এবং তাঁর হাতে এই মর্মে ইরাকীদের নামে একটি পত্র দিলেন।

মুসলিম ইব্ন আকীল কুফায় প্রবেশ করলেন এবং কুফাবাসীদের মুখে মুখে তাঁর আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। ফলে তারা তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর হাতে হুসায়ন (রা)-এর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করলো এবং তাঁর সমর্থনে জানমাল কুরবান করার শপথ গ্রহণ করলো। এভাবে কুফায় বার হাজার মানুষ তাঁর বায়'আতে ঐক্যবদ্ধ হলো। অতঃপর সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আঠারো হাজারে উন্নীত হলো। তখন মুসলিম ইব্ন আকীল হযরত হুসায়ন (রা)-কে কুফায় আগমনের কথা লিখে জানালেন, বায়'আত গ্রহণসহ যাবতীয় পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল হয়েছে। তখন হযরত হুসায়ন (রা) মক্কা হতে কুফার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে ইয়াযীদ কুফার প্রশাসক নোমান ইব্ন বশীরকে হুসায়নের প্রতি তাঁর দুর্বল নীতি ও অবস্থানের কারণে বরখাস্ত করলো এবং বসরার সাথে কুফাকেও ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের শাসনাধীনে যুক্ত করে দিলো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২]

কুফাবাসীদের মুসলিম ইব্ন আকীলের সঙ্গ বর্জন

মুসলিম ইব্ন আকীল ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন এবং স্লোগান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুফার চার হাজার যোদ্ধা তার পাশে জড়ো হয়ে গেলো। ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ অবস্থা টের পেয়ে সঙ্গী-সহচরদের নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে আশ্রয় নিলেন এবং ফটক বন্ধ করে দিলেন। মুসলিম ইব্ন আকীল তাঁর বাহিনীসহ প্রাসাদের ফটকে অবস্থান গ্রহণ করলেন। প্রাসাদে ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের নিকট যেসব গোত্র প্রধান উপস্থিত ছিলো তারা মুসলিম ইব্ন আকীলের ডাকে সমবেত নিজ নিজ গোত্রের লোকদের বোঝালো এবং সরে যেতে বললে ওবায়দুল্লাহ কতিপয়

সরদারকে এই নির্দেশসহ শহরে পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা শহরে ঘুরে ঘুরে সকলকে মুসলিম ইব্ন আকীল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে তারা সারা শহরে জোরে শোরে প্রচারণা চালালো। মা তার পুত্রকে এবং বোন তার ভাইকে এসে চোখের পানি ফেলে বলতো, নিরাপদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলো। তদ্রূপ বাপ তার পুত্রকে এবং ভাই তার ভাইকে এসে বোঝাতে লাগলো, এই তো সিরীয় বাহিনী এসে পড়লো বলে! তখন কি দিয়ে তাদের মুকাবিলা করবে শুনি!

ফলে মানুষ হতোদ্যম হয়ে ধীরে ধীরে মুসলিম ইব্ন আকীলের সঙ্গ ছেড়ে সরে পড়তে লাগলো। ফলে পাঁচ 'শর বেশি মানুষ তাঁর সাথে থাকলো না। সে সংখ্যাও কমে গিয়ে তিন 'শ তে এসে দাঁড়ালো। মাগরিবের পূর্বে তিনি তাঁর পাশে দেখতে পেলেন মাত্র ত্রিশজনকে। তাদেরকে নিয়ে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'কিন্দা' মহল্লায় গেলেন এবং সেখান থেকে দশজন সঙ্গীসহ বের হলেন। পরে তারাও চলে গেলো। ফলে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন। পথ দেখাবার কেউ ছিলো না, কথা দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ ছিলো না। ঘরে এনে আশ্রয় দেবে এমনও কেউ ছিলো না। তখন তিনি অন্ধকার পথে একাকী লক্ষ্যহীনভাবে চলতে লাগলেন। কি করবেন, কোথায় যাবেন কিছুই তার জানা নেই।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫]

মুসলিম ইব্ন আকীলের প্রতি কূফাবাসীদের আচরণ ও সঙ্গ বর্জনের কাহিনী বড় দীর্ঘ ও করুণ। এ কাহিনী বারবার প্রমাণিত করে যে, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নীতি ও মূল্যবোধের গলায় ছুরি বসিয়েও শক্তি ও ক্ষমতার সামনে মাথা নোয়াতে এবং প্রদত্ত সম্পদের লোভ-লালসার কাছে নতি স্বীকার করতে মানুষ স্বভাবতই কোন দ্বিধাবোধ করে না।

যা হোক, এ মর্মান্তিক কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলো এভাবে যে, মুসলিম ইব্ন আকীল একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সে ঘর ঘেরাও করে ফেলা হলো। শত্রুপক্ষ বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে তার ওপর চড়াও হলো। তিনি তরবারি হাতে তাদের তাড়া করলেন এবং তিন তিনবার বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। তখন তারা তাঁকে পাথর মেরে ঘায়েল করতে লাগলো এবং বাঁশের মাথায় আগুন (প্রজ্বলিত করে) নিক্ষেপ করতে লাগলো। ফলে তিনি কোনঠাসা হয়ে পড়লেন। ও তরবারি হাতে তাদের সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন এবং লড়াই শুরু করলে-

তখন আশ্রয়-গৃহের মালিক আবদুর রহমান তাঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলো। ফলে তিনি নিজেকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর তলোয়ার ছিনিয়ে নিলো এবং একটি খচ্চরের পিঠে তাঁকে তুলে দিলো। তখন তার আর কিছুই করার ছিলো না। এ সময় অজ্ঞাতসারেই তিনি কেঁদে ফেললেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, তিনি শহীদ হতে চলেছেন।

হুসায়নের নামে মুসলিম ইব্‌ন আকীলের বার্তা ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ

ঠিক সেই দিন কিংবা তার আগের দিন হুসায়ন (রা) মক্কা হতে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এমতাবস্থায় মুসলিম ইব্‌ন আকীল (রা) মুহাম্মদ বিন আস'আদকে বললেন, যদি পার তাহলে আমার যবানিতে হুসায়নের নিকট বার্তা পাঠিয়ে দাও, যাতে তিনি ফিরে যান। মুহাম্মদ ইব্‌ন আস'আদ হুসায়নের নিকট দূত মারফত বার্তা পৌঁছে দিলেন। কিন্তু দূতের কথায় তাঁর আস্থা হলো না। তাই তিনি বললেন, আল্লাহর ইচ্ছা অনিবার্য।

মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে ইব্‌ন যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হলো এবং উভয়ের মাঝে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। তখন ইব্‌ন যিয়াদের নির্দেশে মুসলিম ইব্‌ন আকীল (রা)-কে প্রাসাদের ছাদে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তখন তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, ইস্তিগফার করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের নামে সালাম পেশ করছিলেন। বোকায়র ইব্‌ন ইমরান নামক এক ব্যক্তি তরবারির আঘাতে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললো এবং প্রাসাদের ওপর থেকে তাঁর ছিন্ন মস্তক নীচে ফেলে দিলো, মস্তকহীন দেহটা আগেই নিচে পড়ে গিয়েছিলো। [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৯]

মুসলিম ইব্‌ন আকীল মুহাম্মদ ইবনুল আস'আদকে হুসায়নের নামে তাঁর যবানীতে এই মর্মে এক বার্তা পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন,

"আপনি পরিবার-পরিজনসহ ফিরে যান, কুফাবাসীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। কেননা এরা হলো আপনার পিতার সেই সহচর দল, মৃত্যু কিংবা শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি যাদের বিচ্ছেদ কামনা করেছিলেন। কুফাবাসীরা আপনার সাথে প্রতারণা করেছে এবং আমার সাথেও প্রতারণা করেছে। আর প্রতারকের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।"

কুফা থেকে চার রাতের দূরত্বে 'যিবালাহ' নামক স্থানে প্রেরিত দূত হুসায়ন (রা)-এর সাক্ষাৎ পেলেন এবং মুসলিম ইব্‌ন আকীল (রা) বার্তাসহ বিস্তারিত

ঘটনা তাঁকে জানালেন, কিন্তু হুসায়ন (রা) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন, "আল্লাহ্র ফায়সালা অনিবার্য, আমাদের শাসকদের অনাচার নিজেদের দুরবস্থার জন্য আল্লাহ্র কাছেই আমরা ফরিয়াদ করি।"

হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-এর কুফা যাত্রার প্রস্তুতির কথা জেনে মানুষ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়লো। বিচক্ষণ ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে কুফায় না যাওয়ার ব্যাপারে জোর পরামর্শ দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ইরাকীরা হলো বিশ্বাসঘাতকের জাত। সুতরাং তাদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আপনি এখানেই অবস্থান করুন, ইরাকীরা যখন তাদের শত্রুকে শহরছাড়া করবে তখন আপনি তাদের কাছে যাবেন।

হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) বললেন, হে পিতৃব্য পুত্র! আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি, আপনি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমি যাত্রার ফায়সালা করে ফেলেছি। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, "যেতেই যদি হয় তাহলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অন্তত রেখে যান। কেননা আল্লাহ্র শপথ! আমার আশংকা হয় যে, উসমানকে যেমন তাঁর স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছে আপনাকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০]

হযরত ইব্ন উমর (রা) একইভাবে তাঁকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করলেন। ইব্ন উমর (রা) তখন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "নিহত হওয়া থেকে আপনাকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ করছি।"

একইভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যখন তাঁকে নিষেধ করলেন তখন তিনি বললেন, চল্লিশ হাজার ব্যক্তির বায়'আত আমার হাতে এসেছে, যারা স্ত্রী তালাক ও গোলাম আযাদের শপথ করে আমার সঙ্গে থাকার শপথ করেছে।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬১]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবও তাঁকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি নিবৃত্ত হলেন না, বরং সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যাত্রা শুরু করলেন। পথে কবি ফারাযদাকের সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে মানুষের মনোভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ফারাযদাক বললেন, হে রাসূল-তনয়! হৃদয় তো আপনার সাথে কিন্তু তলোয়ার আপনার বিরুদ্ধে। তবে বিজয়ের ফায়সালা আসমানে।

কুফার পথে হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)

আপন পরিবার-পরিজনসহ কুফা থেকে আগত ষাটজন লোকের ক্ষুদ্র এক কাফেলা নিয়ে হুসায়ন ইব্ন আলী কুফার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তখনও কুফার ঘটনাবলী কিছুই তাঁর জানা ছিলো না। পথে মুসলিম ইব্ন আকীল ও হানী ইব্ন ওরওয়ার শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে বারবার তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়তে লাগলেন। সকলে তখন তাঁকে বিনীতভাবে বললো, আল্লাহ্র দোহাই, নিজেকে রক্ষা করুন! তিনি বললেন, এ দু'জনের শাহাদাতের পর আর বেঁচে থাকায় কোন কল্যাণ নেই।

'হাজির' অঞ্চলে পৌঁছার পর তিনি ঘোষণা দিলেন, দেখো, আমাদের সমর্থকরা আমাদের সঙ্গ বর্জন করেছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ফিরে যেতে চাও নিঃসংকোচে যেতে পারো। কারো ওপর আমাদের পক্ষ হতে আনুগত্যের দায়বদ্ধতা নেই।

এ ঘোষণার পর পথের ডান বাম থেকে যারা তাঁর কাফেলায় যোগ দিয়েছিলো তারা সকলে তাঁকে পরিত্যাগ করে কেটে পড়লো। মক্কা থেকে যারা তাঁর সঙ্গী হয়ে ছিলো কেবল তারাই রয়ে গেলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৭]

হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) চিঠিপত্রের দু'টি বাণ্ডিল হাযির করলেন এবং সেগুলো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে তা থেকে কয়েকটা পত্র পাঠ করলেন। তখন হুর বলে উঠলো, যারা এসব কথা আপনার কাছে লিখেছে তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। একথা বলে 'হুর' হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কেটে পড়লো এ সময় কুফা থেকে আগত একদল লোক তার সঙ্গে দেখা করলো। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পেছনে কুফার লোকদের কী খবর বলো।

মুজাম্মা ইব্ন আবদুল্লাহ আল-আমেরী বললেন, নেতৃস্থানীয় লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ। কেননা বড় বড় অংকের উৎকোচ পেয়ে তাদের সিন্দুক ভরে গেছে। সুতরাং তারা আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকদের অবস্থা এই যে, হৃদয় তাদের আপনার প্রতি ঝুঁকে আছে। কিন্তু আগামীকাল তাদের তলোয়ার আপনার বিরুদ্ধেই কোষমুক্ত হবে।

ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ আমর ইব্ন সা'আদকে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠালো। হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) তাকে বললেন, "হে উমর! আমার তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করো। হয় আমাকে যেভাবে

এসেছি সেভাবে ফিরে যেতে দাও। আর তা গ্রহণযোগ্য না হলে আমাকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি তার হাতে হাত রাখবো। তখন আমার সম্পর্কে যে যা ভালো মনে করে ফায়সালা করবে। তাও যদি গ্রহণযোগ্য না মনে কর তাহলে আমাকে তুর্কীদের দেশে পাঠিয়ে দাও। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো।"

প্রস্তাবগুলো ইব্‌ন যিয়াদের বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। সে হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-কে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল। তখন নরাধম শিমার ইব্‌ন যিল জাওশান বাধা দিয়ে বললো, আপনার সিদ্ধান্তের ওপর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। ইব্‌ন যিয়াদ হুসায়ন (রা) কে সে কথাই জানিয়ে দিলো। হুসায়ন (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা আমি করবো না।

উমর বিন সা'আদ হুসায়ন (রা)-এর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে বিলম্ব করছিলো। তখন ইব্‌ন যিয়াদ শিমার বিন যিল জাওশানকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালো, উমর যদি আগে বাড়ে তাহলে তার নেতৃত্বে তুমি লড়াই করবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করে তুমি তার স্থান গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে দায়িত্বভার অর্পণ করলাম। উমর ইব্‌ন সা'আদের সঙ্গে কুফার প্রায় ত্রিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলো। তাঁরা তাকে বললেন, নবী-কন্যার পুত্র তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করছেন আর তোমরা তার একটিও গ্রহণ করবে না! একথা বলে তারা হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গে যোগ দিলো এবং তাঁর পক্ষে লড়াই করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭০]

কারবালার প্রান্তরে

হযরত হুসায়ন (রা) কারবালা প্রান্তরে অবতরণ করে জিজ্ঞেস করলেন, এ ভূমির নাম কি? তাঁকে বলা হলো, এটা কারবালা। তিনি বললেন, এ তো 'কারব' ও 'বালা' অর্থাৎ বিপদ ও বালা-মুসিবতের সমষ্টি।

যা-ই হোক, ইব্‌ন যিয়াদ উমর ইব্‌ন সা'আদকে এ নির্দেশ দিলো যে, হুসায়ন ও তার সঙ্গীদল তরবারি সমর্পণ না করা পর্যন্ত পানি অবরোধ করে রাখো যাতে তারা ফোরাতের এক ফোঁটা পানিও সংগ্রহ করতে না পারে। পক্ষান্তরে হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) তাঁর সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা ফোরাতের পানিতে পিপাসা নিবারণ করে এবং নিজেদের ঘোড়াগুলোর সঙ্গে শত্রুদের ঘোড়াগুলোকেও পানি খেতে দেয়। দুপুরে ইমাম হুসায়ন (রা) যোহরের সালাত

আদায় করলেন। উমর ইব্‌ন সা'আদ শিমার ইব্‌ন যিল জাওশানকে পদাতিক দলের দায়িত্ব প্রদান করলো। তারা ৯ মুহররম রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হুসায়ন ও তাঁর সঙ্গী দলের দিকে অগ্রসর হলো। সেই রাত্রে হুসায়ন (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনকে প্রয়োজনীয় অসিয়ত করলেন এবং সাথীদের উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করে বললেন : দেখো, তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারো। ওরা শুধু আমার মাথাটাই চায়। এর উত্তরে হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গী-সাথীরা ও তাঁর পুত্ররা ও ভ্রাতুষ্পুত্ররা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আপনার পরে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না। আল্লাহ্ যেন আপনার কোন মন্দ পরিণতি আমাদের না দেখান!

আকীল (রা)-এর পুত্রগণ বললেন, আমরা আমাদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজন আপনার জন্য উৎসর্গ করবো এবং আপনার মতো ভাগ্য বরণ করা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবো। আপনার পর বেঁচে থাকাকে আল্লাহ্ ধিক্কার দান করুন। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৬-৭৭]

শুক্রবার সকালে (কোন কোন মতে শনিবার সকাল) হযরত হুসায়ন (রা) ফজরের সালাত আদায় করলেন। সেদিন ছিলো আশুরার দিন। তাঁর সঙ্গীদের মাঝে ছিলো বত্রিশ জন যোদ্ধা ও চল্লিশ জন (সাধারণ) পুরুষ। ইমাম হুসায়ন (রা) ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং একখণ্ড কুরআন নিজের সামনে রাখলেন। তাঁর পুত্র আলী ইব্‌ন হুসায়নও ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তিনি তখন খুব দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন।

হযরত হুসায়ন (রা) লোকদের সামনে আপন উচ্চ বংশ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাপূর্বক তাদের ধর্মানুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করে বললেন, তোমরা নিজ নিজ বিবেকের মুখোমুখি হয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করো। আমি তো তোমাদের নবীর কন্যার পুত্র! আমার মত মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কি তোমাদের শোভা পায়? এ ধরনের আরো অনেক কথা তিনি বললেন। হুর ইব্‌ন ইয়াযীদ রায়াহী তখন তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন ও ঘোড়ায় চড়ে লড়াই শুরু করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন।

শিমার অগ্রসর হয়ে হুসায়নের সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর তারা দু'জন দু'জন ও একজন একজন করে তাদের প্রিয় ইমামের সামনে লড়াই করতে লাগলেন। আর তিনি এই বলে তাদেরকে দু'আ দিতে থাকলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মুত্তাকীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দান করুন!" এভাবে তারা তাঁর

সামনে লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে গেলেন, আলী-পুত্র ও হুসায়ন-ভ্রাতাদের অনেকেই নিহত হলেন।

শিমার ইব্‌ন যিল জাওশান তার যোদ্ধাদের উত্তেজিত করে বললো, তাঁকে হত্যা করতে তোমাদের আর অপেক্ষা কিসের?! তখন (নরাধম) যোরআ বিন শরীক তামীমী আগে বেড়ে তাঁর কাঁধে তরবারির দ্বারা আঘাত করলো। অতঃপর সিনান ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন আমর নাখরী তাঁকে বর্শাঘাত করলো। অতঃপর ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর মাথা কেটে নিলো এবং তা খাওলার হাতে অর্পণ করলো।

আবূ মুখান্নাফ জাফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেন। জাফার বলেন, নিহত হওয়ার সময় হুসায়নের শরীরে আমরা ৩৩টি বর্শাঘাত ও ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখতে পেয়েছি।[১]

কারবালার যুদ্ধে হযরত হুসায়ন (রা)-এর পক্ষে ৭২ জন শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হুসায়ন (রা)-এর সঙ্গে এমন ১৭ জন পুরুষ নিহত হয়েছিলেন যাঁদের সকলেই ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধর।

ইমাম হুসায়ন (রা) ৬১ হিজরীর ১০ মুহররম, রোজ শুক্রবার শাহাদাতবরণ করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়ে ছিলো ৫৪ বছর ৬ মাস ১৫ দিন।

ইয়াযীদের দরবারে

হিশাম বলেন, হযরত হুসায়ন (রা)-এর ছিন্ন মস্তক যখন হাযির করা হলো তখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার দু' চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিলো। সে বলেছিলো, হুসায়নকে হত্যা করা ছাড়াও তোমাদের আনুগত্যে আমি সন্তুষ্ট হতাম। ইব্‌ন সুমাইয়ার (ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের) প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক, আল্লাহর শপথ, যদি ইনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হতেন তাহলে তাঁকে আমি ক্ষমা করে দিতাম। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)। শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, হযরত হুসায়ন (রা)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে ও তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে যাদের ভূমিকা ছিলো তাদের সকলেই পরবর্তীকালে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলো। আল মুখতার তার গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা সত্ত্বেও হযরত হুসায়ন (রা)-এর ঘাতকদের খুঁজে খুঁজে বের করেছিলো এবং এ জঘন্য অপরাধে যাদেরই হাত রঞ্জিত হয়েছিলো তাদেরকে সে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো, অবশ্যই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের জনৈক মুক্ত দাস বর্ণনা করেন, ইয়াযীদের সামনে যখন হুসায়ন (রা)-এর ছিন্ন মস্তক রাখা হলো তখন তাকে আমি কাঁদতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, ইব্‌ন যিয়াদ ও হুসায়নের মাঝে যদি রক্ত সম্পর্ক থাকতো তাহলে সে এটা করতে পারতো না। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১]

বন্দীদেরকে যখন ইয়াযীদের সামনে উপস্থিত করা হলো তখন প্রথমে সে তাঁদের প্রতি রুক্ষ আচরণ করলো। পরে আবার কোমল আচরণ প্রদর্শন করে তাঁদের নিজ হারেমে পাঠিয়ে দিলো। অতঃপর তাদেরকে সসম্মানে মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দিলো।

ইতিহাসে এমন কোন তথ্য বর্ণিত হয়নি যাতে প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন যিয়াদকে সে কৃতকর্মের কারণে বরখাস্ত করেছিলো বা কোন সাজা দিয়ে ছিলো কিংবা অন্তত কোন্ রকম তিরস্কার করেছিলো। পক্ষান্তরে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের এমন কিছুও বর্ণনা এসেছে যা কোন মুসলমানের পক্ষে শোভনীয় নয়।

হাররার মর্মন্তুদ ঘটনা ও ইয়াযীদের মৃত্যু

৬৩ হিজরীতে সংঘটিত হাররার মর্মন্তুদ ঘটনা ইসলামের প্রথম যুগের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের ললাটে এক কলংকতিলক হয়ে থাকবে। ইয়াযীদ মুসলিম ইব্‌ন ওকবাকে মদীনায় তিন দিনব্যাপী নৈরাজ্য চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলো। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, এই তিন দিনে মদীনায় যে ভয়ঙ্কর ফিতনা-ফাসাদ ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইয়াযীদ এভাবে চেয়ে ছিলো তার রাজত্বের বুনিয়াদ মজবুত করতে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক শাসন ক্ষমতাকে স্থায়িত্ব দান করতে কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছার বিপরীত ঘটিয়ে তাকে শায়েস্তা করলেন। ফলে মৃত্যু এসে তার স্বপ্নসাধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২২]

রাজত্ব ভোগ করার জন্য ইয়াযীদ চার বছরের বেশি বেঁচে ছিলো না। ৩৪ হিজরীর ১৪ রবিউল আউয়াল সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার মৃত্যুর মাধ্যমেই আবূ সুফিয়ানের পরিবারের খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। আব্বাসীদের হাতে উমাইয়া রাজত্বের পতন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সর্বরাজত্বের একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ্, যাকে ইচ্ছা তিনি রাজত্ব দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ও শাহাদাতে হুসায়ন (রা) সম্পর্কে আহলে সুন্নাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুভূতি।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশিষ্ট ইমামগণ শুরু থেকেই ইয়াযীদ ও তার সেনাপতিদের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে এসেছেন এবং ইমাম হুসায়ন (রা) ও তাঁর সঙ্গী আহলে বায়তের অন্যান্য সদস্যের শাহাদাতকে ইসলামী ইতিহাসের নৃশংসতম ঘটনারূপে গণ্য করে এসেছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে দু'একটি নমুনা ও উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর পুত্র সালেহ্ বলেন, আমি আমার আব্বাকে বললাম, একদল লোক ইয়াযীদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকে। তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র! আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী কোন মুমিন কি ইয়াযীদকে ভালোবাসতে পারে? আমি বললাম, আব্বা, তাহলে তাকে অভিশাপ কেন দেন না? তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র! তুমি কি তোমার আব্বাকে দেখেছ কখনো কাউকে অভিশাপ দিতে?

[ফাতাওয়া ইব্ন তাইমিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৩]

তাতারী ফিতনাকালে মংগোল সেনাপতি 'বোলাই' যখন দামেস্কে এসে ছিলো তখন শায়খুল ইসলাম হাফেয ইব্ন তায়মিয়া ও তাঁর মাঝে অনুষ্ঠিত আলোচনার এক পর্যায়ে আল্লামা ইব্ন তাইমিয়া বলেছিলেন, হুসায়নকে যে হত্যা করেছে, কিংবা হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে কিংবা একে সমর্থন করেছে তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র, ফেরেশতাগণের ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ্র নিকট তাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৭]

হুসায়ন (রা)-কে আল্লাহ্ সেদিন শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেছিলেন এবং যারা তাঁকে হত্যা করেছে কিংবা হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে কিংবা তা সমর্থন করেছে তাদের সকলকে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ অপদস্থ করেছেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শহীদগণের উত্তম আদর্শ অনুসরণ করেছেন। কেননা তিনি ও তাঁর ভ্রাতা হলেন জান্নাতী যুবকদের সরদার, অথচ তাঁরা ইসলামের শান-শওকতের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছেন। ফলে তাঁর পরিবারের অন্যরা আল্লাহ্র পথে হিজরতে ও জিহাদের যে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছিলেন তা করার সুযোগ ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় পান নি। তাই আল্লাহ্ তাঁদের মর্যাদা পূর্ণ করার ও মরতবা বুলন্দ করার জন্য তাঁদেরকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁর হত্যাকাণ্ড ছিলো একটি বড় ধরনের বিপদ। আর আল্লাহ্ তা'আলা মুসিবতের সময় ইন্নালিল্লাহ্ পড়ার বিধান দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا! اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ۔

ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন তারা যখন কোন মুসিবতে আক্রান্ত হয় তখন বলে, "আমরা তো আল্লাহ্‌রই জন্য আর নিঃসন্দেহে আমরা তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করবো।" তাদেরই প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও রহমত এবং তারাই হলো হিদায়াতপ্রাপ্ত। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫১১]

ইমাম আহমদ ইব্‌ন আবদুল আহাদ সারহান্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) তাঁর এক পত্রে বলেন, "সৌভাগ্যবঞ্চিত ইয়াযীদ নিঃসন্দেহে ফাসিক সম্প্রদায়ভুক্ত।" তবে তার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণে বিরত থাকার ভিত্তি হলো আহলে সুন্নাত অনুসৃত এই মূলনীতি, যে কাফির হলেও কোন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে হুট করে অভিসম্পাত করা যাবে না যতক্ষণ না সুনিশ্চিতভাবে একথা জানা যায় যে, কুফুরির ওপর তার মওত হয়েছে। যেমন আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী। তবে এর অর্থ এ নয় যে, সে অভিসম্পাতের উপযুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

"নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন।"

মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) স্বরচিত তাকমীলুল ঈমান কিতাবে বলেন, মোটকথা আমাদের নিকট ইয়াযীদ হলো ঘৃণ্যতম ব্যক্তিদের অন্যতম। আল্লাহ্‌র তাওফীকবঞ্চিত এ হতভাগা যে জঘন্য অপরাধ করেছে তা এই উম্মতের আর কেউ করেনি।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) তাঁর সুবিখ্যাত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে "অতঃপর গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারীদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে" শীর্ষক হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"সিরিয়াতে গোমরাহীর পথে আহ্বানকারী হলো ইয়াযীদ, আর ইরাকে হলো আল-মুখতার।"

এখানে আমরা মহান সংস্কারক আলিম শায়খ রাশীদ আহমদ গাংগোহী (র)-এর ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করার মাধ্যমে এ আলোচনার ইতি টানতে চাই। তিনি তাঁর এক ফতোয়ায় বলেন,

তাকে অভিসম্পাত করার জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ভিত্তি হলো ইতিহাস। তবে নীরবতা অবলম্বন করাই হলো অধিক সতর্কতার পরিচায়ক এবং আমাদের জন্য অধিকতর শোভনীয়। কেননা অভিসম্পাত করা জায়েয হলেও না

করলে তো কোন ক্ষতি নেই। কেননা অভিসম্পাত করা ফরয, ওয়াজিব নয়, এমন কি সুন্নাত মুস্তাহাবও নয়। মুবাহ (ধৈর্য)-এর অধিক নয়। এমতাবস্থায় যাকে অভিসম্পাত করা হলো সে যদি প্রকৃতপক্ষে অভিশাপের পাত্র না হয়ে থাকে তাহলে (অভিসম্পাতের) গোনাহ হতে দূরে থাকাই তো উত্তম!

পরিস্থিতির পরিবর্তন, সৎ শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও তার সুফল

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে বংশীয় ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অনুগত হয়ে পড়েছিলো, এবং আরব ও মুসলিম জাতি তা মেনেও নিয়েছিলো। ফলে যে কারো পক্ষে উমাইয়া কিংবা আব্বাসী খলীফার মুকাবিলায় দাঁড়ানো এবং সফলভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো না। এজন্য প্রয়োজন ছিলো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে এমন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের যিনি ঈমান, আমল, ইখলাস, তাকওয়া ও চারিত্রিক মহত্ত্বে হবেন মুসলিম উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তদুপরি খান্দানী আভিজাত্যেও উচ্চ বংশ মর্যাদার পাশাপাশি তিনি হবেন বিরাট লোকবলের অধিকারী যাতে অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের মুকাবিলা করা যায় এবং বাতাসের মুকাবিলায় ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করা যায়।

এ কারণেই দেখা যায়, উমাইয়া ও আব্বাসী সালতানাতের বিরুদ্ধে যারাই বিদ্রোহ করেছেন এবং জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন নবী-পরিবার ও আলী-পরিবারের সদস্য। কেননা মুসলিম উম্মাহর অন্তরে তাঁদের প্রতি অখণ্ড ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রভাব বিদ্যমান থাকার কারণে তাঁদের নেতৃত্বে জিহাদি আন্দোলনের সফলতার সম্ভাবনা ছিলো অধিকতর উজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, এই নেতৃপুরুষগণ যখনই জিহাদের ডাক দিয়েছেন সমকালীন অলী-বুজুর্গ তথা সংশোধনকামী নেককার ও পুণ্যবান লোকদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছেন। যারা চারিত্রিক অধঃপতন খিলাফতের ভাবমূর্তির বিনষ্টতা, বল্গাহীন ভোগ-বিলাস ও জাহিলিয়াতের আচার-প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করার পেছনে মুসলমানদের সম্পদের সীমাহীন অপচয় হতে দেখে অন্তর্জ্বালা অনুভব করতেন।

হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-এর পর তাঁর পৌত্র যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন খিলাফতের মূল চরিত্র ও সঠিক ভাব-মর্যাদা পুনরুদ্ধারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উমাইয়া খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে ২১-১২ হিজরীতে শূলে চড়িয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর খিদমতে তিনি দশ হাজার দিরহাম হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন এবং ব্যস্ততার কারণে তাঁর সশরীরে উপস্থিত হতে না পারার ওযর পেশ করেছিলেন।

[মানাকিবে আবূ হানীফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫]

অতঃপর হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর বংশধরদের মাঝে নাফসে যাকিয়্যা (পুণ্যাত্মা) নামে সুপরিচিত মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান মদীনায় ও তার ভাই ইবরাহীম কুফায় উভয়ের মাঝে পূর্ব যোগাযোগ ও সমঝোতার মাধ্যমে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র) নাফসে যাকিয়্যার প্রধান সমর্থক ছিলেন। আবূ হানীফা (র) তো তাঁকে প্রকাশ্যে আর্থিক সহযোগিতা দান করেছিলেন এবং খলীফা আল-মানসুরের সেনাপতি হাসান ইব্ন কাহতাবাকে নাফসে যাকিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করেছিলেন যার ফলে সেনাপতি হাসান ইব্ন কাহতাবা খলীফা আল-মানসুরকে অভিযান পরিচালনায় তাঁর অপারকতার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও খলীফা মানসুরের মাঝে যা কিছু ঘটে ছিলো এবং যা কারাগারে ইমামের মৃত্যু ডেকে এনে ছিলো তার মূল কারণ ছিলো এটাই।

ইবনুল আসীরকৃত 'তারিখে কামিল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনাবাসিগণ ইমাম মালিক (র)-এর নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগদানের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে বলেছিলো, আমাদের ঘাড়ে তো আবূ জাফর আল-মনসুরের বায়'আত রয়েছে। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, বল প্রয়োগের মাধ্যমে অপারক অবস্থায় তোমরা বায়'আত হয়েছো, আর অক্ষম ব্যক্তির জিম্মায় কোন দায়বদ্ধতা নেই।

এ ফতোয়ার পর মানুষ দলে দলে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে আর ইমাম মালিক (র) ঘরে আবদ্ধ হয়ে

পড়েন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহকে ১৪৫ হিজরীর রমযান মাসে মদীনায় হত্যা করা হয়েছিলো। পক্ষান্তরে তার ভাই ইবরাহীমকে হত্যা করা হয়েছিলো একই বছর যিলকদ মাসে।

স্বাভাবিক কারণেই এ সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। কেননা সরকার ও প্রশাসন ছিলো সুসংহত এবং লোকবল ও অর্থবলসহ যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিলো তার দখলে। ফলে তার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন প্রচেষ্টাই মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। বিগত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের এমন বহু আন্দোলন প্রচেষ্টার কথাই আমরা জানি যা ঈমান, ইখলাস, বীরত্ব ও সাহসিকতার ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও তাঁদের অনুসারীরা জানমালের কুরবানী পেশ করতেও কখনো পিছপা হন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সুসংহত সরকার ও তার শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্বকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছে। ইতিহাসের এটা অভাবিতপূর্ব কোন ঘটনা নয় এবং বিশ্বজগতের চিরন্তন নিয়মেরও বিরোধী নয়; তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রাজনীতির ময়দানে ও স্থূল ফলাফলের দিক থেকে এ সকল আন্দোলন ও জিহাদী প্রচেষ্টা দৃশ্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও তা ইসলামের অতি বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে। কেননা এগুলোই ইসলামী ইতিহাসের মর্যাদা ও ভাবমর্যাদা রক্ষা করেছে।

যদি যুগে যুগে এ সকল সংগ্রামী চেতনা ও জিহাদী স্পৃহার প্রকাশ না ঘটতো এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন-নবুয়ত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস-প্রচেষ্টা অব্যাহত না থাকতো তাহলে গোটা ইসলামী ইতিহাস হয়ে পড়ত স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহদের স্বেচ্ছাচারিতার ও ভাগ্যান্বেষীদের রাজনৈতিক লীলাখেলার নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের বলে বলীয়ান এই মর্দে মুজাহিদগণ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ইতিহাসের সুদূর অন্ধকার পথে আলোর মিনার প্রজ্বলিত করে গিয়েছেন, যাতে সেই আলোর ইশারায় যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ পথের দিশা পেতে পারে এবং ঘুণে-ধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জযবা ও অনুপ্রেরণা

লাভ করতে পারে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামী যুগের সেই মহান শৌর্যবীর্যের প্রকাশ ঘটাতে পারে।

এ এমন সুমহান ঐতিহ্য যা নিয়ে ইসলাম গর্ব করতে পারে এবং এমন মহামূল্যবান সম্পদ যা যুগ যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুসলিম উম্মাহ কাজে লাগাতে পারে। এ হলো ইসলামী জিহাদের সেই পবিত্র ধারাবাহিকতা যা উম্মাহর হৃদয়ে ঈমান ও বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা এবং আশা ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করে।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।" [সূরা আহযাব ঃ ২৩]

দশম অধ্যায়

নবী ﷺ ও আলী (রা)-এর পরবর্তী বংশধরগণ

নবী ﷺ পরিবারের পরবর্তী বংশধরগণ এবং হযরত আলী (রা)-এর বংশধরগণ, নববী বংশ পরিচয়ের অতি প্রশংসা ও অতিভক্তির প্রতি অপ্রসন্নতা, পূর্ববর্তী তিন খলীফার প্রতি স্বীকৃতি- অসম সাহস ও উচ্চ মনোবল এবং জিহাদ ও সংগ্রামের ধারক ও বাহকগণ ইসলামের দাওয়াত ও আত্ম-সংশোধনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা- এ সম্পর্কিত কতিপয় উদাহরণ, শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামতের আকীদা, এই আকীদা গ্রহণের বিকৃত মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ, প্রাচীন ইরান ও তার আকীদা বিশ্বাসের প্রতিফলন।

দশম অধ্যায়

নবী ﷺ ও আলী (রা)-এর পরবর্তী বংশধরগণ

কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার পর হযরত আলী (রা)-এর বংশধরদের জীবন ও কর্ম

ক্ষমতাসীন সরকার ও তার অনুগতদের ললাটে কলঙ্কতিলক অঙ্কন করে কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো এবং জীবন ও জীবনধারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর সন্তান-সন্ততিও তাঁদের পূর্বের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন যার মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো পবিত্রতা ও শুচিতা, ইবাদত ও আখিরাত চিন্তায় আত্মনিমগ্নতা ও দুনিয়ার প্রতি মোহহীনতা, সত্যিকার আল্লাহ্-প্রেম ও অধ্যাত্ম সাধনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও মহানুভবতা এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা। মোটকথা, যে জীবন ও চরিত্র আওলাদে রাসূলের শান-উপযোগী, নবী-পরিবারের ও নবীর স্থলবর্তীদের অত্যুচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা মহাসমুদ্রের অথৈ জলরাশি হতে কয়েক ফোঁটা মাত্র পেশ করছি। কেননা নবী-পরিবার হলো ইসলামী চরিত্র ও নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র। প্রতিটি যুগের মানুষ এখান থেকেই লাভ করবে মহত্তম চরিত্রের, মানব হিতৈষণা, পরোপকারের ও চিত্ত ঔদার্য তথা মন্দের প্রতিদানে উত্তম আচরণের আদর্শ শিক্ষা।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রা) বলেন, আলী ইবনুল হুসায়নের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু ও ধার্মিক আমি আর কাউকে দেখিনি।

[হুলইয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪১]

ইমাম যুহরী (র) বলেন, কোন কুরায়শীকে আমি তাঁর চেয়ে উত্তম দেখিনি। আলী ইবনুল হুসায়নের আলোচনা শুরু হলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর বলতেন, তিনি হলেন যায়নুল আবেদীন (ইবাদতগুজারদের ভূষণ)।

রাতের অন্ধকারে তিনি রুটির বোঝা পিঠে বহন করে বের হতেন এবং চুপিসারে মদীনার অভাবী লোকদের হাতে তা পৌছে দিতেন।

জারীর (র) বলেন, রাতের অন্ধকারে গরীব-মিসকীনদের জন্য রুটির বোঝা বহন করার কারণে মৃত্যুর সময় তাঁর পিঠে দাগ দেখা গিয়েছিলো।

[প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৬]

হযরত শায়বা (র) বলেন, আলী ইবনুল হুসায়নের মৃত্যুর পর জানা গেল যে, তিনি মদীনার এক 'শ টি পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) বলেন, মদীনার বহু পরিবার জীবিকা লাভ করতো। কিন্তু কারো জানা ছিলো না যে, কোত্থেকে আসছে তাদের জীবিকা। আলী ইব্নুল হুসায়নের যখন ইন্তিকাল করলেন তখন রাতের অন্ধকারে আসা তাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে গেলো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৬]

দিনে ও রাতে মিলে প্রতিদিন তিনি এক হাজার রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। ঝড় শুরু হলে আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। [সাফওয়াতুস সাফওয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬]

আবদুল গাফফার ইব্ন কাসিম (র) বলেন, আলী ইবনুল হুসায়নের মসজিদের বাইরে ছিলেন। এমন সময় একজন লোক তাঁকে দেখতে পেয়ে মন্দ বলল। তাঁর দাস ও মাওয়ালীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধরতে গেলো। কিন্তু আলী ইবনুল হুসায়নের তাদের শান্ত করে লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কোমল স্বরে বললেন, তোমার কাছে আমাদের যে সকল অবস্থা গোপন রয়েছে তা আরো অনেক বেশি। যা হোক, বলো, তোমার কোন প্রয়োজন কি আমি পুরা করতে পারি? লোকটি লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলো। তখন তিনি নিজের গায়ের চাদর তাকে দিয়ে দিলেন এবং এক হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন। লোকটি এ ঘটনার পর প্রায়ই বলতো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই আপনি নবীর বংশধর। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬]

আলী ইবনুল হুসায়নের নিকট একদল মেহমান ছিলো। এক খাদেমকে তিনি মেহমানদের জন্য তন্দুর থেকে ভুনা গোশত তাড়াতাড়ি আনতে বললেন। গোলাম তা নিয়ে দ্রুত আসছিলো। ফলে গোশত গাঁথার 'শিক' তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে আলী ইব্ন হুসায়নের একটি শিশুপুত্রের মাথায় গিয়ে পড়লো। ফলে শিশুপুত্রটি মারা গেলো। তখন আলী ইব্ন হুসায়নের গোলামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি তো ইচ্ছা করে করোনি! যাও, তুমি আযাদ। অতঃপর তিনি শিশু পুত্রটির দাফন-কাফনে মনোযোগী হলেন। [প্রাগুক্ত]

আলী ইব্ন হুসায়নের জন্ম হয়ে ছিলো ৩৮ হিজরীর কোন এক মাসে। তার মা ছিলেন পারস্যের শেষ সম্রাট 'য়াযদাজারদ' কন্যা সোলাফা। ৯৪ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীকে আপন চাচা হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর কবরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই যায়নুল আবেদীন

আলী ইবনুল হুসায়নের মাধ্যমেই হযরত হুসায়ন (রা)-এর বংশধারা রক্ষিত হয়েছে।

হযরত যায়নুল আবেদীনের পুত্র মুহম্মদ আল বাকের, তাঁর পুত্র জাফর সাদিক, তাঁর পুত্র মুসা আল কাসিম ও তাঁর পুত্র আলী রেজা– এঁরা সকলেই হৃদয় ও আত্মার পবিত্রতায়, চারিত্রিক শুচিতা ও মহত্ত্বে, সহনশীলতা ও মহানুভবতায় আপন মহান পূর্বপুরুষগণের সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন।

হযরত আমর ইব্‌ন আবুল মিকদাম (র) বলেন, আবূ জাফর মুহম্মদ-এর দিকে তাকালেই আমার বিশ্বাস হতো যে, অবশ্যই তিনি নবীর বংশধর।

আর মুহাম্মদ-তনয় জাফর ইব্‌ন সাদিক ইবাদত-বন্দেগীতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। নেতৃত্ব ও জনসমাগমের পরিবর্তে নির্জনবাসকেই তিনি অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ-এর খিদমতে যাতায়াত করতাম। তিনি সদা 'স্মিতমুখ' ছিলেন। তাঁর সামনে যখন নবী ﷺ -এর আলোচনা হতো তখন ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হয়ে যেতেন। দীর্ঘদিন আমি তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করেছি কিন্তু তিন অবস্থার কোন একটির বাইরে তাঁকে আমি দেখিনি। হয় তিনি সালাত আদায় করছেন কিংবা রোযা রেখেছেন কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করছেন। কখনো তাঁকে অযু অবস্থা ছাড়া নবী ﷺ -এর আলোচনা করতে শুনিনি। অনর্থক কোন কথা তিনি বলতেন না। আল্লাহ্‌র ভয়ে ম্রিয়মাণ যাঁরা, তিনি ছিলেন সেই সকল ইবাদাতগুজার ও যাহিদের অন্যতম।

[আল-ইমাম আস-সাদিক, ইমাম আবূ প্রণীত, পৃষ্ঠা-৭৭]

মুসা ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (মুসা আল কাসিম) ছিলেন অতি সহনশীল ও মহানুভব যখন কারো সম্পর্কে তিনি তাঁকে কষ্ট দেয়ার খবর পেতেন তখন তার নামে কিছু অর্থ উপহার পাঠিয়ে দিতেন।

[সাফওয়াতুস সাফওয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৩]

এমন কি এক হাজার দিনারে পূর্ণ থলেও পাঠিয়ে দিতেন কখনো কখনো।

এছাড়া তিন'শ, চার 'শ ও দু 'শ দিনারের থলে তৈরি করে মদীনার মানুষের মাঝে তা বন্টন করতেন।

খলীফা আল মামুন আবুল হাসান আলী রেযা ইব্‌ন মূসা আল কাযিম ইব্‌ন জাফর সাদিক (র)-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। ১৫৩

হিজরীর কোন এক মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ২০০ হিজরীর সফর মাসের শেষ তারিখে ইন্তিকাল করেছিলেন। খলীফা আল মামুন নিজে তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং তাঁর পিতা হারুন রশীদের কবরের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করেছিলেন।

হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর বংশধর, অভিন্ন ঐতিহ্য, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন আসাকির (র) হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (হাসান আল মুসান্না নামে পরিচিত)-এর পরিচিতি পেশ করেছেন এবং এমন সকল গুণ ও কীর্তি উল্লেখ করেছেন যা তাঁর বিশেষ মর্যাদা, আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে।

তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ছিলেন মদীনার বিশিষ্ট তাবেঈ ও মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। ওয়াকিদী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ছিলেন বিশিষ্ট ইবাদতগুজারদের একজন। বিশেষ সম্মান, প্রতিপত্তি, 'ক্ষুরধার' ভাষা ও বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন।

মুসআব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলতেন, আমাদের কোন আলিমকে আমি আবদুল্লাহ ইবনুল হাসানের মতো সম্মান আর কাউকে করতে দেখিনি।

হযরত রাবী'আ, যিনি আবদুল্লাহ (র)-এর কথা ও বাণী শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এগুলো নবীগণের বংশধরদের উপযুক্ত কালাম ও বাণী। মক্কায় এক জামা'আতের মাঝে মুহাদ্দিস হযরত আইয়ুব বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁকে পেছন থেকে সালাম দিলেন। আর তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর দিকে ঘুরে গিয়ে নিম্নস্বরে সালামের জাওয়াব দিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বের ন্যায় ফিরে বসলেন। তাঁর দু'চোখ তখন অশ্রুপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হলেন নবীর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান। [তারীখে ইব্‌ন আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৭-৩৬৬]

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আলিমগণের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং অতি উচ্চ মার্গের ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন, তিনি সত্যবাদী ও আস্থাভাজন আলিম ছিলেন। ছুফয়ান সাওরী, ছারাওয়ারদী, মালিকসহ মুহাদ্দিসগণের এক জামা'আত তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৪৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁর পুত্র মুহাম্মদ যিনি মদীনায় বিদ্রোহ করে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন, তিনি উচ্চ মনোবল, অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় সাহস ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। নফল নামায ও রোযায় অধিক অগ্রণী ছিলেন। আল-মাহদী (হিদায়াতপ্রাপ্ত) নাফসে যাকিয়্যা (পবিত্রা) ছিলো তাঁর উপাধি। [তারীখে কামিল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫৩]

মহত্ত্ব, মহানুভবতা, সদয়ভাব ও নিজে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে রক্ষা করার মহানুভবতা– এ জাতীয় বহু উচ্চ গুণের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে ছিলো তাঁর মাঝে, যা আহলে বায়ত ও হাশেমীগণের সর্বকালীন বৈশিষ্ট্য। একটি মাত্র উদাহরণ দেখুন। মদীনায় খলীফা আলমানসুরের বাহিনীর সাথে যখন তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হলো এবং মুহাম্মদ নিশ্চিত হলেন যে, তিনি নিহত হতে চলেছেন তখন তিনি যে রেজিস্টারে তাঁর হাতে বায়'আতকারীদের নাম লিপিবদ্ধ ছিলো তা জ্বালিয়ে ফেললেন যাতে তাঁকে সমর্থনের অপরাধে তারা কোন রকম প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার শিকার না হয়।

নবী-বংশ পরিচয়ের প্রতি ঈর্ষা

যে পবিত্র রক্ত-সম্পর্ক তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সম্পৃক্তির সৌভাগ্য দান করেছিলো, সে সম্পর্কের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এ মহান সম্পর্ক-সূত্রকে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে কখনোই তাঁরা ব্যবহার করেন নি অন্যান্য জাতি ও ধর্মের আধ্যাত্মিক পুরুষ ও ধর্ম-নেতাদের পরিবার ও বংশধরদের বেলায় যেমন হয়ে থাকে। সর্বাবস্থায় তাঁরা অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় পবিত্রতা ভোগ করে থাকে এবং তাদের অনুসারীরা তাদের সাথে অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের ন্যায় আচরণ করে থাকে। কিন্তু নবী-পরিবারের বংশধররা কখনো দুনিয়ার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য তাঁদের পূর্বপুরুষদের নাম ব্যবহার করেন নি এবং তাঁদের মৃত্তিকামিশ্রিত অস্থিকংকালের ওপর গৌরবের প্রাসাদ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নি। ইতিহাস ও জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে তাঁদের আত্মসম্মানবোধের যে সকল চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য জাতি ও ধর্মের পেশাদার আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত এক জীবনচিত্র পেশ করে, যেখানে অতি পবিত্রতা আরোপ কিংবা আলাদা সুবিধা ভোগের কোন অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ও যাজকশ্রেণী জন্মসূত্রে একটি ধর্মীয় পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। ফলে জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ

করার জন্য তাদের কোন পরিশ্রম করতে হয় না। কপালের এক ফোঁটা ঘামও ঝরাতে হয় না।

হাসান ইব্ন আলী (রা) একবার কোন প্রয়োজনে বাজারে গেলেন এবং এক দোকানদারকে একটি পণ্যের দাম জিজ্ঞেস করলেন। দোকানদার সাধারণ দাম বললো। অতঃপর যখন জানতে পারলো যে, ইনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দৌহিত্র তখন তাঁর সম্মানার্থে হ্রাসকৃত মূল্য বললো। কিন্তু হাসান ইব্ন আলী (রা) তা গ্রহণ করলেন না, বরং জিনিস না কিনেই চলে এলেন। তিনি বললেন, তুচ্ছ একটি বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থেকে ফায়দা ওঠাতে রাজি নই।

যায়নুল আবেদীন আলী ইব্নুল হুসায়ন (র)-এর বিশিষ্টতম খাদেম জুয়াইরিয়া বিন আসমা (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসায়ন (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়তার সুবাদে একটি দিরহামও কখনো অতিরিক্ত গ্রহণ করেন নি।

সফরের সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখতেন। এ সম্পর্কে একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সাধারণ পরিচয়ে যা আমাকে দেয়া হবে না তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিচয়ের সুবাদে গ্রহণ করা আমার অপছন্দ।

আবুল হাসান আলী রেযা ইব্ন মূসা আল কাযিম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, সফরের সময় নিজের পরিচয় তিনি গোপন রাখতেন।

এ সম্পর্কে একবার জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। বললেন, সাধারণ পরিচয়ে যা আমাকে দেয়া হবে না, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিচয়ের সুবাদে গ্রহণ করা আমার অপছন্দ।

[ইব্ন খাল্লিকানকৃত ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৪]

অতিভক্তি ও অতি প্রশংসার প্রতি অসন্তুষ্টি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রক্ত-সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরা খুবই সংযমী ও সতর্ক ছিলেন। এ ক্ষেত্রে ইহুদী, খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মণ ধর্মের (হিন্দু ধর্ম) কট্টর গোড়া অনুসারীদের ন্যায় তাঁদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রেও মানুষ অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করবে, এটা তাঁরা মোটেই পছন্দ করতেন না।

ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (রা) বলেন, একদল লোক আলী ইবনুল হুসায়নের পাশে জড়ো হয়ে অতিরঞ্জিত ভক্তিমূলক কিছু কথা বললো। তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

احبونا حب الاسلام لله عز وجل فانه ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً.

"আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইসলামের ভিত্তিতে ভালোবাসবে। কেননা তোমাদের (অতিরঞ্জিত) ভালোবাসা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।" [হুলইয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬]

তদ্রূপ খালাফ ইব্‌ন হাওশাব আলী ইবনুল হুসায়ন সম্পর্কে বলেন, "হে ইরাকবাসিগণ! আমাদের ইসলামের ভিত্তিতে ভালবাসবে। আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য মর্যাদার উর্ধ্বে তুলে ধরবে না।" [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৭]

তিনি আরো বলেছেন, আমরা আহলে বায়তের লোকেরা আমাদের পছন্দনীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করি এবং অপছন্দনীয় বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি।

আহলে বায়তের প্রতি জনৈক ব্যক্তি অতিরঞ্জিত ভক্তি প্রকাশের জবাবে হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও একইভাবে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "ছি! আমাদেরকে শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালোবাসবে। যদি আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করি তাহলেই আমাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানি করি তাহলে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। কেননা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটাত্মীয়তা যদি কারো জন্য উপকারী হতো তাহলে তাঁর মাতা-পিতার জন্যই তা উপকারী হতো। আমাদের সম্পর্কে যা সত্য তাই বলবে। কেননা এটাই তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভের জন্য অধিক কার্যকর। আর আমরাও তোমাদের প্রতি এতেই সন্তুষ্ট হবো। [ইব্‌ন আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৯]

আরেকবার তিনি তাঁর একদল প্রশংসাকারীকে বলেছিলেন, "ছি! আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করি তাহলে এই আনুগত্যের কারণেই শুধু আমাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানি করি তাহলে এই নাফরমানির কারণে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।"

মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা সর্বদা অতি যত্নবান ও আন্তরিকভাবে প্রয়াসী ছিলেন। শহীদ যায়দ ইব্‌ন আলীর জনৈক সহচর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন বাবক (বাবকী নামে পরিচিত) বলেন, যায়দ ইব্‌ন আলী (রা)-এর সঙ্গে আমরা মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। যখন মধ্যরাত হলো এবং সুরাইয়া তারকা স্থির হলো তখন তিনি বললেন, হে বাবকী! এই যে

সুরাইয়া তারকা দেখছ, তোমার কি মনে হয় যে, কেউ তার নাগাল পাবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কামনা এই যে, আমি যদি সুরাইয়ার সাথে ঝুলে থাকতাম আর পৃথিবীতে কিংবা যে কোন স্থানে হোক পড়ে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে সমঝোতা সৃষ্টি করে দিতেন তাহলে কতই না ভালো হতো!

তিন খলীফার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

ইসলামে তিন খুলাফায়ে রাশেদীনের মহান অবদান ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ওপর তাদের অপ্রতিশোধ্য ঋণের কথা তাদের জানা ছিলো ও প্রকাশ্য জনসমক্ষে তাঁরা সে কথার সুস্পষ্ট ঘোষণাও দিতেন। ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ বলেন,

একদল ইরাকী আলী ইবনুল হুসায়ন (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা) সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু করলো। যখন তাদের কথা শেষ হলো তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের ঐ ভাইদেরকে যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে অগ্রগামী হয়েছে এবং আমাদের অন্তরে ঐ লোকদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন না যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহে আপনি সদয়, দয়ালু। [সূরা হাশর : ১০]

সুতরাং তোমরা বের হয়ে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের অমঙ্গল করুক। ওরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা)-কে আমি তরবারি কারুকার্য খচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর তরবারি কারুকার্য খচিত করেছেন। আমি বললাম, আপনি সিদ্দীক বলছেন? ওরওয়া বলেন, একথা শোনা মাত্র তিনি লাফ দিয়ে উঠে কেবলামুখী হলেন। অতঃপর বললেন,

অবশ্যই সিদ্দীক, তাঁকে যে সিদ্দীক না বলবে আল্লাহ্ যেন দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন কথাকে সত্য বলে গ্রহণ না করেন।"

কুফাবাসী জুফা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি, যিনি হযরত জাবির (রা)-এর মাওলা ছিলেন, তিনি বলেন, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী আমাকে বিদায় দানকালে বললেন, কুফাবাসীদেরকে জানিয়ে দাও, যারা আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন।

[সাফওয়াতুল সাফওয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি আবূ জাফর মুহম্মদ ইব্ন আলী হতে বর্ণনা করেন। আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আবূ বকর ও উমর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত নয় সে মূলত সুন্নাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ। [প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৫]

আবূ খালিদ আল আহমর বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান (রা)-কে আমি আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আর যারা তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণের দু'আ করে না তাদের প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ না করুন!

অতঃপর তিনি বললেন, আমি এমন কোন লোক দেখিনি, যে আবূ বকর ও উমর (রা)-কে মন্দ বলেছে আর পরবর্তীতে কখনো তাওবার তাওফিক তার হয়েছে।

অতঃপর তিনি হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের আলোচনা করলেন এবং এত বেশি কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি ও কাপড় ভিজে গেলো।

অসম সাহস, উচ্চ মনোবল, জিহাদ, সংগ্রামের ধারক ও বাহকগণ

আহলে বায়ত ও শেরে খোদা আলী ইব্ন আবূ তালিবের সন্তান ও বংশধরগণ অত্যুচ্চ মনোবল ও অসমসাহসিকতার অধিকারী ছিলেন যা শুরু থেকে নবী পরিবারের বৈশিষ্ট্য এবং আলী মুরতাযা ও শহীদে কারবালা হুসায়ন (রা)-এর ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার ছিলো। সত্যের পথে অবিচল থেকে সকল বিপদ-মুসিবত উপেক্ষা করে এবং কঠিনতর প্রতিকূলতার মুকাবিলা করে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মহান লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবন ও কর্ম পরিচালিত করেছেন।

ইতিপূর্বে আমরা উমাইয়া খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের মুকাবিলায় যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়নের জিহাদী ভূমিকা ও

আব্বাসী খলীফা আল-মানসুরের মুকাবিলায় নাফসে যাকিয়া মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও তাঁর ভাই ইবরাহীমের মহান সংগ্রামের কথা বর্ণনা করে এসেছি। ইসলামী ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এটাই ছিলো তাঁদের নীতি ও বৈশিষ্ট্য। তাই দেখা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক বাহিনী ও দখলদার বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ও সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্বের আসনে রয়েছেন আহলে বায়তের কোন-না-কোন মুজাহিদ পুরুষ। তাঁদের ইতিহাস, শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার অকথিত ইতিহাস এবং সুমহান কীর্তি ও কর্মের ইতিহাস যা অজ্ঞতার অন্ধকার বিবর থেকে মুক্তির আশায় আজও অপেক্ষা করছে সেই বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের যিনি পরম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে তুলে ধরবেন মুসলিম উম্মাহ্‌র সামনে কোন একটি গ্রন্থে কিংবা গ্রন্থমালায়।

পক্ষান্তরে আহলে বায়তের প্রতি অতিভক্তির দাবিদাররা ও ভক্তির নামে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের উদ্ভাবকরা তাদের জীবন ও চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র অংকন করেছেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের হিম্মত ও সাহস বলতে কিছুই ছিলো না, বরং একটা ভয়-ভীতি ও বিপদাংশকার মাঝেই তাদের জীবন অতিবাহিত হতো। ফলে সত্য গোপন ও অবস্থা বুঝে চলার নীতিই তারা অনুসরণ করতেন এবং স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে "তাকিয়্যা"-এর আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং সেটাও ব্যক্তি পর্যায়ে সাময়িক সমাধানরূপে নয়, বরং সামষ্টিক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও ইবাদতরূপে তারা তা করতেন এবং কারণে-অকারণে তাকিয়্যা নামক এ অস্ত্র প্রয়োগে উম্মতে মুহাম্মদীকে তারা নবুয়তের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং দীনের নিজস্ব মর্যাদা ও আত্মশক্তি এবং বিপদ-ঝুঁকি ও প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলার স্বভাব প্রেরণা বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন।

মোটকথা, আহলে বায়তের এই মহান ইমামগণের যে জীবনচিত্র তাঁদের গুণ ও প্রশস্তি বর্ণনায় লিখিত গ্রন্থগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে তা বিভিন্ন দেশে সক্রিয় বিভিন্ন গুপ্ত সংস্থা ও ফ্রিম্যাশন সংগঠনের উপস্থাপিত জীবনচিত্র থেকে মোটেই ভিন্ন নয় এবং তা অধ্যয়নকারীর অন্তরে ইসলামের প্রসার ও দীনের বিজয় অর্জনের জন্য মৃত্যুভয়হীন সংগ্রাম সাধনার এবং জিহাদ ও কুরবানী, অত্যুচ্চ মনোবল ও প্রেরণা উৎসারিত হয় না, সেই সুমহান প্রেরণা যা বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ যুগে ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং

ঘটনা প্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের সুদীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছরে সময়ের ধারাকে বারবার নতুন দিক গ্রহণে বাধ্য করেছে।

ইসলামের দাওয়াত ও উম্মাহর আত্মসংশোধনে তাদের অবদান 'আলাবী রক্তের' উভয় শাখা তথা হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর মাধ্যমে যারা নবী পরিবারভুক্ত হয়েছেন, বহু যুগ পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি এমন সকল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন ও অনন্যসাধারণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। অসংখ্য মানুষ তাদের দাওয়াতী ত্যাগের বদৌলতে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এ সকল অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করার পর ইসলাম-বৃক্ষ তার প্রতিপালকের ইচ্ছায় যুগ যুগ ধরে প্রতিনিয়ত অশেষ সুফল দান করে এসেছে। বড় বড় আলিম ও আধ্যাত্মিক পুরুষ সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'মাসজিদে আকসা' অঞ্চলে বারবার জাতির ক্ষেত্রে ও ভারতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর অঞ্চলে যেমন ঘটেছিলো।[১]

তদ্রূপ এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, কাশ্মীর উপত্যকা ইসলামী সভ্যতার প্রবেশ, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনবসতির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ (আল্লাহ্‌র রহমতে এখনও পর্যন্ত এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রয়েছে), বিভিন্ন শিল্প সাহিত্যের বিকাশ ও প্রথিতযশা বহু আলিম-ওলামার আত্মপ্রকাশ– এসবের জন্য কাশ্মীর উপত্যকা যাঁর নিকট ঋণী, তিনি হলেন মহান দাঈ আমীর সৈয়দ আলী ইব্‌ন শিহাব আল হামাদানী।[২] তদ্রূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ দেশগুলোতে ও ভারতীয় দীপপুঞ্জ তথা ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক অবদান ছিলো সাইয়্যিদগণের। ফ্যান্ডন ব্যারথ, এলও, এস তার ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, ইসলাম বিস্তারের প্রভাব শক্তি মূলত এসেছে সম্মানীয় সাইয়েদগণের মধ্য থেকে। তাঁদের মাধ্যমেই জাভা ও অন্যান্য এলাকায় শাসকগণের মাঝে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, যদিও হাযরামাওতের অধিবাসী– আরবরাও সেখানে ছিলো, কিন্তু সেই

---

১. ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে, আফ্রিকায় ইসলামী হুকুমতের প্রতিষ্ঠাতা ইদরীস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান (মৃ. ১৭৫ হিজরী)-এর কর্তৃত্ব যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং তাঁর দাওয়াতী মিশন পরিপূর্ণতা লাভ করলো, তখন তিনি মাগরিব এলাকায় বসবাসকারী বারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, যাদের অধিকাংশই ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মের অনুসারী ছিলো, তখন তারা তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো।

২. নুযহাতুল খাওয়াতিরের বর্ণনামতে ইনি ছিলেন ইসমাঈল বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসায়ন-এর বংশধর। সাত'শ তিয়াত্তর হিজরীতে (মতান্তরে সাত'শ আশি হিজরীতে) সাত'শ অনুগামীসহ তিনি কাশ্মীরে আগমন করেছিলেন এবং তাঁর হাতে কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫)। তিনি সাত'শ ছেয়াশি হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

রকম প্রভাব তাদের ছিলো না। অতঃপর তিনি এ বাস্তব প্রেক্ষিতে বর্ণনা দিয়ে বলেন, এর মূল কারণ এই যে, এঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক রাসূলের বংশধর।

'শ্রাভাক' ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলতান বারাকাত হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবের বংশধর ছিলেন। তাছাড়া হাযরামাউতের অধিবাসী হুসায়নী সাইয়েদগণ নৌ-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে ছিলো এবং এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ করেছিলেন।

১৩৮২ হিজরী আট যিলহজ্জ (মুতাবিক ত্রিশে এপ্রিল ১৯৬২) তারিখে অনুষ্ঠিত পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হাযরামাউতের অধিবাসী আলাবী সাইয়েদগণই ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচার করেছেন।

তদ্রূপ খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আলাবী সাইয়েদগণের একটি জামায়াতের মাধ্যমে ফিলিপাইনের বিভিন্ন দ্বীপে ইসলাম প্রবেশ করেছিলো। এই মহান ব্যক্তিগণ ইসলামী দাওয়াতের পতাকা বহন করে ফিলিপাইনে পৌঁছেছিলো। শুধু তাই নয়, সে দেশের উন্নয়নে ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রসরতা অর্জনের ক্ষেত্রেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বীপদেশ চাঁদ, মাদাগাস্কার, মুজাম্বিক, মালয় প্রভৃতি দেশে ইসলামের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসও অভিন্ন।

অতি উচ্চ মর্যাদাবান বহু আধ্যাত্মিক পুরুষও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সাইয়েদগণের মাঝে, যাঁরা তাকওয়া ও সুন্নাতের ইত্তেবা, আত্মপূজা ও প্রবৃত্তিপূজা পরিহার, দুনিয়াবিমুখতা, আখিরাত চিন্তা, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মাধ্যমে উম্মতের আত্মসংশোধন ও তাযকিয়ার মহান সাধনায় ও স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জ্ঞান সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজ সংস্কার, চরিত্র সংশোধন, দাওয়াত ইলাল্লাহ ইত্যাদি দীনী কর্মকাণ্ডে তাঁরাই ছিলেন প্রাণপুরুষ। তাই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাঁদের কাছে এসে ভিড় জমাতো।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে সে গৌরব ও মর্যাদা দান করেছিলেন, দুনিয়ার বাদশাহ ও শাহানশাহদের মর্যাদা-গৌরবও তার সামনে ছিলো নিষ্প্রভ, অবশ্য আমরা আল্লাহ্‌র সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করছি না এবং আমাদের বক্তব্যকে ব্যতিক্রমহীন বলেও দাবি করছি না, বরং আমরা স্বীকার করি যে, নবী ﷺ-এর

পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত এমনও অনেকে ছিলেন যাঁরা নবী-পরিবারের এই সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারেন নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আপন পূর্বপুরুষদের অনুসৃত পথ ও পন্থা থেকে কিছু বিচ্যুতিও দেখা দিয়েছিলো। তদ্রূপ তাকওয়া, পরহেযগারি, সুন্নাতের ইত্তেবা, নবী-প্রেম, দীনের প্রতি জযবা, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ, কুরবানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদেরকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছেন এমন অনেক মহান ব্যক্তিত্ব অন্যদের মাঝেও ছিলেন। কিন্তু আমরা সামগ্রিক অবস্থার কথা বলছি। পরম বিশ্বস্ততার সাথে ইতিহাস এ বিষয়ে যা কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছে তা থেকে যৎসামান্য এখানে আমরা তুলে ধরেছি।

এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে সকলকে ধারণ করা যেহেতু সম্ভব নয়, সেহেতু ইমাম আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করবো। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও মানব হৃদয় ও আত্মার সংশোধনের ক্ষেত্রে তিনি অতি উচ্চ মকাম ও মরতবা লাভ করেছিলেন। গাফলাতের ঘোরে বেহুঁশ কত মানুষের মৃত হৃদয়ও তার পুণ্য সংস্পর্শে নব জীবন লাভ করেছে এবং হৃদয়ের নিভেযাওয়া আলো পুনঃপ্রজ্বলিত হয়েছে। তাঁর ওয়ায ও উপদেশবাণী এবং তাঁর তারবিয়াত ও রূহানী দীক্ষা ঈমানের এমন এক সঞ্জীবনী বায়ু প্রবাহিত করেছিলো, যা ইখলাস ও তাকওয়া, উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহ্তে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নির্ভেজাল তাওহীদ-এর এক নতুন দুনিয়া আবাদ করেছিলো। মুসলিম জাহানের সকল মৃত শহর, শহরের সকল মৃত মানুষ ও সকল মানুষের মৃত হৃদয়গুলো যেন ঈমানের সঞ্জীবনী বায়ুর স্পর্শে নতুন প্রাণ লাভ করেছিলো।

শায়খ ওমর আল কায়সানী বলেন, "শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর কোন মজলিশ এমন হয়নি যে, সেখানে কোন ইহুদী কিংবা খ্রীস্টান ইসলাম গ্রহণ করেনি কিংবা কোন ডাকাত, খুনী ও অন্যান্য ফাসিক ব্যক্তি তাওবা করেনি কিংবা কোন ভ্রান্ত আকীদার মানুষ সহীহ্ আকীদার পথে প্রত্যাবর্তন করেনি তাঁর হাতে পাঁচ হাজারেরও বেশি ইহুদী ও নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এক লাখেরও বেশি সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী তাওবা করেছে।

[কালায়িদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা-২২]

তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণকারী সাধক পুরুষগণও পূর্ণোদ্যমে দাওয়াত, তারবিয়াত ও তাযকিয়ার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং আফ্রিকার গভীর অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁদের কল্যাণে (আফ্রিকায়) ইসলাম ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিলো।

এ ছাড়া ইলমের প্রচার-প্রসার ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে সুন্নাহ্ ও সহীহ্ আকীদার ক্ষেত্রেও ইমাম আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর বিশেষ অবদান ছিলো।

ভারত উপমহাদেশেও আওলাদে রাসূল ও সাইয়েদগণের মাঝে বহু সাধক পুরুষ ও সংস্কারক বুজুর্গানের আবির্ভাব ঘটেছিলো। মানুষের হৃদয় ও আত্মার সংশোধন ও রূহানী রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর শরীয়তের সাথে মানুষের সুগভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুমহান দায়িত্ব তাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন। এখানে তাঁদের সকলের কীর্তি ও কর্মের বিবরণ পেশ করা তো দূরের কথা, শুধু নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেশ করাও সম্ভব নয়! তাই আমরা শুধু মহান সাধক পুরুষ শায়খ নিযামুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আলবাদায়ুনী দেহলবী (র) তাঁর সুযোগ্য খলীফা শায়খ মাহমুদ ইব্ন ইয়াহয়া (ওরফে নাসিরুদ্দীন) দেহলবী ও তাঁর খলীফা সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল হুসায়নী (র)-এর অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো। সর্বস্বীকৃত বংশ পরিচয়ে তাঁরা সকলে আওলাদে রাসূল ছিলেন।

শায়খ নিযামুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল বাদায়ুনী (৬৩৬-৭১৫) [র] সম্পর্কে আল্লামা-আলী ইব্ন সুলতান আলকারী আলমক্কী (র) তাঁর রচিত 'আল আছমার আল-জিনিয়াফী আসমাইল হানাফিয়্যাহ' কিতাবে বলেন, মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক বর্জন, ইবাদতের পথে পরিচালিত করা ও এর পাশাপাশি যাবতীয় ইলমে জাহিরীতে পারদর্শিতা অর্জন এবং মহত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষ।

'আলকামূস' প্রণেতা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী তাঁর রচিত "আল আলতাফ আল খাফিয়্যা ফী আশরাফিল হানাফিয়্যাহ" কিতাবে তাঁর পরিচিতি পেশ করেছেন।

শায়খ মাহমুদ ইব্ন ইয়াহয়া (ওরফে নাসিরুদ্দীন) আল হুসায়নী একজন বড় মাপের আল্লাহ্ওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। হাদীস ও সুন্নাহর ওপর অবিচল আমল, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান, মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন, তাদের প্রতি সদয় আচরণ, যুহদ ও দুনিয়ার প্রতি মোহহীনতা, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্তে পূর্ণ আত্মনিবেদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি বহু দীর্ঘ রিয়াযাত মুজাহাদা করেছেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম

করেছেন। ৭৭৫ হিজরীতে দিল্লী শহরে তিনি ইন্তিকাল করেছেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন।

শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ছিলেন বহু শাস্ত্রবিশারদ আলিম ও ফকীহ, বহু কারামাত ও আধ্যাত্মিক উচ্চ মরতবার অধিকারী যাহিদ বুজুর্গ। তাঁর পুরো নাম হলো আবূ ফাতাহ্ সদরুদ্দীন মুহম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ দেহলবী। তাঁর বংশ সূত্র যুক্ত হয়েছে ইয়াহয়া ইবনুল হুসায়ন ইবন যায়দ শহীদ (র)-এর সাথে। বাহ্যিক জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, উভয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সকলের ভরসার স্থল। শরীয়ত ও তরীকত উভয়েরই একত্র সমাবেশ ঘটে ছিলো তাঁর মাঝে, মানুষের হৃদয় ও আত্মার সংশোধন এবং কল্যাণ ও সত্যের পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সকলের শেষ আশ্রয়। হাকীকত ও তত্ত্বজ্ঞানে মহাসমুদ্রের তিনি ছিলেন জ্ঞানডুবুরী। এই যাহিদ বুযুর্গ ৭২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসী সাইয়েদগণের আরেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন সৈয়দ শরীফ আল্লামা আশরাফ ইব্‌ন ইবরাহীম আল হাসানী আল হুসায়নী (ওরফে জাহাঙ্গীর)। তিনি শাসনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সম্পদ-প্রাচুর্যের মাঝে শাহজাদাদের মতো প্রতিপালিত হন এবং সমকালীন প্রাজ্ঞ ওস্তাদগণের নিকট ইলম অধ্যয়ন করেন। উপযুক্ত বয়সে পিতার স্থলে রাজত্বভার গ্রহণ করেন এবং প্রজা শাসনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পাশাপাশি শায়খ রোকনুদ্দীন আলাউদ্দৌলাহ সামনানী ও অন্যান্য ওলামা-মাশায়েখের সংস্পর্শেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অতঃপর রাজত্ব পরিত্যাগ করেন এবং আপন ভ্রাতা মুহাম্মদের হাতে রাজ্য ক্ষমতা অর্পণ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও তারবিয়াতের মহান খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুত তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন।

[নুজহাতুল খাওয়াতির, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬৪]

তিনি অতি বড় তত্ত্বজ্ঞানী আলিম ছিলেন। প্রচুর দীনী সফর করতেন। ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, ইলমুল কালাম, বংশবিদ্যা, সীরাত, তাফসীর ও তাসাওফ বিষয়ে তাঁর বহু গ্রন্থ ও রচনাকর্ম রয়েছে। তাঁর স্বরচিত একটি কাব্য সংকলনও রয়েছে। তিনি ৮০৮ হিজরীর ২৮ মুহররম ইন্তিকাল করেছেন। এই মহান সাধক পুরুষদের দাওয়াতী ও ইসলাহী মেহনত মুজাহাদার আবেদন ও

প্রভাব তাঁদের তারবিয়াতি পরিমণ্ডল ও শিষ্যবর্গের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং সুবিস্তৃত ইসলামী সমাজের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে ছিলো ঘরের ব্যক্তিগত জীবনে, বাজারের সামাজিক কর্মকাণ্ড ও রাজপ্রাসাদের শাসন নীতিতে সর্বত্রই সুস্পষ্ট অনুভূত হতো এই মহান সাধকদের শিক্ষা-দীক্ষার আধ্যাত্মিক প্রভাব।

আমাদের পূর্বোল্লিখিত শায়খ নিযামুদ্দীন আল-বাদায়ুনী (র)-এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত এক শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক হলেন যিয়াউদ্দীন আল বারনী। তিনি সমাজ জীবনে ও জনসাধারণের মাঝে শায়খের অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, শায়খের ঈমান, ইখলাস,যুহদ ও তাকওয়াপূর্ণ জীবনের সংস্পর্শের বরকতে যিন্দেগীর সকল লেনদেন ও আদান-প্রদানে সরলতা ও সত্যবাদিতার প্রতি সাধারণ জযবা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামের নিদর্শনাবলী বৈশিষ্ট্যগুলোর ও শরীয়তের যাবতীয় আহকামের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিলো। মানুষ স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই হারাম ও নাফরমানি কাজ পরিত্যাগ করছিলো। ইবাদত ও নফল আমলের প্রতি ও জনকল্যাণমূলক আমলের প্রতি মানুষের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়েছিলো। তদ্রূপ বহু মানুষ মদ-জুয়া, নেশা, পাপাচার, সুদখোরি, মজুদদারি, ওজনে চুরি ও প্রতারণাপূর্বক পণ্যদ্রব্য বিক্রি থেকে তাওবা করেছিলো। এ ধরনের আরো বহু বিষয় যা মানুষের জীবন ও চরিত্রের গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে।

[তারীখে ফিরোযশাহী, পৃষ্ঠা ৩৪১ - ৩৪৬]

আল্লাহ্‌র প্রতি দাওয়াত, ইসলাহ ও তাযকিয়া তথা মানুষের হৃদয় ও আত্মার সংশোধনের সাধনায় নিবেদিত এই সাধক পুরুষগণ এমন নন যে, শুধু অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিলেন এবং এই সুবিশাল ভূখণ্ডে ইসলামের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে এমন সকল ঘটনা ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করতেন, এমন নয়, বরং এই দেশ ও দেশের অধিবাসী মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁরা সদাসতর্ক ও সচেতন ছিলেন। কেননা তাঁরা জানতেন যে, এ বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ড হচ্ছে ইসলামের সুদীর্ঘ শাসন-ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায় এবং অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এ দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রসঙ্গে দু'টি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি।

প্রথম ঘটনাটি হলো ভারত ভূমিতে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিবেদিত সুলতান ফিরোয শাহ তুঘলকের রাজ্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক রাজধানী দিল্লী থেকে দূরে হঠাৎ

মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তিনি তখন সিন্ধু নদের অপর পাড়ে সমবেত মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা ইসলামী বাহিনী নেতৃত্বহীন অবস্থায় রাখালহীন অরক্ষিত মেষপালের ন্যায় হয়ে গেলো এবং ইসলামী হুকুমাত ক্ষমতালোভীদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের শিকারে পরিণত হলো। এদিকে মরহুম সুলতানের চাচাত ভাই ফিরোয তুঘলক দায়িত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন। কেননা রাজত্ব ও ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোন লোভ বা মোহ ছিলো না।

সেই নাযুক মুহূর্তে শায়খ মাহমূদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া (ওরফে নাসিরুদ্দীন সিরাজে দেহলবী) এগিয়ে এলেন এবং সুলতান ফিরোযকে তাঁর চাচাত ভাইয়ের উত্তরাধিকাররূপে রাজ্যভার গ্রহণ করার এবং ইনসাফের সাথে প্রজা শাসন ও জিহাদ পরিচালনার অনুরোধ জানালেন। তিনি তাঁকে দু'আ দ্বারা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দান করলেন। তখন সুলতান ফিরোয তুঘলক শায়খের আদেশ শিরোধার্য করে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন এবং সুদীর্ঘ ৪০ বছর এমন ইনসাফের সাথে দেশ শাসন করলেন যে, মুসলিম বাদশাহদের শাসন ইতিহাসে শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও আসমানী বরকতের প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের ইতিহাসের এটাই ছিলো সর্বোত্তম সময়কাল। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮]

দ্বিতীয় উদাহরণ : হিন্দু রাজা যখন 'বঙ্গ' এলাকার শাসন ক্ষমতা দখল করে বসলো এবং অত্র এলাকার ইসলামী শাসনের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হলো তখন দুই শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখ শায়খ নূর ও সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সামনানী জৌনপুরের রাজধানীতে ক্ষমতাসীন সুলতান ইবরাহীমকে এই উদ্ভূত বিপদের মুকাবিলা করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং একাধিক পত্রযোগে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তাঁদের আহ্বানের প্রেক্ষিতে সুলতান স্বয়ং সৈন্যাভিযান পরিচালনা করলেন। ফলে হিন্দু রাজা তার বাহিনীসহ পশ্চাদপসরণ করলো। দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের মহান কাজে নিবেদিত সাইয়েদগণের মাঝে আরেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন মহান তত্ত্বজ্ঞানী শায়খ আদম ইব্‌ন ইসমাঈল আল হুসায়নী আল কাসেমী বিন্নোরী (র)। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছ থেকে জাহিরী ও বাতিনী ইল্‌ম গ্রহণ করেছেন। কথিত আছে, এক লাখ মুসলমান শরীয়তের আহকাম মেনে চলার এবং সুন্নাতের ইত্তেবা করার শর্তে তাঁর হাতে বায়'আত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে এক হাজার লোক ইলম ও মারিফাতের বিরাট হিস্‌সা লাভ করেছিলো।

কথিত আছে, প্রতিদিন গড়ে অন্তত এক হাজার লোক তাঁর খানকায় অবস্থান করতো। এরা সকলে তাঁর দস্তরখানে মেহমান হতো এবং তাঁর সংস্পর্শে থেকে রূহানী ফয়েয লাভ করতো। ১০৫২ হিজরীতে তিনি লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলো সকল তবকার মাশায়েখ ও সাইয়েদগণের দশ হাজার মানুষের বিশাল কাফেলা। ভারত সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি সে সময় লাহোরে ছিলেন। সম্রাট তাঁকে হারামাইন শরীফের উদ্দেশে সফর করার পরামর্শ দিলেন। তাই শায়খ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে মদীনা শরীফে বসবাস শুরু করলেন। তিনি ১০৫৩ হিজরীতে সেখানে ইন্তিকাল করলেন। [নুজহাতুল খাওয়াতির, পৃষ্ঠা ১ - ২]

স্থান ও কালের বহু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখন আমরা এমন এক মহান ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত, যাঁকে মারিফাতের আলোকপ্রাপ্ত বহু অন্তর্জ্ঞানী ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদরূপে গণ্য করেছেন। কেননা তাঁর অস্তিত্বের বরকতে ও দাওয়াতি মেহনতের বদৌলতে নির্ভেজাল ঈমান ও তাওহীদের নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয়েছিলো। সুন্নতের ইত্তেবা, শরীয়তের আহকামের কঠোর স্তরের ওপর আমল, জিহাদ, শাহাদাত ও ইসলামী শৌর্যবীর্যের অতীত পুনরুজ্জীবিত করার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরে জাগ্রত হয়েছিলো। আত্মঅহমিকা ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মহান শরীয়তের বাস্তবায়ন এবং খিলাফতে রাশেদার তরীকায় ইসলামী হুকুমাত কায়েমের সর্বাত্মক সংগ্রামের এক পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসন ক্ষমতা জবরদখলকারী ও ইসলামী বিশ্বের জন্য ভয়ংকর বিপদরূপে আবির্ভূত বিদেশী ইংরেজ রাজশক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের মহান জিহাদে তিনি জানমাল উৎসর্গ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত তাঁকে বৃটিশ রাজশাসন ও তার ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জরূপে বিবেচনা করেছে। তিনি হলেন মহান দাঈ ইলাল্লাহ, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ ও মুসলিম মিল্লাতের রূহানী মুরুব্বী সৈয়দ ইমাম আহমদ ইব্‌ন ইরফান শহীদ (র)।

এই ঈমানী জাগরণ ছিলো এমনই প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এবং এমনই অশেষ বরকত ও কল্যাণবাহী, যার তুলনা নিকট শতাব্দীগুলোর দাওয়াত ও জিহাদী আন্দোলনের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ আলিম লেখক ভূপালের নওয়াব আল্লামা সৈয়দ সিদ্দীক হাসান (মৃ. ১৩০৭ হি.) যিনি সৈয়দ শহীদের খলীফাদের ও তাঁদের মেহনত মুজাহাদার ফলাফল সচক্ষে দেখেছেন। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

আল্লাহ্র বান্দাদের হিদায়ত, তাদের অবস্থার সংশোধন ও তাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীর পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মাঝে এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তাঁর মহান শিক্ষা, দীক্ষা ও জাহিরী বাতিনী প্রশিক্ষণের কল্যাণে এক দুনিয়ার মানুষ ইহসান ও রাব্বানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার পরম স্তরে উন্নীত হয়ে ছিলো এবং তাঁর সহচরবর্গ খলীফাগণের ওয়ায-নসীহত, দাওয়াতী ও হিদায়াতের বরকতে গোটা ভারতবর্ষ শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় কুসংস্কারের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সরল পথে ফিরে এসেছিলো। বস্তুত তাঁর ওয়ায-নসীহত, উপদেশ ও শিক্ষা এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সুফল দিয়ে চলছে।

তিনি আরো বলেন, মোটকথা এই যে, তাঁর সমসাময়িক পৃথিবীর কোন অংশে এমন একজনও মানুষের কথা আমাদের জানা নেই, যিনি তাঁর শান মরতবার সমকক্ষতার দাবিদার হতে পারেন। তদ্রূপ এই সত্যপন্থী জামায়াত হতে আল্লাহ্র বান্দাগণ যে ঈমানী ফায়দা ও রূহানী ফয়েয লাভ করেছে তার দশমাংশও সমসাময়িক অন্যান্য ওলামা-মাশায়েখ হতে লাভ করতে পারেনি।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের হাল-হকীকত ও অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ আলিম শায়খ আবদুল হক বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে বলেছেন, সৈয়দ আহমদ (র)-এর হাতে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হিন্দু-অহিন্দু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ছিলো এবং প্রায় ত্রিশ লাখ মুসলমান তাঁর হাতে বায়'আত হয়েছিলো। সেই সাথে বায়'আত ও ইরশাদের সেই সিলসিলাকেও যদি বিবেচনায় ধরি যা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে এবং তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে আল্লাহ্র যমিনে আজো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তাঁর বায়'আতের হালকায় কোটি কোটি মানুষ অংশ গ্রহণ করে ছিলো বলা যায়।

সৈয়দ আহমদ শহীদ (র) যে সংস্কার প্রচেষ্টা, দাওয়াতী ও জিহাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার চেয়ে ব্যাপক বিস্তৃত ও তার চেয়ে গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী কোন আন্দোলন ভারতবর্ষ আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। এ আন্দোলন ও তার প্রবর্তকের কট্টর বিরোধী ডক্টর উইলিয়াম হান্টারের একটি মাত্র মন্তব্য এখানে তুলে ধরাই আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট হবে। Our Indian Musalmans গ্রন্থে তিনি বলেন, বাংলার পুলিশ বিভাগের প্রধান বলেছেন, এই জামাতের (অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারী জামাতের) প্রত্যেক দায়িত্বশীল ও প্রচারক ব্যক্তির অনুসারীর সংখ্যা আশি হাজারের কম হবে না। ইসলামী সাম্য বলতে যা বোঝায়, তা পূর্ণমাত্রায়

তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো। প্রত্যেকে তার সাথীর কাজ ও সুবিধাকে নিজের কাজ ও নিজের সুবিধা বলে মনে করে থাকে। যে কোন অবস্থায় সাথীর কোন সাহায্য বা উপকার করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না।

বিভিন্ন ইসলামী আরব অঞ্চলেও সাইয়েদগণের মাঝে বহু বুযুর্গ ও মরদে মুজাহিদ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁরা একদিকে সকল প্রতিকূলতার মাঝেও দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। অন্যদিকে সীমিত সাধ্য সহায়-সম্বল সত্ত্বেও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র নেতৃত্ব দান করেছেন এবং দুর্দমনীয় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিরল সাহসিকতা ও কুশলতার সাথে লড়াই করেছেন। বিদেশী শাসন থেকে এ সকল দেশের মুক্তি, স্বাধীনতা ও বিভিন্ন মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠার, পেছনে তাঁদেরই ছিলো মূল অবদান। এখানে বিশেষভাবে আমীর সৈয়দ আবদুল কাদির আল জাযায়েরী ও সাইয়েদ আহমদ শরীফ সনোসী (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তাঁদের সম্পর্কে আমীরুল বায়ান (আরব সাহিত্য সম্রাট) আমীর শাকীব আরসালানের মন্তব্য তুলে ধরতে চাই।

আবদুল কাদির আল-জাযায়েরী সম্পর্কে তিনি বলেন, "তিনি হলেন আবদুল কাদির ইব্‌ন মুহিউদ্দীন আল হাসানী, মাগরিবে আকসা'র অধিবাসী আহলে বায়তের খান্দান হলো তাঁদের পূর্বপুরুষের মূল। ১২২৩ হিজরী মুতাবিক ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইলম ও তাকওয়া তথা জ্ঞান ও পবিত্রতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন। পূর্ণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সাথে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ভাষা, সাহিত্য, ফিকাহ, তাওহীদ প্রাচীন যুক্তি ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তা সত্ত্বেও তিনি অস্ত্র শিক্ষা ও অশ্ব চালনার বিষয়ে অবহেলা করেন নি। ফলে একদিকে তিনি বিজ্ঞ আলিম আবার অন্যদিকে সামরিক শিক্ষায় প্রাজ্ঞ হয়েছেন। এভাবে তিনি যুগপৎ অসি ও মসি-এর অধিকারী হয়েছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, প্রভাব ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং 'মধ্যমাগরিব'-এর সকল পশ্চিমাঞ্চলের আমীরে শরীয়তরূপে তিনি বরিত হলেন। অতঃপর ঐ সকল অঞ্চলেও তিনি শাসন সীমানা বিস্তার করলেন যা ইতিপূর্বে তাঁর শাসনভুক্ত ছিলো না। ১৮৩৫ সালের ২৬ জুলাই ফরাসীদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করলেন। পরবর্তীতে ফরাসী জেনারেল 'বুজো'র সাথে এক যুদ্ধে পরাজিত হলেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ দাপটের সাথে অবিচল ছিলেন। ফলে ঔপনিবেশিক ফ্রান্স এক চুক্তিতে ওরান প্রদেশের সমগ্র অঞ্চল ও আল জাযায়ের প্রদেশের

বিরাট এলাকার ওপর তাঁর অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলো এবং তথাকার অধিবাসীরাও তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেছিলো।

বস্তুত একটি ইসলামী ও শরীয়তী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু অপরিহার্য শর্ত, তাঁর কোনটাই তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই ১৮৩৯ সনের ২০ নভেম্বর অমুসলিম আগ্রাসী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন থেকে শুরু করে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। এ সময় আমীর আবদুল কাদির যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা চতুর্দিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধরত শক্তিদ্বয়ের অসমতার ফলে শত্রুপক্ষ শেষ পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ এলাকা দখল করে নিলো এবং অধিকাংশ সমর্থক ও অনুগামী তাঁকে পরিত্যাগ করলো। ফলে তিনি মাগরিবে আশ্রয় নিলেন এবং পুনঃশক্তি সঞ্চয় করে আলজিরিয়া ভূখণ্ডে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং 'বারবার' এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কিন্তু আলজিরিয়াতে ফরাসীদের দখল সুসংহত হয়ে গিয়েছিলো। শেষ ফল এই দাঁড়ালো যে, তিনি সিরিয়ায় হিজরত করলেন এবং অবশিষ্ট জীবন দামেস্কে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে ও মানব কল্যাণের ব্রতে অতিবাহিত করলেন। আমৃত্যু তিনি পুণ্য, তাকওয়া ও মহত্তম চরিত্রের আদর্শ নমুনা ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকালের পর তাঁকে সালেহিয়ায় দাফন করা হয়।

সাইয়েদ আহমদ শরীফ সনোসী সম্পর্কে তিনি বলেন, সাইয়েদ আহমদ শরীফ সনোসীকে আমি এক মহান আলিম, মহানুভব নেতা ও উচ্চস্তরের বিশারদের প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়েছিলাম। সারা জীবনে যত মানুষের ওপর আমার চোখের দৃষ্টিপাত হয়েছে তাঁদের মাঝে মর্যাদার মহিমায়, সামাজিক আভিজাত্যে, জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিপক্বতায়, স্বভাব ও চরিত্রের কোমলতায়, আচার আচরণের উত্তমতায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, বিচক্ষণতায় ও প্রখর স্মৃতিশক্তিতে তিনি ছিলেন অনন্য। ভাবগাম্ভীর্য ছিলো কিন্তু নম্রতা এবং প্রশান্তির অভাব ছিলো না। চূড়ান্ত ধর্মভীরুতা ছিলো কিন্তু প্রদর্শনী ও যশ-লিপ্সা ছিলো না।

ধৈর্য ও সহনশীলতার যে রূপ আমি তাঁর মাঝে দেখেছি, খুব কম মানুষের মাঝেই তা পাওয়া যাবে। স্থির প্রতিজ্ঞার আলোকচ্ছটা তাঁর মুখমণ্ডলে ছিলো উদ্ভাসিত। তাকওয়া ও ধার্মিকতায় যেখানে তিনি ছিলেন অলীশ্রেষ্ঠ, সেখানে সাহসিকতায়ও ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ। আমি জানতে পেরেছি যে, ত্রিপোলী যুদ্ধের বহু লড়াইয়ে তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং অক্লান্তভাবে লাগাতার তের চৌদ্দ ঘণ্টা ঘোড়ায় চড়ে কাটাতেন। বহুবার তিনি নিজে বিপজ্জনক স্থানে

ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সেই সকল শাসনকর্তা ও সেনাপতির অনুকরণ তিনি কখনো করেন নি যারা যুদ্ধের মাঠে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে থাকে যাতে পরাজিত হলে শত্রুর খড়গহস্ত তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।

শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামতের আকীদা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আহলে বায়তের সাইয়েদগণ ইসলামের পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসকে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন যা তাঁরা তাদের প্রিয় নবী ও নানাজানের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। সে আকীদা-বিশ্বাসের সারনির্যাস এই যে, তাদের প্রিয় নবী ও নানাজানই হলেন সর্বশেষ নবী যাঁর মাধ্যমে নবুয়ত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অহীর অবতরণ বন্ধ হয়েছে এবং দীন ও শরীয়ত পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়েছে দুনিয়ার সৌভাগ্য এবং আখিরাতের মুক্তি এই পরিপূর্ণ দীনের সাথেই সম্পৃক্ত, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীনরূপে ইসলামকে তোমাদের জন্য অনুমোদন করলাম।" [সূরা মায়িদা : ৩]

সুতরাং তাঁর পরে আর কোন নবুয়ত নেই। শরীয়তের মাঝে কমবেশি করার কিংবা কোন বিধান রহিত করার অধিকার নেই। আলী (রা) থেকে শুরু করে প্রজন্মপরম্পরা তাঁদের উল্লেখযোগ্য সর্বশেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলে এই আকীদা-বিশ্বাসের ওপরই অটল অবিচল থেকেছেন।

ইমাম সুফিয়ান-মুতাররবাফ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আবূ জুহায়ফা হতে বর্ণনা করেন। আবূ জুহায়ফা (র) বলেন, আলী (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের নিকট কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রয়েছে? তিনি বললেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি বীজ অংকুরিত করেন এবং মানবকে সৃষ্টি করেছেন তা ছাড়া আর কিছু নেই। তবে কুরআন সম্পর্কে বিশেষ সমঝ যা আল্লাহ দান করে থাকেন আর যা 'সহীফয়' রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সহীফায় কি রয়েছে? তিনি বললেন, 'দিয়ত' এর বিধান, বন্দী মুক্তির বিধান এবং এই বিধান যে, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না। [মুসনাদে আহমাদ]

এই আকীদা গ্রহণের বিকৃত মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ

হযরত আলী (রা)-এর সন্তান-সন্ততি ও উত্তরাধিকারিগণ এই আকীদা-বিশ্বাস সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং এর প্রতিই মানুষকে তাঁরা আজীবন আহ্বান জানিয়েছেন। একে অন্যকে অসিয়ত করেছেন এবং তা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম ও মুজাহাদা করেছেন। কিন্তু অবশেষে সেই স্বভাব ও মানসিকতাই প্রবল হয়ে উঠলো যার উৎস হলো প্রাচীন জাহিলিয়াত বিকৃতিপ্রাপ্ত প্রাচীন ধর্মসমূহ এবং নবুয়তের সম্পর্ক ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত গ্রীক, পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষের সমাজ সভ্যতা ও দর্শনসমূহ। এই স্বভাব ও মানসিকতার মূল প্রবণতা হলো রাজবংশ ও শাসক পরিবারকে কিংবা প্রাচীন যুগের ধর্মীয় নেতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক শ্রেণীকে অতি মানবীয় ও দৈব মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। উপরোক্ত ধর্মীয় শ্রেণীটিতে যুগপরম্পরায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হতো যারা কঠিন আধ্যাত্মিক সাধনাবলে এক ধরনের অতিমানবীয় পরিচিতি লাভ করতো। তারা যাজকশ্রেণীর নিষ্পাপতায় বিশ্বাস পোষণ করতো এবং কোন ধর্ম বিধান রহিতকরণ কিংবা বিধান প্রণয়নের নিরংকুশ অধিকার দাবি করতো। [দায়েরায়ে মারিফায়ে বৃটানিয়া, পৃষ্ঠা-১৯৪]

এর পেছনে অবশ্য কিছু মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ ও স্বভাব প্ররোচনা সহায়করূপে কাজ করে থাকে। যেমন,

১. বিশেষ শ্রেণী বা পরিবার কিংবা ঐ শ্রেণী ও পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে পলায়নের মনোবৃত্তি।

২. আস্থা ও বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য ও আত্মনিবেদনে একটি মাত্র পরিবার কিংবা একজন মাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রীভূত করার মনোভাব। কেননা বহু বিধি-বিধানসম্পন্ন কোন শরীয়ত, শরীয়ত প্রবর্তক ও ব্যাখ্যাকারী আলিমগণের আনুগত্য করার চেয়ে এটা অনেক সহজ ও সুবিধাজনক। কেননা তাদের সংখ্যা যেমন অধিক, তদ্রূপ তাদের মাঝে মতপার্থক্য ও মতভিন্নতাও স্বাভাবিক।

৩. এই ব্যক্তি বা পরিবারকে ও এই ধর্মীয় নেতৃত্বকে ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের সহজ সম্ভাবনা। এভাবে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বহু সমস্যা ও জটিলতার নিরসন করা যায় এবং বহু দূরের পথ অতিক্রম করা যায়। কেননা সর্বযুগে ও সর্বদেশে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তির

প্রতি অতিমানবীয় পবিত্রতা আরোপে ও তাদের নিষ্পাপ আকীদা ও বিশ্বাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। প্রাচীন কালের ধূর্ত রাজনীতিক ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাগণ মানুষের এ দুর্বলতা বরাবর কাজে লাগিয়েছে।

শিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় ধর্মীয় পবিত্রতার ছাপ দিয়ে অতি সহজে ইমামতের আকীদার মাধ্যমে উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াসী হয়েছিলো। এই ভ্রান্ত ফেরকা দাবি করলো যে, রাসূলের খলীফা ও ইমামগণের নির্বাচন আল্লাহ্র পক্ষ হতেই হয়ে গিয়েছিলো। নবী ও রাসূলের ন্যায় তাঁরাও নিষ্পাপ। তাঁদেরও নিঃশর্ত আনুগত্য ফরয। তাঁদের মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মর্যাদার সমতুল্য এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের মর্যাদার উর্ধ্বে।

ইমাম ছাড়া বান্দার ওপর আল্লাহ্র হুজ্জত (প্রমাণ) সাব্যস্ত হয় না। আর যতক্ষণ তা জানা না হবে ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ হবে না। ইমাম ছাড়া দুনিয়া কায়েম থাকতে পারে না। ইমামের পরিচয় লাভ করা ঈমানের জন্য শর্ত এবং ইমামগণের আনুগত্য রাসূলগণের আনুগত্যের ন্যায় অপরিহার্য। কোন বিষয় হালাল বা হারাম ঘোষণা করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাদের রয়েছে। আর তারা নবীগণের ন্যায় মাসুম ও নিষ্পাপ। আর নিষ্পাপ ইমামগণের প্রতি যারা ঈমান আনবে তারা জালিম ও ফাসিক ফাজির হলেও জান্নাতী হবে।

ইমামগণের মর্যাদা রাসূল ﷺ-এর সমতুল্য এবং সমস্ত সৃষ্টিজগৎ ও আম্বিয়া-কিরামের চেয়ে উর্ধ্বে। অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সেগুলোর ইল্ম ও জ্ঞান তারা অধিকার করতেন। রাতে ও দিনে বান্দাদের আমলসমূহ ইমামগণের নিকটে পেশ করা হয়। ফেরেশতাগণ ইমামগণের নিকট রাত দিন গমনাগমন করেন এবং প্রতিটি জুমার রাতে তাদেরকে মেরাজ-সৌভাগ্যে ধন্য করা হয়। প্রতি বছর লায়লাতুল কদরে ইমামগণের ওপর আল্লাহ্র পক্ষ হতে কিতাব নাযিল করা হয়। মৃত্যু তাঁদের নিয়ন্ত্রণে এবং দুনিয়া-আখিরাত তাদের ক্ষমতাধীন। সুতরাং যাদেরকে ইচ্ছা করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তারা তা দান করতে পারেন।

কিতাবুল কাফীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হাসান ইব্ন আব্বাস আল-মারূফী ইমাম রিযা-এর বরাবরে এই মর্মে পত্র লিখেছিলেন :

আপনার জন্য আমি উৎসর্গীকৃত, আমাকে বলুন, রাসূল, ইমাম ও নবীর মাঝে পার্থক্য কি? তিনি উত্তর দিলেন, রাসূল হলেন তিনি, যাঁর ওপর জিবরীল নাযিল হন এবং তিনি তাঁকে দেখেন এবং তাঁর কালাম শ্রবণ করেন। আর তাঁর

ওপর অহী নাযিল হয়- এবং কখনো বা শয়নে তিনি ইবরাহীমের অনুরূপ স্বপ্ন লাভ করেন। পক্ষান্তরে নবী কখনো কালাম শ্রবণ করেন আর কখনো বা সত্তার দর্শন লাভ করেন কিন্তু শ্রবণ করেন না। আর ইমাম হলেন তিনি, যিনি কালাম শ্রবণ করেন কিন্তু সত্তার দর্শন লাভ করেন না।

আল্লামা ইব্‌ন খালদূন তাঁর স্বভাবসুলভ জ্ঞান-মনস্কতা ও ইতিহাসগত দায়িত্বশীলতার আলোকে মন্তব্য করেন:

শিয়াদের ইমামতের ধারণাটি জনস্বার্থ বিষয়ক কিছু নয় যা উম্মাহর চিন্তা-ভাবনার ওপর সোপর্দ করা যায় এবং তাদের নিয়োগ দ্বারা তিনি নিযুক্ত হবেন, বরং এটা দীনের স্তম্ভ ও ইসলামের বুনিয়াদ। নবীর পক্ষে তা বিস্মৃত হওয়া কিংবা উম্মতের হাতে সোপর্দ করা জায়েয নয়, বরং তার কর্তব্য হবে উম্মতের জন্য ইমাম নির্ধারণ করে দেয়া। আর তিনি কবীরা ও সগীরা সমস্ত গোনাহ হতে মাসুম ও নিষ্পাপ হবেন। আলী (রা)-কেই নবী ﷺ নিযুক্ত করেছিলেন। এর সপক্ষে তারা কিছু 'নস' (দলীল) বর্ণনা করে এবং নিজেদের মাযহাবের চাহিদা অনুযায়ী তার নিজস্ব ব্যাখ্যা পেশ করে থাকে। [মুকাদ্দিমা, ইব্‌ন খালদূন, পৃষ্ঠা-১৫৫]

আল্লামা ইব্‌ন খালদূন আরো বলেন, তাদের কতিপয় গোঁড়া উপদল এমনও রয়েছে যারা ঈমান ও আকল-বুদ্ধির সীমানা ডিঙিয়ে এই ইমামগণের ইলাহিয়াত দাবি করে বসেছে। তবে হয় তারা 'মানব' হয়েও ঐশ্বরিক গুণাবলীতে গুণান্বিত, অথবা 'ইলাহ' তাঁদের মানব সত্তায় 'প্রবিষ্ট' হয়েছেন। মূলত এ মতবাদ ঈসা (আ) সম্পর্কে খ্রীস্টীয় মতবাদেরই অনুকৃতি। এ ধরনের মতবাদ পোষণ-কারীদেরকে আলী (রা) আগুনে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন। মুখতার ইব্‌ন আবূ ওবায়দ সম্পর্কে এই আকীদার কথা শুনতে পেয়ে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (র) খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাকে অভিশাপ দিয়ে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ইমাম জাফর সাদিক (র)-ও কারো সম্পর্কে এই আকীদার কথা শুনতে পেলে একই আচরণ করতেন।

কোন কোন শিয়া এই আকীদা পোষণ করে যে, ইমামির 'পূর্ণতা' অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত নয়। সুতরাং ইমাম যখন মৃত্যুবরণ করেন তা তখন তার আত্মা ও রূহ-পরবর্তী ইমামের মাঝে প্রবিষ্ট হয়। ফলে সেই 'পূর্ণতা' তার মাঝে স্থানান্তরিত হয়। এটা মূলত দেহান্তরবাদ।

শিয়া সম্প্রদায়ের এ সকল আকীদা-বিশ্বাস ধারাবাহিকভাবেই চলে আসছে এবং বর্তমান যুগের শিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ও আলিম সমাজও তা ধারণ করে

চলেছেন, এমন কি তাদের সর্বশেষ আধ্যাত্মিক নেতা খোমেনী তাঁর রচিত "আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া" গ্রন্থের "আল বিলায়াতুত তাকবিনীয়া" শিরোনামে যা লিখেছেন তা এখানে আমরা হুবহু তুলে ধরছি। ইমামগণের জন্য রয়েছে মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্তর), অতি উচ্চ মর্যাদা এবং (ইলাহের) বিশ্বজাগতিক খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব। এ বিশ্বজগতের প্রতিটি কণা তাদের কর্ম ও বেলায়েতের অনুগত। আর আমাদের মাযহাবের অনিবার্য আকীদা এই যে, আমাদের ইমামদের এমন উচ্চ মরতবা রয়েছে যেখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত কোন ফেরেশতা কিংবা কোন প্রেরিত নবী উপনীত হতে পারেন না। আর আমাদের নিকট বিদ্যমান বর্ণনা ও হাদীস অনুযায়ী রাসূলে আযম ﷺ ও ইমামগণ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে 'নূর' ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে আপন আরশের পরিপার্শ্বে পরিবেষ্টনকারী করে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে এমন মর্যাদা ও নৈকট্য দান করেছিলেন যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। বিচক্ষণ অমুসলিম পণ্ডিতগণ এই আকীদা-বিশ্বাসের অনিবার্য ফলাফল ও মন্দ পরিণতির কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

পেট্রিক হোজেস বলেন, শিয়া সম্প্রদায় মূলত ইমামগণের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার গুণসমূহ আরোপ করে থাকে।

গবেষক 'ওইভানো' (Wivanow) বলেন, সার্বক্ষণিক ও স্থায়ীভাবে বিশ্বজগতে 'ইমামত' আলোকপাত অব্যাহত থাকার অর্থ হলো নবুয়তের মর্যাদাকে পার্শ্বস্থান দান করা।

প্রাচীন ইরান ও তার ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন

'ইমামত' গোঁড়া আকীদা বিশ্বাস যার সীমারেখা ব্যক্তি ও পরিবারের প্রতি ঐশ্বরিক পবিত্রতা আরোপ পর্যন্ত উপনীত হয়, মূলত এর ওপর প্রাচীন ইরানের ধর্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাচীন ইরানের শাসন ক্ষমতা ও ধর্মীয় নেতৃত্ব 'মায়দায়া' গোত্রের হাতে ছিলো, অতঃপর ইরানে যখন জরথুস্ত্রবাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হলো তখন এই নেতৃত্ব 'আল মাগান' গোত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিলো, আর যাজক সম্প্রদায় সম্পর্কে পারসিকদের বিশ্বাস ছিলো এই যে, পৃথিবীতে তাঁরা ঈশ্বরের ছায়া। ঈশ্বরের সেবা করার জন্যই শুধু তাদের সৃষ্টি এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব লাভকারী এ গোত্র থেকেই শাসক নির্বাচিত হতে হবে। কেননা ঈশ্বরের পবিত্র সত্তা তার মাঝেই বিমূর্ত হয়। 'অগ্নি-গৃহ'-এর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানও এই গোত্রেরই একক অধিকার। বিদগ্ধ গবেষক ডোজী (Dozy) বলেন,

পারসিকরা সম্রাটের প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকাতেই অভ্যস্ত ছিলো, যাতে একটা ঈশ্বরীয় ভাব বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে ঠিক একই দৃষ্টিতে তারা আলী ও তাঁর পরিবারের প্রতি তাকাতে শুরু করেছিলো। তারা বলতে লাগলো যে, ইমামের আনুগত্য হলো প্রথম কর্তব্য এবং তার আনুগত্যই হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

[ফজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-২৭৭]

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এই পরিবারকেন্দ্রিকতা ঐ সকল জাতি ও সমাজের জন্য সীমাহীন দুর্গতি ও দুর্দশা ডেকে এনে ছিলো যারা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম দ্বারা অনুশাসিত ছিলো। অবশ্য কখনো সেটা হতো আসমানী ধর্ম, কখনো বা হতো বৈপ্লবিক সংস্কারবাদী ধর্ম।

এর ফলে সমগ্র জাতির মাঝে নিহিত বিপুল যোগ্যতা ও কর্মশক্তি স্থবির হয়ে পড়তো এবং সচেতন ও জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী মানুষের স্বাধীন সমালোচনা ও মুক্ত অপমৃত্যু ঘটতো এবং জাতির মেধা, মনন ও স্নায়ুশক্তি বিবশ হয়ে পড়তো। এর মাধ্যমে কখনো কখনো দেশের সম্পদরাজিকেও ভয়ংকররূপে কুক্ষিগত করা হতো যা ক্ষমা-পত্র বিক্রয় ও জান্নাতের চাবি বন্টন পর্যন্ত গড়াতো যা গির্জা ও বিজ্ঞানের মাঝে দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করতো, যা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিয়েছে এবং ইউরোপকে প্রথমে রাষ্ট্র থেকে ধর্মের বিচ্ছেদ ও পরে ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার দোরগোড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, এমন কি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দিকেও তার উত্তাপ এসে লেগেছে। ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকার ও ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন ও ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন প্রয়াসী সংগঠনগুলোর মাঝে এমন এক সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে অন্তত ইসলামী বিশ্বে যার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মুসলিম জাতি আজ এক অর্থহীন বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে এবং কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের নামে তার শক্তি ও উপায়-উপকরণ ধ্বংস হয়ে চলেছে।

শরীয়তের বিধান প্রবর্তন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নবুয়তের সমান্তরাল প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশকারী 'ইমামত' থেকে যে নিরংকুশ ক্ষমতা উৎসারিত হয়েছে এবং তার প্রতি যে নিঃশর্ত বশ্যতা ও অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য ফলশ্রুতি এই যে, ইমামতের নামে দীনের যে কোন রোকন, ইসলামের যে কোন ফরয ও শরীয়তের যে কোন বিধান যখনই কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন দেখা, দেবে এবং 'আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে' আদিষ্ট নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী মুজতাহিদের ইজতিহাদ যখন তা অনুমোদন

করবে, তখন ইচ্ছামতো তা রহিত করা যাবে। বাস্তবেও তা ঘটেছে। ইরানের সরকারি পত্রিকা কায়হান ১৪০৮ হিজরীর ২৩ জুমাদাল উলার প্রকাশিত ১৮২ সংখ্যায় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের নামে লিখিত আয়াতুল্লা খোমেনীর একটি পত্র প্রকাশ করেছে। তাতে খোমেনী বলেন, (ইমামের) হুকুমত সমস্ত মসজিদ বাতিল করে বা ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং (ইমামের) হুকুমত নামায-রোযার ওপর অগ্রগণ্য।

একই পত্রে তিনি আরো বলেন, হুকুমত হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিশুদ্ধ বেলায়েতের একটি শাখা যা ইসলামের প্রধান বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় শাখা বিধানের ওপর অগ্রগণ্য, এমন কি নামায, রোযা ও হজ্জ থেকেও অগ্রগণ্য। সুতরাং শাসক অনিবার্য প্রয়োজনে মসজিদ বাতিল করতে বা ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং ইসলামের কল্যাণ ও উপকারের পরিপন্থী হলে ইসলামের যে কোন হুকুম ও বিধান রহিত করতে পারেন চাই সেটা ইবাদত হোক কিংবা ইবাদতবহির্ভূত হোক। তদ্রূপ ইসলামী হুকুমতের স্বার্থ ও কল্যাণ যদি দাবি করে তাহলে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরয হজ্জও রহিত করতে পারে। কেননা এই হুকুমাত হলো আল্লাহ্প্রদত্ত নিরংকুশ বেলায়েত (যা ধর্মীয় ক্ষমতা) বলা বাহুল্য, শরীয়তের বিধানে হস্তক্ষেপ ও এক ব্যক্তির ইজতিহাদ কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে বাতিল ও রহিতকরণের এ কর্মকাণ্ড বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী দীন ও শরীয়তের জন্য একটি স্থায়ী বিপদরূপে বিরাজ করবে।

শরীয়তের গোটা দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের এ ক্ষমতা এবং তার প্রতি এই অন্ধ আনুগত্য দীন ও শরীয়তের অকার্যকরতা এবং গোটা দেশ ও জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে পারে কিংবা অন্তত এমন সহদুর্যোগ ও দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত করতে পারে যা থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকবে না। যেমন ইরাক ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে ইরানের যুদ্ধের বেলায় ঘটেছে। উভয় দেশের জন্যই এ যুদ্ধ অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে এনেছে, অথচ কোন পক্ষের হাতেই ন্যূনতম ফলাফলও আসেনি। অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এই ইমামত কখনো কখনো চরম স্বেচ্ছাচারী একনায়কের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়ে পড়ে যার একমাত্র লক্ষ্য হয় পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং জীবন ও সম্পদের ওপর ধ্বংসলীলা চালানো, যেমন ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বেচ্ছাচারী শাসনকালে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সঙ্গে যদি ধর্মীয় ছাপ ও ঐশ্বরিক পবিত্রতা যুক্ত হয় এবং পাপহীনতা, আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদেশ ও সমকালীন উম্মতের জন্য নবীর স্থলবর্তিতায় আকীদা-বিশ্বাসও যদি সম্পৃক্ত হয় তাহলে অবস্থা কত ভয়ংকর হতে পারে?

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে ইরানী জনগণও তাদের অনুগামীদের মাঝে অন্ধ আনুগত্যের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং দীনে তাওহীদের স্বভাব-প্রকৃতি ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সীমা লংঘন করে যেমন ধর্মীয় পবিত্রতা আরোপ করা হয়েছে তাতে উল্লিখিত বিষয়টি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দীনে তাওহীদের শিক্ষা হলো:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ـ وَلَا يَاْمُرَاكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, আল্লাহ্ আ'আলা তাকে কিতাব জ্ঞান ও নবুয়ত দান করবেন, অতঃপর তিনি লোকদের বলবেন, তোমরা আমার বান্দা হও আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে বরং (তিনি তো বলবেন যে,) তোমরা আল্লাহ্তে নিবেদিত হও এজন্য, তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং এজন্য, তোমরা তা পাঠ কর। আর এ নির্দেশও তিনি দিতে পারেন না, তোমরা ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে 'রব'-রূপে গ্রহণ করো। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি তিনি তোমাদেরকে কুফুরির আদেশ করতে পারেন? [সূরা আলে-ইমরান : ৭৯-৮০]

অথচ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে এ খবর প্রচারিত হয়েছে যে, ১৯৮৯-এর ৩ জুন তেহরানে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর মৃত্যুর পর সরকারি সংস্থাসমূহ যখন তার শবদেহ জান্নাতে যাহরা নামক কবরস্থানে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলো তখন জানাযার ওপর উন্মাদপ্রায় মানুষের ঢল এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লো যে, শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লো। অবশেষে হেলিকপ্টারে করে জানাযা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। হেলিকপ্টার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর জানাযা এক নযর দেখার বরকত লাভের জন্য উত্তাল জনসমুদ্র এমনভাবে এসে আছড়ে পড়লো যে, ফাঁকা গুলী ছুঁড়ে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোন কাজ হলো না। এক বিস্ময়কর ধর্মোন্মাদনা নিয়ে মানুষ লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে কাফনের কাপড় ছিনিয়ে নিলো এবং টুকরো টুকরো করে নিজেদের মাঝে তবারক বণ্টন করলো। আর আয়াতুল্লাহ্র লাশ 'অনাবৃত' অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলো। ফলে সরকারি কর্মকর্তাগণ দাফনকার্য কয়েক ঘণ্টা বিলম্বিত করতে বাধ্য হলেন।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ইরান সরকার পরলোকগত আয়াতুল্লাহ্র কবরে একটি সমাধি সৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যা সম্ভবত তার অনুপম সৌন্দর্যে পৃথিবীর যে কোন সমাধি সৌধ ও স্মৃতিসৌধকে ছাড়িয়ে যাবে এবং নকশা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কাবা শরীফ ও ইমাম আলী যেয়ার সমাধি সৌধের সদৃশ হবে। স্বভাবতই এর নির্মাণ কাজে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। পৃথিবীর সুন্দরতম ইমারতরূপে বিবেচিত আগ্রার ঐতিহাসিক তাজমহলকেও সম্ভবত তা আপন স্থাপত্য সৌন্দর্যে ও জৌলুসে ছাড়িয়ে যাবে।

আর কিছু নয়, এসব কিছুর একমাত্র কারণ হলো ঐশ্বরিক পবিত্রতার সেই অতিমানবীয় বলয় যা ইমামতের চরমপন্থী আকীদা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং নিষ্পাপ ও ঐশী পবিত্রতার বিশ্বাস যা ইমামকে ইসলাম-নির্ধারিত বন্দেগী ও সাধারণ মানবগুণের উর্ধ্বে উন্নীত করে রেখেছে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সীরাত ও শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হাদীস ও সীরাতের সুপ্রসিদ্ধ ও অকাট্য বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বিষয়ে তাঁর প্রতি আলাদা আচরণ পছন্দ করতেন না। মানুষ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দাঁড়াবে এবং পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের নবীগণের যেমন অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছে তাঁর উম্মত তাঁর তেমন অতিরঞ্জিত প্রশংসা করবে কিংবা তাঁকে রিসালাত ও আবদিয়াতের মাকাম থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে এটা তাঁর বরদাশত ছিলো না।

আনাস (রা) বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়ে প্রিয় কোন ব্যক্তি ছিলো না। কিন্তু আমরা যখন তাঁকে দেখতাম তখন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়াতাম না। কেননা এ বিষয়ে তাঁর অপছন্দের কথা আমরা জানতাম। [তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ]

একবার তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হলো, হে মানবশ্রেষ্ঠ : তিনি বলেন, তিনি তো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। [মুসলিম]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, খ্রীস্টানরা ঈসা ইব্ন মারয়ামের যেমন অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছে তোমরা আমার সে রকম প্রশংসা করো না। আমি একজন বান্দামাত্র। সুতরাং আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে। [বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া]

পূর্ববর্তী উম্মত তাদের আধ্যাত্মিক নেতা ও রূহানী ব্যক্তিদের প্রতি অতিরিক্ত ও ঐশী পবিত্রতা আরোপের যে মহাফিতনার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো তা থেকে আপন উম্মতকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল সর্বপ্রকার

রক্ষামূলক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। উম্মতের প্রতি তাঁর জীবনের শেষ সতর্কবাণী ছিলো

قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد .

ইহুদী ও নাসারাদের আল্লাহ্ নিপাত করুন, তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে ছেড়েছে। [বুখারী]

হযরত আয়েশা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা দেখা দিলো তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে চাদর দিয়ে ঢাকনা দিতে লাগলেন। যখন খুব অস্থির হয়ে পড়তেন তখন মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। এই অবস্থায় তিনি বললেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا .

ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক! তারা তাদের নবীদের কবরে সিজদার স্থান তৈরি করে নিয়েছে। তিনি (একথা বলে) ইহুদী নাসারাদের আচরণ সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। [বুখারী]

'সূত্র বহুল'-ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ মৃতদের শোকে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন। [সুনানে ইব্ন মাজাহ]

আর এসবের উদ্দেশ্য ছিলো কর্মে ও বিশ্বাসে এবং আচরণে ও উচ্চারণে মুসলিম উম্মাহকে তাওহীদের আকীদা ও একমাত্র আল্লাহ্র আবদিয়াতের ওপর সুদৃঢ় থাকার প্রশিক্ষণ দেয়া।

এই নীতি, আচরণ ও শিক্ষার ফলাফল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের সময় পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে ছিলো যিনি সাহাবা-কিরামের নিকট তাঁদের জানমাল, ইজ্জত-আবরু ও পিতামাতা, এক কথায় সৃষ্টিজগতের সব কিছুর চেয়ে প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দাফন-কাফনের নাযুকতম সময়ে এই ধরনের ভক্তির আতিশয্য ও প্রায় উপাসনা পর্যায়ের পবিত্রতা আরোপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। স্বয়ং হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরম প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হাসান-হুসায়ন ও খুলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষেত্রেও তা ঘটেনি। এই বিরাট পার্থক্য ছিলো সেই আকীদা ও বিশ্বাসের ফল যা ইসলামের প্রথম দিকের প্রজন্ম সযত্নে লালন করেছিলো। ইমামগণের নামশূন্যতা ও পবিত্রতার যে আকীদা বিশ্বাসের ওপর ইরানী প্রজন্ম লালিত হয়ে এসেছে যাতে প্রাচীন ইরানের

চরমপন্থী স্বভাব প্রকৃতির এবং পারসিক ও জরথুস্ত্রীয় জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট ও 'তলানি' বিদ্যমান রয়েছে।

তাছাড়া এভাবে এমন একটি বেকার ও কর্মবিমুখ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে থাকে, যারা কপালের ঘাম ও হাতের শ্রমের পরিবর্তে জনসাধারণের দান ও ভিক্ষার ওপর জীবন ধারণ করে যাজকের পদ ও পোপ বা ইমামের পদ বিশেষ কোন পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখার কুফল হিসেবে ধর্মীয় ও জ্ঞানসেবী শ্রেণীগুলোতে কর্মবিমুখতা, পাপাসক্তি ও আয়েশপ্রিয়তা বাসা বেঁধে বসে। ফলে খেটে খাওয়া ও শ্রমজীবী শ্রেণীর অধিকার হয় ভূলুণ্ঠিত। এমন একটি শ্রেণী সমাজের বুকে শিকড় গেড়ে বসে যারা নিজেদের ও পোষ্য পরিবারের জীবিকা উপার্জনের জন্য নড়াচড়া করতে কিংবা এক ফোঁটা ঘাম ফেলতেও রাজী নয়, বরং শ্রমজীবী শ্রেণীর কষ্টার্জিত পয়সায় আরাম-আয়েশ করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۔

"হে মু'মিনগণ, অধিকাংশ ইহুদী আলিম ও খ্রীস্টান পাদরী মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে এবং আল্লাহ্র পথ হতে (মানুষকে) বাধা দান করে।

[সূরা তাওবা : ৩৪]

সমাপ্ত

এ লেখকের আরো অন্যান্য কিতাব

১. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?
২. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১-৫ খণ্ড)
৩. নবীয়ে রহমত (সা.)
৪. সীরাতে রাসূল (সা.)
৫. প্রাচ্যের উপহার
৬. ঈমান যখন জাগলো
৭. নয়া খুন
৮. আমার আম্মা
৯. নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
১০. আরকানে আরবাআ
১১. তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহবান
১২. হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (র)
১৩. শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)
১৪. সালাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৫. সিয়াম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৬. ইসলামী জীবন বিধান
১৭. কারওয়ানে মদীনা
১৮. ঈমান দীপ্ত কিশোর কাহিনী
১৯. বিধ্বস্ত মানবতা
২০. হজ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২১. যাকাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২২. ছোটদের আলী মিয়া
২৩. মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
২৪. পুরানো চেরাগ (১ম খণ্ড)
২৫. পুরানে চেরাগ (২য় ও ৩য় খণ্ড)
২৬. সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রহ) ১ম-২য় খণ্ড [যন্ত্রস্ত]
২৭. কারওয়ানে জিন্দেগী (১-৭ খণ্ড) [যন্ত্রস্ত]
২৮. খুতবাতে আলী (১-১০ খণ্ড) [যন্ত্রস্ত]
২৯. ইসলামে নারীর অধিকার [যন্ত্রস্ত]
৩০. আমার আব্বা [যন্ত্রস্ত]
৩১. ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যদা [যন্ত্রস্ত]
৩২. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর জীবন ও কর্ম [যন্ত্রস্ত]